২ জানুয়ারি ২০২৫

প্রথম আলো

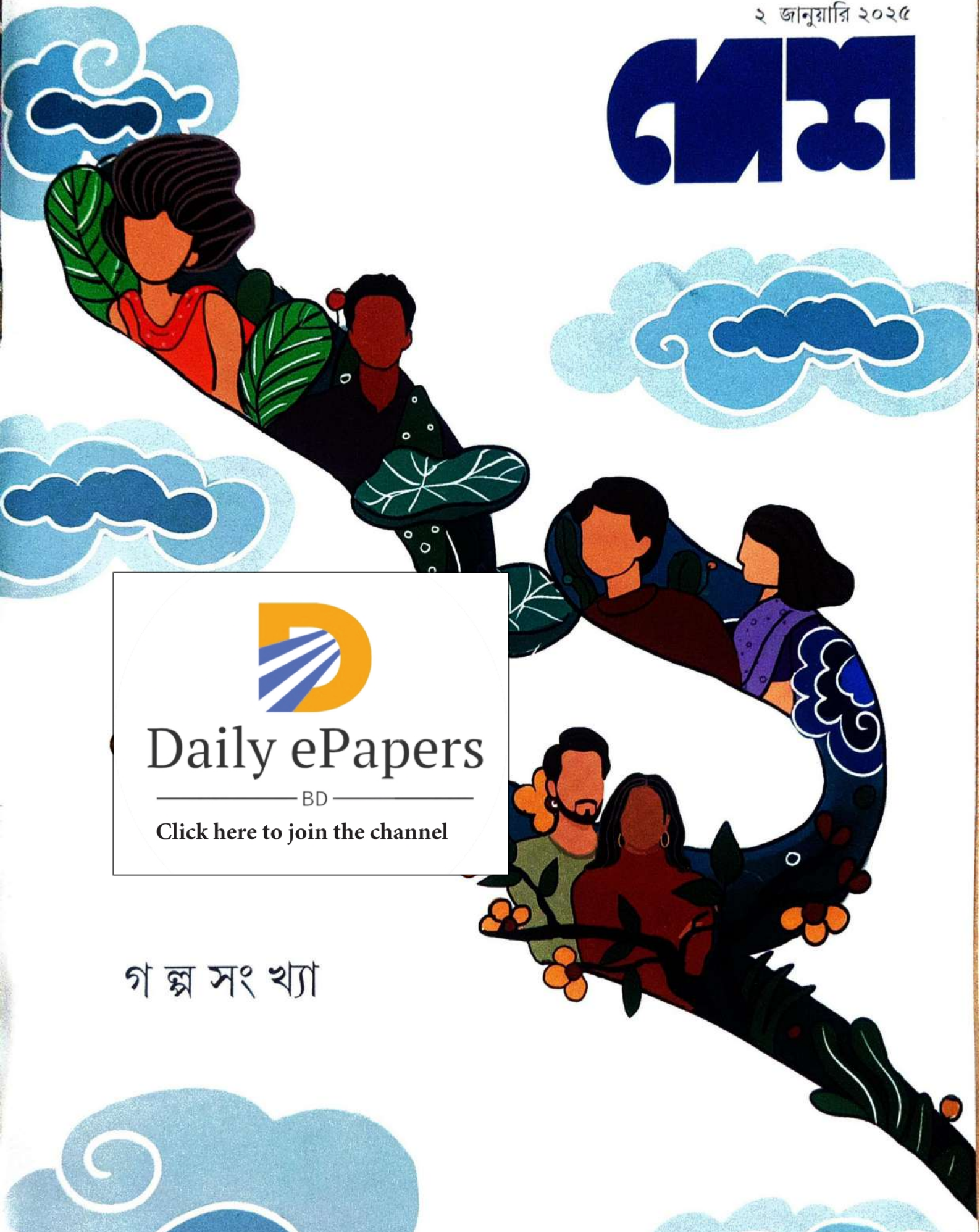

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

গল্প সংখ্যা

নতুন বই

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

শূন্য পথের মল্লিকা ৬০০.০০

জীবনবৃক্ষের প্রবাহ এক আশ্চর্য ঘটনা। দীর্ঘ সময়ের যাত্রাপথে কে কার সঙ্গে কীভাবে যে যুক্ত হয়ে পড়ে, কোন ভালবাসা কীরূপে আমাদের কাছে ফিরে আসে, তা কেউ বলতে পারে না। চার ভাগে বিভক্ত এই কাহিনি পঁচিশ বছরের সময়কালকে ধারণ করে আছে। আর তার প্রবাহে আমরা দেখি হাওয়াদাদুকে। দেখি সর্বগ্রাসী ক্ষমতার লোভে অন্ধ বীরেন্দ্রকে। আবার দেখি গ্রাম্য রাজনীতির নেতা জগন্নাথকেও। এবং তারপর একটি খুন বদলে দেয় বহু মানুষের জীবনের গতিপথ ও লক্ষ্য। আর সেই সূত্র ধরেই এই কাহিনি আমাদের চিনিয়ে দেয় দরিদ্র যুবক কবিকে। দেখায়, উর্জা ও রাজুর প্রেম ও তার পরিণতি। সেই প্রবাহেই জানা যায় কাজের মানুষ লালু আর বিন্দিকে। জানা যায় ইউনিভার্সিটিতে পড়া জিনি কেন ভালবাসে কবিকে! আর দেখি আশ্চর্য এক চরিত্র, ঝিরিকুমারকে। কে এই ঝিরিকুমার? সেকি আনন্দের উৎস নাকি মৃত্যুর অন্ধকার? এরা ছাড়াও কাহিনির বাঁকে বাঁকে এসে পড়ে সেতুদা, গুরান, লীলা, মাধু, বাচ্চু, অঞ্জনা, নিধি-সহ আরও নানান চরিত্র! বহু আগের দুটি ঘটনা প্রভাব ফেলে সময়ের ওপর, নানান মানুষের ওপর। আলো-ছায়ার এইসব মানুষরা ভাবে তাদের জীবনের শূন্য পথে কবে ফুটবে ভালবাসার মল্লিকা! 'শূন্য পথের মল্লিকা' অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলোয় পৌঁছনোর উপাখ্যান। হিংসা থেকে ভালবাসায় পৌঁছনোর যাত্রা। সুখপাঠ্য এই উপন্যাস মনের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে রাখার কথা বলে। ভালবাসার মধ্যে যে ত্রাণ আছে, তার কথা বলে।

ইমদাদুল হক মিলন

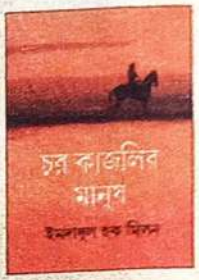

চর কাজলির মানুষ ৩৫০.০০

পদ্মায় জেগে ওঠা চর দখল করেছেন ভণ্ড নেতা, নাম দিয়েছেন 'চর কাজলি'। দুর্ধর্ষ খুনি, ডাকাত, অসামাজিক কাজে লিপ্ত বাহাত্তর জন মানুষকে বসিয়েছেন পাহারায়। চর দখলে রাখার ফাঁকে তাদের দিয়ে করান মাদক চোরাচালানের কাজ। সুরভি নামের এক মেয়ে ভেসে আসে চরে। গানে গানে জাগিয়ে তোলে সবাইকে। স্বাভাবিক জীবনে ফেরে মানুষগুলো। শেষ পর্যন্ত শুরু হয় নেতার সঙ্গে বিরোধ...

শাশ্বতী নন্দী

দু'পশলা ভালবাসা ৩৫০.০০

দু'পশলা বৃষ্টির মতো দু'পশলা ভালবাসাও কখনও কখনও মানুষের তপ্ত-দগ্ধ জীবনকে ভিজিয়ে দেয় শান্ত শীতলতায়। এ উপন্যাসের অভিরূপ, এক বড় চক্রান্তের শিকার। বধূহত্যার দায়ে তাকে এবং তার মাকে জেল খাটতে হয়েছে। তবু জেল থেকে বেরিয়ে তার মনে বাঁচার কী এক আকুল তৃষ্ণা। এ সময় উইনি কি আসবে তার কাছে দু'পশলা বৃষ্টির মতো দু'পশলা ভালবাসা হয়ে।

ঋতা বসু

আত্মজা ৩৫০.০০

এই গ্রন্থে দুটি উপন্যাসেই লেখক কিছু জটিল মানসিক ও পারিবারিক সংকট তুলে ধরেছেন। দুই উপন্যাসই দুই আত্মজাকে ঘিরে। প্রথম উপন্যাসে দেখি উচ্চশিক্ষিত আদুরে কন্যা অশেষ নির্ভরতায় যাকে জড়িয়ে জীবনের সব চড়াই-উতরাই পার হতে চেয়েছিল হঠাৎ একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায় সেই চেনা জগৎ। দ্বিতীয় উপন্যাসে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর চোখ দিয়ে বড়দের জগতের জটিলতা ও ভয়ংকর সব অপরাধের সম্মুখীন হই আমরা। দুটি উপন্যাসই শিশুদের প্রতি ঘটে চলা নির্মম অন্যায় ও অপরাধের কাহিনি।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯ ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭
ই-মেল publishers@anandapub.in • ওয়েবসাইট www.anandapub.in

নিত্যনতুন বইয়ের খবর পেতে আজই লগ ইন করুন।

দেশ

১৮ পৌষ ১৪৩১ • ২ জানুয়ারি ২০২৫ • ৯২ বর্ষ ৫ সংখ্যা

সূচিপত্র

প্রচ্ছদকাহিনি

গল্পসংখ্যা ১৪

নতুন বছরের প্রথম দেশ-এ বারো জন লেখকের বারোটি গল্প—
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার, নন্দিতা বাগচী
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল লামা
শেখর মুখোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, কিন্নরী নন্দী
শুভদীপ চৌধুরী, শ্রীকান্ত অধিকারী ও সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

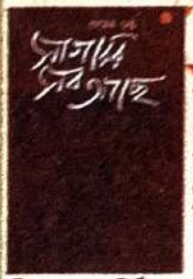

স্মরণ

১২

তিনি নক্ষত্র হতে জানতেন

জাকির হুসেন। সৃজনশীলতাকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।
তাল, লয়, সুর ও সঙ্গীতবোধে হয়ে উঠেছিলেন আইকন।
লিখছেন পায়েল সেনগুপ্ত।

শেষকথা

৯০

ক্ষয় হয়, ভয় হয়

দেশের সংবিধান প্রণেতার আদর্শকে আমরা আত্তীকরণ করিনি, বরং
নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী তাঁর নামটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছি।
লিখছেন নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

মন্তব্য ৮

স্মরণ

জাকির হুসেন • পায়েল সেনগুপ্ত ১২

গল্প

উপেনবাবুর মেয়ে • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৪
ফুলের তোড়া • তিলোত্তমা মজুমদার ১৮
রক্ষক • নন্দিতা বাগচী ২২
ভালবাসার গল্প • স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ২৯
১৯৬৪ • বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
কবিতার খাতা • বিমল লামা ৩৭
কলের গাড়ি • শেখর মুখোপাধ্যায় ৪১
সুপর্ণা এবং সুপর্ণা • প্রচেত গুপ্ত ৪৫
আশনাই • ঝিমলি নন্দী ৫০
সুখলালের কিস্‌সা • শুভ্রদীপ চৌধুরী ৫৫
পথ • শ্রীকান্ত অধিকারী ৬০
লিপস্টিক • সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ২২

ধারাবাহিক উপন্যাস

কুমারী রানির ডাক্তার • মৈত্রী রায় মৌলিক ৬৯

ধারাবাহিক রচনা

মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনায় • নিখিল সুর ৭৩

শিল্পসংস্কৃতি ৭৮ • গ্রন্থলোক ৮৩ • চিঠিপত্র ৮৬ • সুদোকু ৮৮
নামমাত্র ৮৯ • শেষকথা ৯০

প্রচ্ছদ: বৈশালী সরকার

দেশ ওয়েবসাইট: www.desh.co.in
ইমেল: desh@abp.in

মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা

সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ সিপি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল : ১.০০ টাকা (আন্দামান, মণিপুর, ত্রিপুরা ও অসম)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা বাঞ্ছনীয় নয়।

Rs. 35.00

Edited by Suman Sengupta and printed and published fortnightly
by Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

RNI vol. 68 issue 5 Regd 2537/57

চার দশকের কেতাবি সফর

নির্মাণে বিনির্মাণে, মন
গতানুগতিকতা চুরমার
করতে, বাংলা গ্রন্থ-প্রক
প্রতিভাস এখন দুঃসাহসী
সংস্কৃতির সর্বস্রোতে সাঁতা
প্রতিভাস পরম পরিচয়ের
ফেলেছে একটি শব্দে : কেতা
পাঁচটি বইয়ের পাঞ্চজন্য
যাত্রা শুরু করে, ৩৯ বছরের
পেরিয়ে, প্রতিভাস পৌঁছেছে
৩০০০-এর বেশি গ্রন্থ প্রকাশের
গৌরবে। এই যাত্রায় প্রতিভাস
পেয়েছে অজস্র বিদগ্ধ পাঠকের
প্রাণন ও প্রেম। পেয়েছে প্রকাশনার
সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের, লেখক ও
শিল্পীর, ছাপাখানার কর্মী থেকে
বই বাঁধাইয়ের কারিগরদের সংঘবদ্ধ
সহযাত্রা। ৪০-এ পৌঁছে প্রতিভাসের
ঊর্মিল উচ্চারণ। বয়স একটি
সংখ্যা মাত্র, সামনে ক্লান্তিহীন অনন্য
অগ্রসর ও আনন্দ।

৪০

প্রতিভাস

CELEBRATING 40 YEARS OF PRATIVASH
1986-2026

প্রতিভাস
www.prativash.c

নূতনের মধ্যেই বৃহতের সম্ভাবনা

আলোকমালায় সেজে ওঠা রাজপথ। জনতার কলরবে মুখরিত শহর। রাত জেগে থাকা। সম্মিলনে নিজেদের জাগিয়ে রাখা। অতীতের দুঃসহ স্মৃতি আর ভবিষ্যতের অজানা সম্ভাবনা একই কলেবরে এসে দাঁড়াল চলে যেতে থাকা ও এগিয়ে আসতে থাকা দু'টি বছরের সন্ধিলগ্নে। অতীত মিশে গেল ভবিষ্যতের শরীরে। আমরা প্রবেশ করলাম নতুন একটি বছরে। ইংরেজি নববর্ষ। মধ্যরাতের জনজোয়ারে তাকে বরণ করে নিতেই অভ্যস্ত বাঙালি। সেখানে শ্রেণি-বিত্তের ভেদাভেদ নেই। সাহেবি কায়দায় বড়দিনের কেক বিনিময়ে আরম্ভ যে-উদ্‌যাপনের, নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে তার সমাপন। তবে ঘটনাবহুল বছরের শেষার্ধ আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছে, বাঙালি কেবল নিজস্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে নিজের আনন্দে ভেসে থাকে না। অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে তারা একে অপরের হাত ধরে ঋজু দাঁড়িয়ে থাকতেও জানে। পরাধীন দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে বলে বাংলার যে-সন্তানরা নিঃস্বার্থ আত্মদান করেছিল, কন্যার জন্য বিচার চাইতে পথে নেমেছে তাদেরই উত্তরাধিকারী। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছি। দ্রোহের আগুনে নিজেদের শুদ্ধ করতে চেয়েছি। বিগত বছর থেকে এ আমাদের পরম প্রাপ্তি। তবে বিচ্ছেদ-বেদনা-বঞ্চনার পাল্লাও কম ভারী নয়। সাহিত্যে-শিল্পে-রাজনীতিতে-সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, ভারতকে বিশ্বমঞ্চে তাঁদের কৃতিতে আলোকিত করে তুলেছেন, এমন ব্যক্তিত্বদের আমরা হারিয়েছি। বিশ্ব জুড়ে জারি থেকেছে যুদ্ধের আবহ। চলতে থেকেছে সংঘর্ষ। যুদ্ধের কারণে অগণিত প্রাণ গেছে, ঘটেছে হত্যা। আর আমরা দেখেছি প্রকৃতির প্রতিশোধ। দেখেছি প্রযুক্তির পরিবর্তন ও প্রযুক্তিকেই আমাদের চালিকাশক্তি করে মানবসভ্যতার মাথার উপরে ছড়ি ঘোরানো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে। মহামারি-উত্তর বিশ্বে সব কিছু দ্রুত বদলাচ্ছে। কে বলতে পারে আগামী বছরে কোন পরিবর্তন কী সত্য রূপে প্রতিভাত হবে। সাহিত্য তো এ সব থেকে বিযুক্ত নয়। এই সকলের প্রভাবে তারও রূপ বদলেছে, বদলাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে তার আখ্যানভঙ্গি, তার কথনবয়ন, তার অনুভবের দর্শবিন্দু। শুধু চলমান জীবনের কথা নয়, অন্তরঙ্গ, নিভৃত অবলোকনের পরিমিত ভাষ্যও আজ তার আঙিনা আলো করে বসে আছে। সাম্প্রতিক সময়ের আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ধারাপথ অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাব, সাহিত্য সেখানে অপ্রচলিতকেই মূল স্রোতপথ করে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে পাঠকের ভাবনায়। বিগত বছরের আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কারগুলিতেও তার প্রতিফলন। যা কিছু নতুন, তারই মধ্যে আছে বৃহৎ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। *দেশ* বরাবর সেই চারাগাছটিতে জলসিঞ্চন করেছে। গতে বাঁধা ভাবনার শৈবালদামে সে বাংলা সাহিত্যকে রুদ্ধ হতে দেয়নি, বরং অজানা, অচেনা পথে তাকে বয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছে, তার প্রবহমানতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তার সাক্ষ্য *দেশ*-এ প্রকাশিত অসংখ্য ছোট গল্প। অতীত থেকে সেগুলির উজ্জ্বল ছায়া পড়েছে ভবিষ্যতে, সময়কে অতিক্রম করে তারা হয়ে উঠেছে কালজয়ী। একটি বছর যেমন এক-একটি মাসের ঘটনাক্রম ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে বদল এনে দেয় পরের বছরগুলোয়, সাহিত্যও সেই প্রজ্ঞাতেই পাঠককে ঋদ্ধ করে। নতুন বছরের প্রথম সংখ্যায় সেই সাহিত্যের আবাহন। প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের বারোটি গল্প নিয়ে গল্পসংখ্যা। তার প্রতিটিই হতাশার অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের আখ্যান। জীর্ণ ভাবনাকে ত্যাগ করে সজীব চিন্তা পরিধান। সেই আশা বুকে নিয়ে নতুন বছর স্বাগত।

শ্রীমনমোহন সিংহ (১৯৩২-২০২৪)

দৃ ষ্টি কো ণ

সমাজের শিকড়ে

মানুষ যে ভাবে ৯ অগস্টের পর একটা সমাজে সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছিল, তার পিছনে ছিল হৃদয়ের জোরালো টান।

যুদ্ধ শেষ। উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম উপদেশ দিচ্ছেন বিজেতা রাজাকে: 'রাজলক্ষ্মী অতিশয় চঞ্চলা। যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি লক্ষ করিলেই তিনি নৃপতিকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তাঁহাকে দীর্ঘকাল একস্থানে রাখা শক্ত।' এ সব মহাভারতের কথা। আমাদের সমাজে নৃপতি নেই, আমাদের শাসক নির্বাচিত হন। সুতরাং তিনি বলতেই পারেন, আমার ত্রুটি বলে কিছু নেই, রাজ্যশাসনে ত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে, তা হলে তার দায় নিতে হবে নির্বাচকমণ্ডলীকেও। কারণ, এটা গণতন্ত্র। অতএব আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-ছাত্রীটিকে হত্যা 'যদি কেউ করে থাকে', তা হলে তার দায় রাজ্যের শাসকের নয়, সে দায় সকলের।

'যদি করে থাকে' মানে কী? তাকে যে হত্যা করা হয়েছে, সেটা তো সকলেই জানে।

সকলে জানলে তো হবে না। প্রমাণ চাই। বিচারবিভাগ লোকসংবাদের ভিত্তিতে চলে না, চলে প্রমাণের ভিত্তিতে। এখনও প্রমাণ দূরের কথা, আমজনতা শুনতে পেল এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পেল, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র রুজু করতে পারেনি তদন্ত সংস্থা, অতএব তারা জামিনে মুক্ত। রাজ্যশাসক বলবেন, আমাদের কী করা? তোমরাই তো চেয়েছিলে, সিবিআই তদন্ত করুক। ব্যস, মিটে গেল! বিচার প্রক্রিয়া তার মতো করে চলবে।

কিন্তু সমাজ কি স্থবির হয়ে বসে থাকবে? ২০২৪-এর ৯ অগস্টের পর যে-সমাজের ক্ষোভ, ক্রোধ এবং অবিমিশ্র ঘৃণা জন্ম দিয়েছিল ভালবাসার এক ভিন্নতর রূপ, যে-সমাজ পথে নেমে দাবি করেছিল, বিচার চাই, সেই সমাজও কি তদন্তকারী সংস্থা কবে প্রমাণ হাজির করবে, তার পথ চেয়ে বসে থাকবে? বর্ষশেষে, এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—যে-ক্ষুদ্র কোটরগুলো ভেঙে, শ্রেণি-লিঙ্গ-জাতি-ভাষা-র ভেদাভেদগুলোকে মিলিয়ে দিয়ে গড়ে উঠেছিল এক বৃহত্তর সামাজিক সত্তা, তা কি আবার ভেঙে ভেঙে যে-যার কোটরে ঢুকে যাবে? সমাজ বলে কি কিছুই থাকবে না? এই প্রশ্ন, বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকা শোক, ক্ষোভ এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতারণার ক্ষত বুকে নিয়েই নতুন বছর শুরু হচ্ছে।

সমস্যা হল, আমরা যত তীব্র ভাবে মনে রাখি, আমরা মহাভারতের যুগে নেই, ততই দ্রুত বিস্মৃত হই যে, আমাদের সমাজে অষ্টাদশ দিবসীয় কোনও নির্ণায়ক যুদ্ধ নেই। আমাদের প্রতিটি পলই যুদ্ধের পল, আমাদের সমবেত প্রতিবাদ যেমন একটা যুদ্ধ, তেমনই নিজের নিজের খোপে ঢুকে পড়াটাও একটা যুদ্ধেরই অংশ। এই কথা মনে রাখলে, বিচারকদের কাছে প্রমাণ হাজির না হওয়ার কারণে, অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি পাওয়া নিয়ে হতাশা উদ্‌যাপন করার বদলে অন্য কিছু ভাবতে পারি। যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্নতার কথা স্মরণে রাখলে আমরা হয়তো 'কিছুই তো হল না'-র নির্মিত বঞ্চনাবোধের আশ্রয় থেকে নিজেদের বের করে আনতে পারি খোলা আকাশের নীচে, খুঁজতে পারি যুদ্ধের নতুন আয়ুধ।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ৯ অগস্ট সকাল থেকে বাংলার সমাজচিত্রটা যেমন ভাবে বদলে গিয়েছিল, উৎপীড়িত মানবসত্তার উপলব্ধি থেকে, মন্ত্রী, আমলা, বিচারক, পুলিশ, তদন্তকারী সংস্থা—এই সবের গোলোকধাঁধায় ঘোরার মতো পরিস্থিতিতে ফিরে এসে পরাজয়ের গ্লানি আমাদের ঘিরে ধরে। আর এখানেই আমাদের আসল যুদ্ধ, নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ। দুর্ভাগ্য বলে কথিত, কিন্তু আসলে শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া এই ভবিতব্যের বিরুদ্ধে পথের লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের লড়াই চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

লড়াইটা কঠিন। ৯ অগস্টের পর প্রায় দুই মাসাধিক কাল মানুষ যে ভাবে একটা সমাজে সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছিল, তার পিছনে ছিল হৃদয়ের জোরালো টান। নিহত ছাত্রী তার প্রাণ দিয়ে যে-টানটা তৈরি করে গেল, যাতে মানুষ নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়গুলো ভুলে মানুষের বড় পরিচয়ে রাস্তায় নেমেছিল,

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সায়নদেব মুখোপাধ্যায় কিশোরদের জন্য লিখেছেন সায়েন্স ফিকশনের মোড়কে দেশ-বিদেশে অভিযানের গল্প

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হুকাকাশি, শিব্রামের কলকে কাশির পর বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় কাশি প্রফেসার টাকাশি কেশোরুগির

ডক্টর টাকাশি কেশোরুগির

সায়েন্স ফিকশন অ্যাডভেঞ্চার

ফাঁপা কার্তুজ ৫০০

১৯৬৫ — আন্দামান এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সুদান, ইথিয়োপিয়া, জিবুতি, সোমালিল্যান্ড ও এরিট্রিয়া। প্যালেয়োন্টোলজি বা ফসিল বিজ্ঞান এবং ইভোলিউশন বিজ্ঞানের সঙ্গে উগ্র মৌলবাদে বিশ্বাসী ধর্মান্ধদের সংঘাত।

প্রবালের হাড় ৫০০

১৯৬৭ — বোম্বে এবং ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল। অ্যান্টিসাবমেরিন ওয়ারফেয়ার, সামুদ্রিক প্রাণী ও সমুদ্রতত্ত্ব।

উকুনের নাচ ৫০০

১৯৬৯ — সুদান ও সংলগ্ন 'সাহেল' মরুভূমি। এককোশী থেকে বহুকোশী প্রাণীদের সৃষ্টি, কীটতত্ত্ব, এবং 'সুপার অর্গানিজম'-এর বিশেষত্ব।

কর্কট হাউই ৫০০

১৯৭০ - বোম্বে ও কেরালা রকেট টেকনোলজির বিবর্তন ও ধ্বংসকারী মিসাইলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রধাসকল।

ডক্টর টাকাশি কেশোরুগির নেতৃত্বে কয়েকজন অধ্যাপক গবেষক ছাত্র বছরের পর বছর বিশ্ব জুড়ে অন্বেষণ করে চলেছেন সত্যের, বিজ্ঞানের।

এই সিরিজের প্রথম বই শকের তুণ উপহার হিসেবে দেওয়া হবে কেশোরুগির পাঠকদের

অভিযান পাবলিশার্স

বিক্রয়কেন্দ্র

অভিযান বুক ক্যাফে

১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭৩

কল/হোয়াটস্যাপ ৮০১৭০৯০৬৫৫

রাজনীতি এর নিষ্পত্তি করবে না, যা করার আমাদেরই করতে হবে। প্রতিবাদ এখনও চলছে

সমাজের নানা টানাপড়েনে সেই ভালবাসা থেকে উঠে আসা ন্যায়বিচারের দাবি ক্রমশ স্তিমিত হতে লাগল। ক্রমে দুঃখের হলেও সত্যি, নির্যাতিতার বড় রূপটি — সমাজের সকল নিপীড়িতের প্রতিনিধি — ছোট হতে হতে কেবল চিকিৎসক রূপটিতে এসে থামল।

এখানেই মস্তিষ্কের লড়াইয়ের প্রাসঙ্গিকতা। মহাবিপর্যয় আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিল একটা সুযোগ — যে দেহটা নিয়ে মানুষের মানবিক অস্তিত্ব, যার পরিচর্যার সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল আর জি কর এর শহিদ, সেই দেহটাকে সামাজিক আলোচনা ও কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলে মানুষে মানুষে ভেদগুলো দূর করা। আর জি কর এর ঘটনা তো কোনও একক বা যূথবদ্ধ বা পাশবিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন কুকর্মীর কাজ মাত্র নয়। এ ঘটনা গোটা ব্যবস্থার। সেই ব্যবস্থার প্রধান দুর্বৃত্ত মানুষে মানুষে ভেদ। তুমি গরিব, অতএব তোমার দেহটা দেহ নয়, আর আপনি বড়লোক, আসুন বসুন, ঘরে বাতাস কর, বাবুর গরম লাগছে! ধনী গরিবের পার্থক্য আবার এসে মেলে অন্য এক বিন্দুতে, সেটা ক্ষমতার বিন্দু, গলার জোরের বিন্দু। গরিবের টাকা নেই, ক্ষমতা নেই, গলার জোর নেই, অতএব তার দেহটা নিয়ে না ভাবলেও চলে।

এখানে শাসকের ভূমিকা বঞ্চিতদের বিরুদ্ধে। মানুষের উপর, স্বাস্থ্যব্যবসায়ীর শোষণের উপর, কোনও বাধা না দিয়ে,

মহাবিপর্যয় আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিল একটা সুযোগ — যে দেহটা নিয়ে মানুষের মানবিক অস্তিত্ব, যার পরিচর্যার সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল আর জি কর এর শহিদ, সেই দেহটাকে সামাজিক আলোচনা ও কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলে মানুষে মানুষে ভেদগুলো দূর করা।

উল্টে তার পক্ষেই সে কাজ করে। সরকারের অগ্রাধিকার ব্যবসায়ীর স্বার্থরক্ষা। এর ফল যা হওয়ার তা-ই হয়, খেটে খাওয়া মানুষের আয়ু হয় সংক্ষিপ্ত, আর শাসক সমর্থকরা হয় দীর্ঘজীবী। এই বৈষম্যই ভিন্ন রূপে দেখা দেয় স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে, যেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা তো দূর, শাসক বরং উৎসাহ দেয় স্বাস্থ্যের ব্যবসার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়িয়ে তোলার জন্য। মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি, বেড়ে চলে শ্রেণি বিভাজন। চিকিৎসা ব্যবস্থাতেই তৈরি হয় নানা উঁচু-নীচু সিঁড়ি, একবারে নীচের তলায় থাকেন অতি সামান্য মজুরিতে কাজ করা স্বাস্থ্যকর্মী — প্রধানত মহিলা, আর উপরের দিকে থাকেন চিকিৎসকরা, যাঁদের একাংশ মানবসেবার শপথ নিয়েও মানুষের দেহটাকে করে তোলেন মুনাফা বাড়িয়ে চলার উপায় হিসেবে। কখন যে এই শপথ তাঁদের ভুলিয়ে ফেলে দেয় বিস্তৃত এক ফাঁদে, তাঁরা হয়তো টেরও পান না।

অথচ বাংলার দুর্ভাগ্য, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে একদা আন্দোলনের পথ

[illegible] সেবার এই [illegible] রাজনীতিতেও [illegible] উঠেছিল বিতর্কের ঝড়। কারণ রাজনীতির এই দিকটাও, অন্যান্য, আপাত [illegible] বেশ কিছু [illegible], সুস্পষ্ট এক সামাজিক প্রতিক্রিয়া। কারণ মানুষের মনে হয়েছিল, রাজনীতি এর উত্তর দিতে পারে না, যা করার আমাদেরই করতে হবে। এবং এই অভিজ্ঞতাকে [illegible] রাষ্ট্র, সুশাসন ও সামাজিক নীতি [illegible] বিস্তৃততর হয়েছিল। কিন্তু সমাজের প্রতি [illegible] দাঁড়িয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমাজের ভূমিকাতেও [illegible] এ ভাবে রাজনৈতিক [illegible] ও [illegible], তা আমাদের [illegible] সমাজের উপরেই [illegible] দিয়েছিলেন। কারণ, রাজনীতির [illegible] হয়ে উঠে [illegible] হয়েছিলেন।

তা হলে কি সেই সুযোগে আমরাই বিকল্প হবো? কিছুই হবে না? না, হওয়ার অনেক কিছু আছে। সেটা আবার গোড়া থেকে [illegible] করতে হবে। অনেকে নিজে [illegible] তবেই হয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন বঞ্চনাগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইটাকে প্রাধান্য দেওয়া; প্রশ্ন, যে লড়াইটা দেখার হবে সেটা কি কেবল হাসপাতালের উন্নতির দাবিতে আন্দোলন? যদি স্বাস্থ্যকে তার প্রকৃত স্বরূপে উপলব্ধি করে, একটি স্বাস্থ্য আন্দোলন আজ যাঁরা স্বাস্থ্য আন্দোলন করছেন বলে দাবি করছেন, তাঁদের অনেকেই স্বাস্থ্যের অতীব সংকীর্ণ [illegible] হয়েই লড়ছেন। অর্থাৎ, স্বাস্থ্য মানে ডাক্তার, চিকিৎসা, হাসপাতাল ইত্যাদি — এই দৃষ্টিতে দেখছেন। পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবেশ, ইত্যাদি সামাজিক নির্ধারকগুলো নিয়ে তাঁদের বক্তব্য সীমিত। কিন্তু স্বাস্থ্যের সামাজিক রূপের মধ্যেই নিহিত আছে, সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রধান উপাদান, সুস্বাস্থ্যের দাবিতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেগুলোর অনেকটা মোকাবিলা করা যায়।

এই আন্দোলনের একটা প্রধান দাবি অবশ্যই হবে, কোনও মানুষই যাতে কোনও ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবাই প্রথম শর্ত এবং, যাতে সকলেই সেই সুযোগ পান, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে অসুখের চিকিৎসা এলাকার মধ্যেই পান, এটা নিশ্চিত করতে পারলে হাসপাতালের ওপর চাপ কমবে, আর জি কর-এর মতো ঘটনা ঘটানোর সুযোগও কম পাবে দুষ্কৃতীরা।

এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের সামাজিক সংযোগগুলো নিয়েও ভাবতে হবে, বলতে হবে। খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে উন্নতি ঘটানো যায়, তার অনেক প্রমাণ আছে। স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা চালানো, তাঁদের সঙ্গে, এবং তাঁদের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য নিয়ে এলাকাভিত্তিক সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া, এই আন্দোলনের একটি বড় দিক হতে পারে। সৌভাগ্য, সীমিত সুযোগের মধ্যে হলেও সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া মানুষজনের মধ্যে থেকে এরকম একটা আন্দোলন উঠে আসছে। অতি সম্প্রতি AMMA (অ্যাসোসিয়েশন অব মিড ডে মিল অ্যাসিস্ট্যান্টস) নামে সংগঠনের ডাকে কলকাতায় কয়েক হাজার মিড ডে মিল কর্মী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের এক সমাবেশ হয়। এর দাবি ছিল, আর জি কর-এর ঘটনার বিচারের পাশাপাশি সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা। সকলেই যাতে এলাকার মধ্যে চিকিৎসা পান, তার নিশ্চয়তা। সমাজকে যদি প্রকৃতই অধিকারবান হতে হয়, তা হলে এই শ্রমজীবীদের কাছ থেকে শিখতে হবে, কী ভাবে ব্যক্তির দুঃখকে সামূহিক [illegible] গড়ে তুলতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় শুধু নয়, সঙ্গে [illegible] কর্মীদেরও আমাদের দৃষ্টির কেন্দ্রে স্থাপন করতে হবে। সকলে সুখী হলে আমিও সুখী হব— এই বার্তা নিয়েই আমাদের নতুন বছর শুরু হোক। মনে রাখতে হবে, [illegible] রাজধানী [illegible], মানুষের লক্ষ্মী [illegible] উন্মুখ।

অভিজিৎ চৌধুরী

দাবায় সাফল্য

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি—বিশ্বসেরাদের কোনও তালিকা যদি করা যায়, অনায়াসেই চলে আসবেন বেশ কয়েকজন ভারতীয়। সাম্প্রতিক সময়ে গুকেশ ডোম্মারাজু-র সঙ্গে যুক্ত হল কোনেরু হাম্পির নাম। উইমেন্স ওয়ার্ল্ড র‍্যাপিড চেস-এ চ্যাম্পিয়ন হলেন হাম্পি, ২০১৯-এর পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। একমাত্র চিনের জু ওয়েনজুন-ই দু'বার এই খেতাব পেয়েছেন। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ১১ রাউন্ড লড়াইয়ের শেষে জয়ী হন হাম্পি।

খাদ্য, গ্রন্থ, দক্ষিণ এশিয়া

'চৈনিক খাই কিনল আর আমি পোলাও খেলাম'। ব্যাপারটা কতকটা এরকমই। আমেরিকা 'ফুড ফর পিস'-এর পথে হাঁটল, আর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত আট লক্ষ বই, পত্রিকা জমে গেল। কীভাবে? সে-তথ্যই জানা গিয়েছে সম্প্রতি। ১৯৫৪ সালে আমেরিকার ৩৪তম প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট আইজ়েনহাওয়ার-এর সময়ে লাগু হয়েছিল পাবলিক ল (পিএল)-৪৮০, যা 'ফুড ফর পিস' নামে পরিচিত। এই আইনের বলে ভারতসহ অন্যান্য দেশগুলি নিজেদের মুদ্রার সাহায্যে আমেরিকা থেকে শস্য কিনতে পারত, বিশেষত পাঁচ এবং ছয়ের দশকে খাদ্যদ্রব্যের অভাবের সময়ে ভারত প্রভূত সাহায্য পেয়েছিল। আর এরই প্রেক্ষিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক ডজন ইউনিভার্সিটি লোকাল কারেন্সি ফান্ড ব্যবহার করে ক্রয় করত এক-একটি দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামগ্রী, যেমন বই, পত্রপত্রিকা, ফোনোগ্রাফ রেকর্ড ইত্যাদি। ভারতে কর্মরত ব্যক্তিরা খুঁজে বেড়াত মূলত 'রিসার্চ লেভেল মেটেরিয়াল'। এভাবেই ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর লাইব্রেরিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বিপুল সংগ্রহ। ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট জানায়, 'দি ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো ইজ় হোম টু ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'স গ্রেট কালেকশনস ফর দ্য স্টাডি অফ সাউথ এশিয়া'।

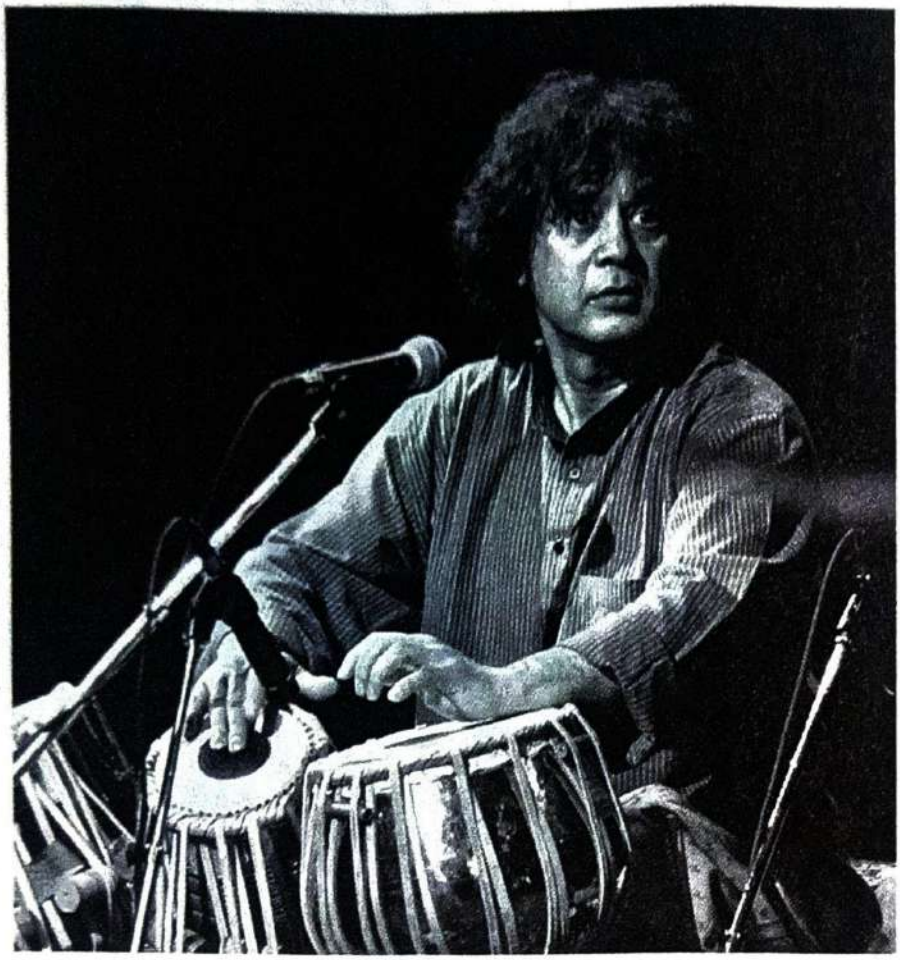

জাকির হুসেন (১৯৫১-২০২৪)

তিনি নক্ষত্র হতে জানতেন

পায়েল সেনগুপ্ত

আলোর মতো ছিল তাঁর উপস্থিতি। এক নক্ষত্রের আলো, যার চারপাশে অনেক সুর, লয়, তাল খেলা করে গিয়েছে। তিনি এলেই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত চারপাশ। তিনি আসলে কে, একথা বোঝার অনেক আগেই কিন্তু তাঁর পরিচয় তৈরি হয়ে গিয়েছিল একজন আইকন হিসেবে। একঝাঁক চুল, বাঙ্ময় চোখ আর নির্মল হাসির জাকির হুসেনের সঙ্গে তবলা ব্যাপারটা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। মানুষ এই ব্যক্তিত্বকে আগে চিনেছিল, নাকি তাঁরই হাতে কথা বলতে থাকা তবলা নামের যন্ত্রটির কারসাজিতে মুগ্ধ হয়েছিল বলা কঠিন। কিন্তু ৭৩ বছর বয়সে তাঁর এই প্রস্থান (সংবাদ হিসেবে কিছুটা আকস্মিকও বটে) যেন একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর মতো আরও অনেক কিছুই অন্ধকার করে দিল। তবলাও যেন হারাল তার জৌলুস। সারা পৃথিবীতেই যে-হাতের স্পর্শে জেগে উঠেছিল তার যৌবনের উদ্দামতা, থেমে গেল শেষ পর্যন্ত কেমন যেন এক অনিশ্চয়তায়। কারণ জাকির হুসেনের আগেও কেউ ছিলেন না, তাঁর মতো, পরেও কেউ হবেন কি?

জাকিরের আগেও তবলার গুরুদায়িত্ব বহন করে নিজেদের স্বনামধন্য করে তুলেছিলেন পণ্ডিত শামতাপ্রসাদ, আনোখিলাল মিশ্র এবং কিষেণ মহারাজ। জাকিরের পিতা আল্লারাখা কুরেশিও তখন পণ্ডিত রবিশঙ্করের ছত্রচ্ছায়ায় ক্রমশ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছেন। ১৯৫১ সালে জাকিরের জন্ম। দেশে খুব বেশিদিন থাকা হয়নি জাকিরের, বাবার সঙ্গে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন অনেক ছোট বয়সেই। কিন্তু তবুও জাকিরের নিজের জায়গা যেন মুম্বই-ই থেকে গিয়েছে। বারবার নিজের শিকড়ে ফেরার মতো তিনি ফিরে এসেছেন মুম্বইতে। সারা পৃথিবীতে খুব ছোট বয়স থেকেই পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ আলি আকবর খান, উস্তাদ বিলায়েত খানের মতো শিল্পীদের সঙ্গে একের পর এক কনসার্ট করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়া জাকির কিন্তু মুম্বইতে নিজের কাজ করার কথা ভোলেননি। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির নানারকম কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। মেনস্ট্রিম তবলা পারফরম্যান্সের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সৃজনশীলতাকে অন্য পথে চালনা করেছিলেন তিনি, যেখানে তাল, লয়ের সঙ্গে সুর ও সঙ্গীতবোধেও তৈরি করতে চেয়েছিলেন নিজের পরিচয়। ১৯৭৩ সালে জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে প্রথম অ্যালবাম বেরোয়, *লিভিং ইন দ্য মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড*। এর পর একের পর এক শিল্পীর সঙ্গে অ্যালবাম বের হয় তাঁর। জাকির হুসেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি জুড়ে অনেকটাই রয়েছে বিদেশের নানা অ্যালবামের কাজ। Beats & Rhythm—বৈচিত্র তিনি এনেছেন দেশি-বিদেশি নানারকম পারকাশনে। পারকাশনিস্ট মিকি হার্টের সঙ্গে প্ল্যানেট ড্রাম দিয়ে শুরু সিরিয়াস ফিউশন কাজ। এরপরই *শক্তি* ব্যান্ড তৈরি হয় গিটারিস্ট জন ম্যাকলফলিন, ভায়োলিন বাদক এল শঙ্কর, ভিকু বিনায়করাম ও জাকিরকে নিয়ে। ২০২৪ পর্যন্ত সাতটি গ্র্যামি নমিনেশন ও চারটি গ্র্যামি পুরস্কার, ভারতীয় সঙ্গীতজগতে গর্ব করার মতো অনেক সুযোগ তিনি দিয়েছেন। দেশে-বিদেশে তিনি বহু সম্মান পেয়েছেন। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সঙ্গীতের নানা ধারায়। ফিল্ম মিউজিকেও রেখেছেন স্বকীয় ছাপ। কিন্তু এগুলির কোনওটি দিয়েই হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পসত্তাকে বিচার করা যাবে না, কারণ তিনি আসলে ছিলেন একটি আলোকবর্তিকা। যেখানেই তাঁর উপস্থিতি, সেখানেই আলো ঝলমল। কারণ তিনি নক্ষত্র হতে জানতেন।

নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, জন্মের ঠিক পরেই নাকি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বাবার কোলে। রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী ছেলের কানে কিছু শব্দ উচ্চারণ করার ছিল তাঁর। বদলে তিনি সদ্যোজাতর কানে মন্ত্র দিয়েছিলেন তবলার ঠেকা। ছেলেবেলা থেকে তবলার বোলই হয়ে উঠেছিল জীবন। বাবার কাছে তালিম পেলেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন সব বড় শিল্পীরই রীতি-নীতি কৌশল। কোনও নির্দিষ্ট ঘরানায় নিজেকে বাঁধা পড়তে দেননি জাকির কখনওই। শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর থেকে যে শৈল্পিক সৌধ নির্মিত হয়েছিল তাঁর হাতে, সেই কৃতিত্ব সম্পূর্ণত তাঁর একার। বাবার 'কমফর্ট জোন' ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোনও সযত্ন প্রয়াস তাঁর ছিল না। কিন্তু সবরকম সীমাবদ্ধতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার স্ফুরণ তাঁর ছিল। ঈশ্বরপ্রদত্ত তাঁর হাতের দক্ষতা, অতুলনীয় তার

চলন, দ্রুততা এবং ত্রুটিহীনতা। তবলা নামক বাদ্যযন্ত্রটির উপর ব্যক্তি হয়ে ওঠা সেই হাতের আঙুলে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সব কারুকাজ। তার মধ্যে ঘরানাগত বোল যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে তাকে অতিক্রম করে সাধারণ শ্রোতার কাছে পৌঁছোনোর পথ। সেই পথ দিয়েই তিনি এগিয়েছেন আজীবন।

প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রেরই এক নিজস্ব দর্শন থাকে। তবলার ক্ষেত্রেও তাই। জাকিরের পূর্বসূরিরা জ্ঞান, গভীরতা ও দক্ষতার দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন অবশ্যই, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের দাবি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করেছিলেন জাকিরই। আজীবন যে যন্ত্রকে অন্য কিছুর সঙ্গে সঙ্গতে দেখতে বা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল শ্রোতারা, জাকির ভেঙে দিলেন সেই প্রাচীর। আবিষ্কার করলেন তার নিজস্ব ভাষা। টেকনিক্যাল দক্ষতা ছিল অকল্পনীয়। তাই তবলার বোল দিয়েই তৈরি করেছিলেন দৈনন্দিন যাপনের নানা টুকরো ভূমি। কখনও শঙ্খনিনাদ, কখনও রেলগাড়ির শব্দ, কখনও মেঘগর্জন, বোল এবং শব্দের সমন্বয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন এক অন্য জগৎ। ঠেকা, উঠান, পরন, টুকরা তেহাইয়ের দুনিয়াতে আটকে থাকেনি তবলার বোল। জাকিরের হাতে তবলা অভ্যস্ত ছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন জাকির হুসেন। যাঁরা তবলাকে চিরকাল সঙ্গত হিসেবেই জেনে এসেছেন, তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন এক নতুন আইডেন্টিটি। তবলা দিয়েও এক অভিনবত্ব আনা যায় সঙ্গীতের জগতে, এই বিশ্বাস তৈরি করতে পেরেছিলেন জাকির। তাঁকে অনুসরণ করেছে সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্ম।

প্রত্যেক ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে যেমন সচিন তেন্ডুলকরের মতো হয়ে ওঠা একটা স্বপ্ন, ঠিক তেমনই জাকির হুসেনের মতো একজন আইকন হয়ে ওঠা তবলাশিল্পীদের কাছেও এক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। সেটা মেনে নিতে গিয়ে তাঁর বডি ল্যাঙ্গোয়েজ, ফ্যাশন এমনকি হেয়ারস্টাইলও অনুকরণ করেছেন অনেকে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগৎ থেকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে খুব কম শিল্পীই উঠে আসতে পেরেছেন। জাকির

সুনিপুণ ঠেকা বাজাতে পারেন কিনা, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল, যে দ্রুতিতে তিনি তবলার বোলের বৈচিত্র আনতে পারেন, সেকরকম আর কেউ পারেন কিনা! সাফল্য ও ক্যারিশমা যখন কোথাও গিয়ে মিলন ঘটায়, তার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্য।

শক্তি: ভিকু বিনায়করাম, এল শঙ্কর, জন ম্যাকলফলিন, জাকির হুসেন

আবিষ্কার করল তার নিজস্ব পরিচয়, ঠিক যেমন কত্থকের ক্ষেত্রে এই চমক এনেছিলেন পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। শিল্পের ব্যাকরণগত ভাষা থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন কাব্য মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছেছে কয়েকজন মানুষের হাত ধরে। জাকির হুসেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতেই থাকবেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমা। মঞ্চে তাঁর চলন-বলন, উপস্থাপনা শৈলী, মঞ্চে আসীন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর রসায়ন, সব মিলিয়ে তাঁর একটা 'অরা' তৈরি হয়েছিল। জাকির নিজেই নিজেকে 'আইকন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবলাকে সকলে যেভাবে দেখতে জাকির হুসেন সেই পথ নিজের জন্য তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন, স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন উপযুক্ত। শুধু তাঁর প্রয়াণে একটাই কথা বারবার মনে হয়, তবলা কি এবারে হারিয়ে ফেলবে তার নিজস্ব পরিচয়? শিল্পীই যখন শিল্পকে এক অনন্য মাত্রা দেন, শিল্পও একইভাবে খুঁজে নেয় তার স্রষ্টাকে। জাকির হুসেন ও তবলা সারা পৃথিবীতে সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন। এমন ব্যতিক্রম আর হবে কি? *নিউ ইয়র্ক টাইমস* যাঁর প্রসঙ্গে লিখেছিল, "blur of his fingers rivals the beat of a hummingbird's wings", তার শিহরন হয়তো এখন থেকে সত্যিই রেকর্ডে থেকে গেল। ■

প্যাপিরাস নিবেদিত চিন্তার সাহিত্য

সাহিত্য ও সমাজ

শঙ্খ ঘোষের
শব্দ আর সত্য ১৫০
নিঃশব্দের তর্জনী ২০০
ঐতিহ্যের বিস্তার ৩০০
ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম ৫০০
ইকবাল থেকে ৫০০
ছেড়ে রেখেই ধরে রাখা ৪০০
কবির ৭৭তম জন্মদিনে প্রকাশিত
মুখজোড়া লাবণ্যে ১০০
(অগ্রন্থিত শঙ্খ ঘোষ)

বীণা দে-র
হারিয়ে যাওয়া দিন ৫০০
স. অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

মণীন্দ্রকুমার ঘোষের
শিশির সুধীরের সঙ্গে ভাষালাপ ৪০০

ভবেশ দাশের
ইথারে ভাসা কথাগুলি
(আকাশবাণী থেকে সমীক্ষায় প্রচারিত কথিকাগুচ্ছ)
১ম ও ২য় প্রতি খণ্ড ৫০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
ভূতের বেগার ১৮০

সুজিৎ চৌধুরীর
প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য ২০০
কিংবদন্তীর পুনর্বিচার

শ্রীলা বসুর
পরিচয় পত্রিকা ও কয়েকজন ১০০

পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মিত্র সম্পাদিত
সেই দশক ২৫০
নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা

শিশিরকুমার দাশের
ভাষা জিজ্ঞাসা ২০০
কাব্যতত্ত্ব: অ্যারিস্টটল ১৩০

সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব ৪০০

চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর
হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান ২০০
অলোক রায় সম্পাদিত

বিহারীলাল চক্রবর্তীর
সারদামঙ্গল ও সাধের আসন ১৮০
তপনকুমার ঘোষ সম্পাদিত

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল-এর
স্রোতের তৃণ ২০০
আত্মকথা ও অন্যান্য রচনা

বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম-চর্চা ৪০০

হিতেশরঞ্জন সান্যালের
স্বরাজের পথে ৩০০

রুশতী সেনের
বিভূতিভূষণ : ছন্দের বিন্যাস ৩৫০
সত্যজিতের বিভূতিভূষণ ২০০

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বাংলা উপন্যাসে 'ওরা' ২৫০

অভ্র বসুর
বাংলো স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান ৪০০

আশীষ লাহিড়ীর
কোন সে ঝড়ের ভুল ১৫০

রবীন্দ্রনাথ

শঙ্খ ঘোষের
হে মহাজীবন ২৫০
গান ও রচনার সংকলনে রবীন্দ্র-ভাবনার পথরেখা
কবির অভিপ্রায় ২০০
নির্মাণ আর সৃষ্টি ৪০০
এ আমির আবরণ ২৫০
উর্বশীর হাসি ৩০০
দামিনীর গান ১৫০

সুভাষ চৌধুরীর
গীতবিতানের জন্মকথা ১০০০
(পরিবর্ধিত ও সংযোজিত সংস্করণ)

সমীর সেনগুপ্তের
গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ ৪০০

আলপনা রায়ের
আলাপ থেকে বিস্তার ১৫০

সুজিতকুমার মণ্ডল সম্পাদিত
বিদেশী ফুলের গুচ্ছ ৭০০
বিদেশী ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথ অনূদিত কবিতা-সংকলন

চিন্মোহন সেহানবীশ
রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা ২০০

লেওঁত্র ভাঙ্গিয়া-র
ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ২০০
অনুবাদ : নন্দদুলাল দে

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর
রঙ্গমঞ্চের কবিকাহিনী ১৫০

কবিতা চন্দের
কবিচেতনায় নৃত্য ও নটরাজ ১৫০
ওই খেলা, ওই গান ২৫০

সুব্রত রুদ্রের
কাদম্বরী দেবী ১৫০

শেখর সমাদ্দারের
বিসর্জন: রূপে-রূপান্তরে ১৫০

সুধীর চন্দের
রবীন্দ্রসংগীত : রাগ-সুর নির্দেশিকা ৩০০

মনস্বিতা সান্যালের
রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক নারী-সাহিত্যিক ২০০

দেশ-বিদেশের মনীষীদের জীবনকথা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *রামমোহন* • শঙ্খ ঘোষের *বিদ্যাসাগর* • শিশিরকুমার দাশের *মাইকেল* • সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *জগদীশচন্দ্র* • জয়দীপ ঘোষের *প্রফুল্লচন্দ্র* • মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নজরুল* • অভীক মজুমদারের *ডিরোজিও* • সুতপা ভট্টাচার্যের *রোকেয়া* • প্রতিমা ঘোষের *বুদ্ধদেব* • একরাম আলির *অতীশ দীপংকর* • দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চৈতন্যদেব* • উদয়কুমার চক্রবর্তীর *নানক* • পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রামপ্রসাদ* • সন্দীপ মুখোপাধ্যায় *শ্রীঅরবিন্দ* • ভাস্কর চক্রবর্তীর *বিবেকানন্দ* • শর্মিলা বসু দত্তের *নিবেদিতা* • ইন্দ্রিতা হালদারের *মজনু শাহ* • মহাশ্বেতা দেবীর *বিরসা মুণ্ডা* • অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের *সূর্য সেন* • সুভাষ ঘোষালের *গান্ধী* • শিপ্রা ঘোষের *বঙ্কিমচন্দ্র* • অভ্র বসুর *রবীন্দ্রনাথ* • সুপর্ণা ভট্টাচার্যের *সুভাষচন্দ্র* • সুধীর চক্রবর্তীর *লালন* • আলপনা রায়ের *আলাউদ্দিন* • অনির্বাণ রায়ের *অবনীন্দ্রনাথ* • শেখর সমাদ্দারের *গিরিশচন্দ্র* • রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর *আশুতোষ*

প্রতিটির দাম আশি টাকা

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা-৪ ফোন: ৭৬০৪০২৫০০৭
E-mail : papyrusbooks@gmail.com

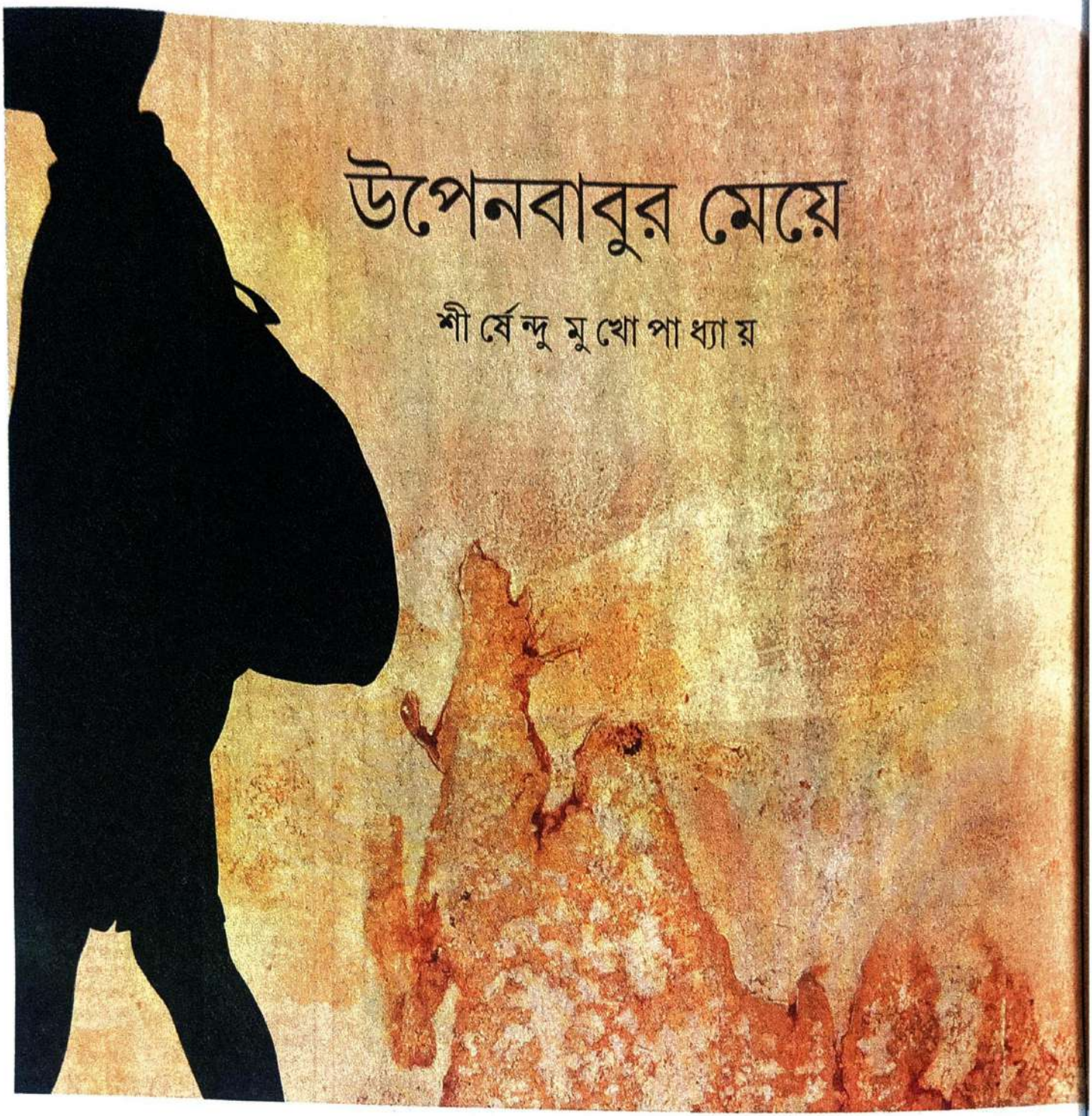

উপেনবাবুর মেয়ে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পিঠে খেলে পেটে সয়, বুঝলেন কি না! উঁহু। কথাটা হওয়া উচিত, পেটে খেলে পিঠে সয়। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

আপনি বিজ্ঞ মানুষ, কত কী জানেন! দুনিয়ার সব গরিবই জানে যে, পেট ভরে খেতে পেলে পিঠে দু'চার ঘা পড়লেও ব্যাপারটা কিছু না। আমল না দিলেই হল। কথাটা বড় জব্বরও বটে। তবে কিনা এই শীতের সকালে হঠাৎ কোথা থেকে একটা হুড়ো বাতাসে গোকুলপিঠের গন্ধটা বয়ে নিয়ে এল, আর আমার নোলাটাও যেন কেমন সকসক করে উঠল। মনে পড়ে গেল, এমন দিনে আমার মা মাঝেমাঝে গোকুলপিঠে বানাত। ওঃ সে যে কী খুনিয়া জিনিস, তা বলে বোঝানো যাবে না!

গোকুলপিঠে! হ্যাঁ, তা বটে। তবে হঠাৎ এই সাতসকালে আপনার গোকুলপিঠের কথাই বা মনে হল কেন বলুন তো! মনে পড়ার কি আর কোনও জিনিস ছিল না? দিলেন তো মুডটা খারাপ করে!

বাতাসে যেমন নানা রকম খড়কুটো উড়ে আসে স্মৃতি জিনিসটা অনেকটা তেমনই আর

কী। হাওয়াবাতাসের ওপর কি আমাদের হাত আছে? গুচ্ছের পুরনো, ভুলে যাওয়া জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে আসে। দাদুর তামাকের গন্ধ, বাবার চটির শব্দ, পিসির ডালের বড়ি, তেমনই মায়ের হাতের গোকুলপিঠে।

স্মৃতি অতি খচ্চর জিনিস মশাই। ওকে লাই দিতে নেই। দাদুর তামাকের গন্ধ ঠিক আছে, বাবার চটির শব্দও না-হয় মানা গেল, পিসির ডালের বড়িও না-হয় সওয়া যায়, কিন্তু গোকুলপিঠে! গোকুলপিঠে তো ডেঞ্জারাস জিনিস মশাই! একে ডিপ ফ্রাই তার ওপর ঘন চিনির রসে জারানো।

আহা খাওয়ার কথা বলছি না। মনে পড়ার কথা বলছি।

আমারও তো তিলে কদমা, দানাদার, জিলিপি, জিবেগজা ইত্যাদি কতকিছুর কথা মনে পড়ে। আমি তাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে মন থেকে বের করে দিই। ওসবের কথা মনে পড়লেও সুগার বেড়ে যায়।

ওটা ভার্চুয়াল সুগার, আসল সুগার নয়। ভয় পাবেন না।

ভয় পাব না মানে! আলবাত ভয় আছে। ভার্চুয়াল সুগার রিয়াল সুগারে কনভার্টেড হতে কত ক্ষণ লাগে মশাই! এই তো গত শনিবার প্রাতঃভ্রমণ করে ফিরছি, কালীতারা মিষ্টান্নভান্ডারের সামনে এসে দেখি, রাস্তাটায় বাঘের মতো পায়চারি করছে জিলিপির গন্ধ। তাকে পাশ কাটিয়ে যাব, তার সাধ্যি কী? মুখোমুখি হতেই আমার দু'কাঁধে দুটো থাবা তুলে দিয়ে গাঁক করে উঠল, আব তেরা ক্যা হোগা রে কালিয়া! বিপদ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে নাকে রুমালচাপা দিয়ে ভাবলুম বরং পিছু ফিরে মদন সাধু লেন দিয়ে ঘুরপথে বাড়ি যাই।

তাই গেলেন?

চেষ্টার কসুর করিনি মশাই। কিন্তু বাঘবাবাজি কি ছাড়ার পাত্র? পিছু ফিরে দু'পা এগোতে না এগোতেই যেন কাছা টেনে ধরল। তার পরও লড়াই দিতে ছাড়িনি। বাঘের গলাটা সাপটে ধরে পটকে দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপ না করে আমাকেও দিল পটকে। তারপর কখনও বাঘ ওপরে আমি নীচে, কখনও আমি ওপরে বাঘ নীচে। তুমুল লড়াই। শেষে যখন হাঁপ ধরার উপক্রম হল তখন হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি আমি কালীতারা মিষ্টান্নভান্ডারের কেঠো বেঞ্চে বসে আছি, আমার হাতে তালপাতার ঠোঙা আর তাতে গরম জিলিপি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তালপাতার ঠোঙায় জিলিপিটা ভারী খোলতাই হয় বটে। তা কটা খেলেন?

প্রথমে চারটে দিয়েছিল। কিন্তু জিলিপি অতি বজ্জাত জিনিস। এক বার পেটে গেলে জাতভাইদেরও আয় আয় করে ডাকতে থাকে। তাই আরও দুটো খেতে হল।

মোট ছ'টাই তো!

বলতে গেল ছ'টাই। তবে কিনা দোকানদার বঙ্কিম ঘোষের চাপাচাপিতে আরও দুটো অনিচ্ছের সঙ্গেই খেতে হয়েছিল আর কী। তাই বলছিলুম এই সাতসকালে ওই সব প্রসঙ্গ তুলে এই প্রাতঃকালটার বারোটা বাজানো কি আপনার উচিত হচ্ছে!

আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম যে, পিঠে খেলে পেটে সয়। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি আমি যতই পিঠে খাই না কেন, আমার পেটের কোনও সমস্যা হয় না। আমাদের মফস্‌সল শহরে বাড়িবাড়ি রকমারি পিঠে হত কিনা, আর আমিও দিব্যি এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে পাটিসাপটা, ক্ষীরপুলি, রসবড়া, মালপোয়া, নলেন গুড়ের পায়েস—

রোখকে! রোখকে! আপনি কিন্তু সীমানা ডিঙিয়ে যাচ্ছেন মশাই! এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

এটা ঠিক পিঠেপায়েসের গল্প নয়।

তবে কিসের গল্প মশাই?

বলতে পারেন এটা একটা ট্রাজেডির গল্প।

খবরদার না! ট্রাজেডি আমার একদম সয় না। ও আমার দু'চোখের বিষ। আমি বিরহ, মৃত্যু,

হাহুতাশ, চোখের জল, এসব মোটেই পছন্দ করি না। আমি চাই সবাই বেশ মিলেমিশে যাক, মিলেজুলে থাক। আমার পছন্দ হল মিলমিশ। আর ওই জন্যই আমি আজ অবধি *পথের পাঁচালী* বইটা কয়েক পাতার পর আর কখনও এগোতেই পারিনি।

বলেন কী মশাই!

ওটাই আমার ট্রাজেডি কিনা। কয়েক পাতার পর যখন ইন্দির ঠাকরুন মোলো তখনই আমি হাঁটু ভেঙে কেতরে পড়ি। ঘটিঘটি চোখের জল ফেলি। অথচ ভেবে দেখতে গেলে ইন্দির ঠাকরুন আমার কে বলুন! চেনা নেই, জানা নেই, কস্মিনকালে দেখিনি, তার ওপর মহিলার যথেষ্ট বয়সও হয়েছে এবং মরবারই কথা, তবু আমার ওরকম সব হয়। আর সেখানেই তো শেষ নয়। তার পরও দুর্গা আছে, হরিহর আছে, সর্বজয়া আছে, অপর্ণা আছে। লাইন দিয়ে পরপর পটাপট মরে যাচ্ছে সব! লেখক না খুনি! অন্তত দুর্গাটাকে তো রেহাই দিতে পারতেন! ধরুন দুর্গা বেঁচেবর্তে রইল, ডাগরটি হল, তার বেশ একটা বিয়ে হল, খোকাখুকি হল, ভাল হত না তা হলে? ওই জন্যই আমি কপালকুণ্ডলা পড়তে পারি না, শেষের কবিতা শেষ করে উঠতে পারি না, দেবদাস ছুঁই না। আমাকে মাপ করবেন, ট্রাজেডি শুনিয়ে আমার দিনটা বরবাদ করে দেবেন না।

আহা, এটা ঠিক ট্রাজেডিও বলা চলে না।

বাঁচালেন। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার ঘোর পরিপন্থী আমি। একবার কী একটা দুঃখের ছবি দেখতে গিয়ে হলে এমন কান্না কেঁদেছিলুম যে, হিক্কা উঠে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। দর্শকদের আপত্তিতে শেষে আমাকে সস্ত্রীক হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। অবশ্য টিকিটের টাকাটা ফেরত দিয়েছিল। কিন্তু আমার বৌ আমাকে কি ঝাড়টাই না ঝাড়লেন। মেনিমুখো, ছিঁচকাঁদুনে, কাপুরুষ কত কী যে বললেন সব আমার মনেও নেই, তবে তার পর থেকে উনি আর আমার সঙ্গে কখনও সিনেমা দেখতে যাননি।

বিবেচনার কাজই করেছেন। তবে কিনা মাঝেসাঝে কান্নাকাটি করা নাকি হেলথের পক্ষে ভাল। শরীর থেকে বাড়তি নুন বেরিয়ে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়, অতিরিক্ত ইমোশন প্রশমিত হয়, আরও কী কী হয় যেন, মেডিকেল সায়েন্সে আছে। আমার মনে হয়, যারা কথায় কথায় কাঁদে তারা লোকও তেমন খারাপ হয় না।

খারাপ লোক নইও মশাই। ছোটখাটো দোষঘাট যে নেই তা বলছি না, তবে তেমন হেক্কোড় নই। সে যাকগে, তা কী যেন বলতে চাইছিলেন! দাদুর তামাক, বাবার চটি, পিসির ডালের বড়ি, আর—

মায়ের গোকুলপিঠে। গোকুলপিঠে শুনে আপনি আপসেট হয়ে যাওয়াতে আর এগোতে পারিনি।

আপসেট কি আর সাধে হই মশাই! গত বছর দশেক ধরে ওরা আমার গুপ্তঘাতক। আড়ে আড়ে ঘুরে নজর রাখছে, কখন মোক্ষম কোপটা বসাবে। হাই সুগার, হাই কোলেস্টেরল, হাই প্রেশার। অল্পবয়সে এক সিটিংয়ে কুড়ি পঁচিশটা গোকুলপিঠে বা গোটা দশেক পাটিসাপটা উড়িয়ে দেওয়া কোনও ব্যাপার ছিল না। ওঃ, কী সব দিন ছিল মশাই!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আই কোয়াইট সিমপ্যাথাইজ। একসময়ের বন্ধুর পরে শত্রু হয়ে দাঁড়ানোটা দুনিয়ায় আকছার ঘটছে। আচ্ছা, আপনি কখনও খ্যাৎ শব্দটা শুনেছেন?

খ্যাৎ! বাংলা শব্দ নাকি?

বাংলাই, তবে স্ল্যাং। রকের ভাষা।

না মশাই, শুনিনি।

ল্যাদ শব্দটা কি চেনা লাগছে?

ল্যাদ! শুনেছি বলেই মনে হচ্ছে যেন!

বাঃ, ওতেই হবে। খ্যাৎ আর ল্যাদ প্রায় সমার্থক। ছেলেবেলায় আমি ছিলুম ল্যাদ। অর্থাৎ যাকে হাঁ করা ছেলে বলে। ল্যাদ হল গিয়ে মাথায় কমা, চলাফেরায় মাঠো, কথাবার্তায় গোছ নেই, কথা বুঝতে সময় লাগে, যেখানে যা দেখে তাই দেখতে গিয়ে মজে যায়। ঠেলাওয়ালা গাছতলায় বসে পেতলের থালায় ছাতু মেখে খাচ্ছে তো সেখানেই মজে গেল, একটা লোক টিপকল পাম্প করছে তো তাই হাঁ করে দেখতে লাগল, পিঁপড়েরা একটা মরা আরশোলা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাই দেখতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এইরকম আর কী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ল্যাদ মানে বুঝতে পেরেছি। একটু বোকা, এই তো!

একটু নয়, বেশ বোকা।

তা না হয় তাই হল। আপনি ছিলেন ল্যাদ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ল্যাদদের ট্র্যাজেডি হল, তাদের কেউই তেমন পছন্দ করে না, শুধু তাদের মা বাদে। বিশেষ করে অল্পবয়সি মেয়েদের দু'চক্ষের বিষ হল ল্যাদ। কাজরিও তাই আমাকে একেবারেই পছন্দ করত না।

কাজরিটা কে?

উপেনবাবুর মেয়ে।

উপেনবাবুটা আবার কে মশাই?

দুনিয়ায় কি উপেনবাবুর অভাব আছে?

না, তা অবশ্য নেই।

ধরে নিন ইনি তাদেরই একজন।

বুঝেছি। তা কাজরির প্রতি কি আপনার দুর্বলতা ছিল নাকি মশাই?

তাকে দেখলেই আমার বুকে দুরদুরুনি শুরু হত, তেষ্টা পেত, কান গরম হয়ে উঠত, বীর হতে ইচ্ছে করত, ছ'ফুট লম্বা হতে ইচ্ছে করত, ফিল্মস্টার বা টেস্টক্রিকেটার হতে সাধ হত, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হত। মনে কতরকমের যে পাগলামি মাথা চাড়া দিত তার ইয়ত্তা নেই। ইচ্ছে হত, তাকে চমকে দিতে প্যারাট্রুপার হয়ে তার বাড়ির সামনে এসে নামি, অলিম্পিক থেকে পাঁচটা গোল্ড মেডেল জিতে আনি, ফাইটার জেটের পাইলট হয়ে যুদ্ধ করে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেমে পড়লে ওরকম সব হয় বটে।

যে আজ্ঞে। তবে কিনা আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে তার বয়েই গেছে। আমার ছিরিটাও তো দেখতে হবে! হাড় জিরজিরে শরীর, চক্ষু গর্তে ঢোকানো, কোটরগত চোখ, মাথায় খোঁচাখোঁচা চুল, নাক লম্বা, মাঝারি হাইট, বড়বড় দাঁত, গানের গলা নেই, ছবি আঁকার হাত নেই, ভাল ছাত্র নই, স্পোর্টসে প্রাইজ পাই না, নিজের নেগেটিভগুলো নিয়ে তখন আমার ভারী বিব্রত অবস্থা।

আহা, নেগেটিভ কার মধ্যে নেই বলুন। অনেক বড় বড় মানুষের মধ্যেও আছে। ওসব ভেবে মুহ্যমান হয়ে পড়লে কি চলে! আর আপনি দেখতে তো মোটেই খারাপ নন!

ও হচ্ছে বয়সের পলি। অনেক নেগেটিভ ওতে ঢেকে গেছে কিনা!

কিন্তু গোকুলপিঠে নিয়ে যেন কী একটা বলতে চেয়েছিলেন!

যে আজ্ঞে। গোকুলপিঠের কথাই বলছিলাম। সন্ধেবেলা মায়ের কাছটিতে বসে গরমগরম গোকুলপিঠে খেতে লেগেছি। সদ্য রস থেকে তোলা পিঠে থেকে রস গড়িয়ে এসে আমার কনুই বরাবর নেমে আসছিল। গোকুলপিঠের কিছুই তো ফ্যালনা নয়, তাই আমি কনুইটা মুখের কাছে তুলে রসটা চেটে চেটে হাতের উপর দিকে উঠছিলাম। সোয়াদে তখন আমার বাহ্যজ্ঞান নেই। ঠিক সেই সময়ে কে যেন ভারী ঘেন্নার গলায় বলে উঠল, ইস! কেমন চাটছে দ্যাখ! মা গো! আমি তাকিয়ে সেই যে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলাম, সেই হাঁ আর বন্ধ হল না। সামনে আমার ছোট বোন পুতুলের সঙ্গে উপেনবাবুর মেয়ে দাঁড়ানো, আর আমার দিকেই চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে।

ইস, এ যে রসভঙ্গ হয়ে গেল!

রসভঙ্গ বলে রসভঙ্গ! তার পর কত রস যে আমার কনুই বেয়ে পেন্টুলের ওপর পড়ল তার খেয়ালও আমার ছিল না। অবশ্য ততক্ষণে ওরা পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করতে লেগেছে, আর আমি এ ঘরে গোকুলপিঠে চিবিয়ে ঘাস খাওয়ার স্বাদ পাচ্ছি। চোখে জল আসছিল, আত্মধিক্কারে বুকে হাহাকার।

সত্যিই ট্র্যাজিক মশাই। কিন্তু ওই অসময়ে মেয়েটার এসে হঠাৎ হাজির হওয়াটাও উচিত হয়নি।

আমাদের ছোট্ট মফস্‌সল শহরে সবাই সবাকার চেনাজানা কিনা। এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত জলভাতের মতো।

বুঝেছি। মোদ্দা কথাটা হল, মেয়েটা আপনাকে অপছন্দ করত, এই তো!

সে তো বটেই। তবে সঙ্গত কারণেই কাজরি আমাকে পছন্দ করত না। ধরুন, কেউ কোথাও

নেই, আর আমি নিশ্চিন্তে ভবেশ ঘোষের কারখানার পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে পাঁচিলের গায়ে ওই পেচ্ছাপ দিয়েই ছবি আঁকার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে গার্লস স্কুলের ছুটি হওয়ায় কাজরি তার বন্ধুদের সঙ্গে ওই রাস্তা দিয়েই বাড়ি ফিরছে। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে তাদের সে কি হি হি করে হাসি! আমার পেচ্ছাপ সেই যে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল, পরের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে আর মুখ দেখানোর সাহস পায়নি।

এঃ হেঃ, এ যে সানকিতে বজ্রাঘাত!

যা বলেছেন!

হুঁ। কথাতেও আছে, যেখানে ভূতের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়।

সেখানেই শেষ হলে কথা ছিল না। হয়েছিল কী, কদমতলার বিশে আমার বোন পুতুলকে প্রেমপত্র দিয়েছিল। সেটা বাড়িতে জানাজানি হয়ে যায়। একে তো প্রেমপত্র দেওয়াটা তখন অপরাধ বলে বিবেচিত হত, তার উপর অজস্র বানান ভুল। প্রিয়তমাতে দীর্ঘ ই-কার। লেখাপড়ায় লবডঙ্কা হলেও বিশে ভাল ফুটবল খেলত, স্পোর্টসে কাঁড়িকাঁড়ি কাপ মেডেল পেত, চেহারাটাও খারাপ ছিল না। কিন্তু পুতুলকে প্রেমপত্র দেওয়াতে তার বাবার কাছে নালিশ হয় এবং তার কালোয়ার বাবা তাকে বেধড়ক পেটায়। ঘটনাটা সেখানেই শেষ হল না। বদলা নিতে বিশে তক্কেতক্কে ছিল। সেবার বাবুপাড়ার মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে জলসা হচ্ছিল। আমিও দেখতে গেছি। প্যান্ডেলে যাওয়ার রাস্তায় হঠাৎ কোথা থেকে বিশে এসে আমাকে পাকড়াও করল। তারপর কী মার মশাই! ঘুষি, কিল, থাপ্পড়, লাথি, কিছুই বাকি ছিল না। সেই সঙ্গে গালাগাল। আমি মার খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছিলুম। আর সেই অন্ধকারেই আবছা দেখতে পেলাম, উপেনবাবুর মেয়েও তার বান্ধবীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার পেটাই দেখছে। তখন আমার মাথার চুল ছেঁড়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, কপালে আলু, চোখের কোলে কালশিটে, ঠোঁট ফাটা, জামা ছেঁড়া। কী অপরূপই না দেখাচ্ছিল আমাকে!

ইস, আপনার কপালটাই দেখছি খারাপ! অবশ্য মারপিট দেখতে আমারও মন্দ লাগে না। টিভিতে হিন্দি সিনেমা হলেই আমি মারপিট দেখতে বসে যাই। আসলে আমাদের সকলের মধ্যেই একটা করে ব্যর্থ বীর ঘুমিয়ে থাকে কিনা।

যথার্থই বলেছেন। বীর হারামজাদা কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোয়।

বীরের সর্বদা জেগে থাকা কি ভাল? তাতে বিপদআপদ হতে কতক্ষণ? মনে রাখবেন এটা বীরদের যুগ নয়, গুন্ডা আর সন্ত্রাসবাদীদের যুগ।

তা অবশ্য ঠিক। দুঃখের কথা কী জানেন! বেশ কয়েক বছর পর ওই বিশের সঙ্গেই সম্বন্ধ করে পুতুলের বিয়ে হয়। তখন অবশ্য বিশে তাদের পারিবারিক ব্যবসার মালিক, কোটি কোটি টাকা। এখন বিশের সঙ্গে আমার ভারী ভাব। এই তো সেদিন আমাকে একটা দামি মোবাইল ফোন গিফ্ট করল।

দেখুন তো কাণ্ড! আপনি শুধু শুধু মারটা খেলেন!

যে আজ্ঞে।

তার পর কী হল মশাই?

আরও অনেক কিছু হয়েছিল। মনমোহনবাবুর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখি, বেশ জুতমতো ঠিক আমার উল্টোদিকের রো-তেই কাজরি বসেছে। প্রায় মুখোমুখি। কী দিয়ে তাকে ইম্প্রেস করি তা মাথায় আসছিল না, তাই শেষ পাতে কুড়িটা রসগোল্লা খেয়ে ফেললাম।

কুড়িটা! এঃ হেঃ এই তো ভুল করেন! তা ইমপ্রেসড হল?

ধুস! শুনলাম পাশে বসা গোলোকবাবুর মেয়ে কুসুমকে চাপা গলায় বলছে, কী রাক্ষসের মতো খাচ্ছে দেখ! অমন খাওয়া দেখলে বমি পায়। তারপর—

এর পরেও আছে?

আছে মশাই, আছে। শনিবার হাফ ছুটির দিন আমি তাকে চমকে দেওয়ার জন্য রাস্তার পাশে আমগাছের উপর উঠে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। সে এবং তার বন্ধুরা দৃশ্যমান হতেই, আমি 'হেঁইও' বলে চেঁচিয়ে মারলাম লাফ।

তাতে কাজ হল?

হল। সে আর তার বন্ধুরা "ও মা গো" বলে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

আর কিছু হল না?

হল। আমার ডানহাতের কব্জিটা ভাঙল।

ভাবছি, এত সব করার কী দরকার ছিল আপনার!

আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা একটা গল্প আছে "আওয়ার লেডি'জ় জাগলার"। পড়েছেন? এক রাস্তার সামান্য জাদুকর এক গির্জায় ঢুকে পড়েছিল। মাতা মেরির মূর্তি দেখে সে মুগ্ধ। কিন্তু পূজার্চনা জানা নেই বলে সে মাতা মেরির সামনে নিজের সামান্য জাদুগুলোই দেখিয়েছিল। আমিও আমার সামান্য প্রেম ও ভাবেই নিবেদন করতে চেয়েছিলাম। আমার আর সম্বল কী ছিল বলুন! আমাদের তো পেখম নেই!

তাই তো! এ দিকটা তো ভেবে দেখিনি! এখন মনে হচ্ছে, যা করেছেন বেশ করেছেন। তারপর কী হল?

সেও দুঃখের কাহিনি। পাশটাশ করার পর আমাকে কলকাতায় আরও পড়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এঃ এ যে, ছানা কেটে গেল মশাই, ঘুড়ি একেবারে ভোকাট্টা!

এক রকম তাই।

কিন্তু এ তো ট্রাজেডি মশাই! আর ট্রাজেডি আমার ঘোর অপছন্দ। আমি সবসময়ে ঝিলমিল চাই, ঝিকিমিকি চাই। বিচ্ছিরি আমার মোটেই সহ্য হয় না। দিলেন তো মুডটা চটকে।

সরি। তবে ছানা কাটলেও, ছুটিছাটায় আমি যখন বাড়ি যেতাম তখনও মাঝেমাঝে দেখা হয়েছে। এক গ্রীষ্মের সকালে যখন আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে খ্যাঁসখ্যাঁস করে দাঁত ব্রাশ করছি, মুখ এবং ঠোঁট ভর্তি ফ্যানা, সেই সময়ে সে সুমুখ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

এঃ হেঃ, দাঁত ব্রাশ করার সময়! সে তো বিচ্ছিরি ব্যাপার। তাকিয়েছিল নাকি মশাই?

যে আজ্ঞে। তাকিয়েছিল এবং বিস্ময়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল। তবে দেখলাম, সে দীঘল হয়েছে, শাড়ি পরে, এবং আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। যেন মেঘ, রামধনু, কুয়াশা আর স্বপ্ন দিয়ে তৈরি।

যাই বলুন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করাটা আপনার মোটেই উচিত হয়নি। তারপর কী হল বলুন।

সে বড় হতে লাগল, আমিও বড় হতে লাগলাম, মাঝখানে অথৈ বিরহ। তার পর শুনতে লাগলাম কাজরির বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। উপেনবাবু পয়সাওলা লোক, মেয়েও সুন্দরী, ভালভাল পাত্রেরই সন্ধান আসছিল।

ইস, কী ট্র্যাজিক! তার পর কী হল বলুন।

তার পর এক দিন যথারীতি কাজরির বিয়ে হয়ে গেল।

হয়ে গেল? না মশাই না, এটা একেবারেই ঠিক হল না।

পৃথিবীর ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করার আমরা কে বলুন! ওরে ভীরু, তোর উপরে নেই ভুবনের ভার।

তো তার বিয়ের পর আপনার কী অবস্থা হল মশাই!

বুঝতেই পারছেন। তবে ওই একই দিনে আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কিনা, মা বাবার পছন্দ করা পাত্রীর সঙ্গে।

এখনও কি কাজরির কথা আপনার মনে পড়ে?

খুব। কোথায় হারিয়ে গেল বলুন তো কাজরি! তার জন্য এখন তো আমার আর ছ'ফুট লম্বা হতে ইচ্ছে যায় না, ফাইটার পাইলট হওয়ার সাধ হয় না, অলিম্পিক থেকে গোল্ড মেডেল আনবার জন্য হন্যে হই না! ইচ্ছেগুলোই বা কোথায় পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে গেল কে জানে!

সবই বুঝলুম। কিন্তু বাতাস শুঁকে আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে। আপনার বউয়ের নাম কী বলুন তো!

কাজরি। উপেনবাবুর মেয়ে।

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ্র

ছোটগল্প ২

ফুলের তোড়া

তিলোত্তমা মজুমদার

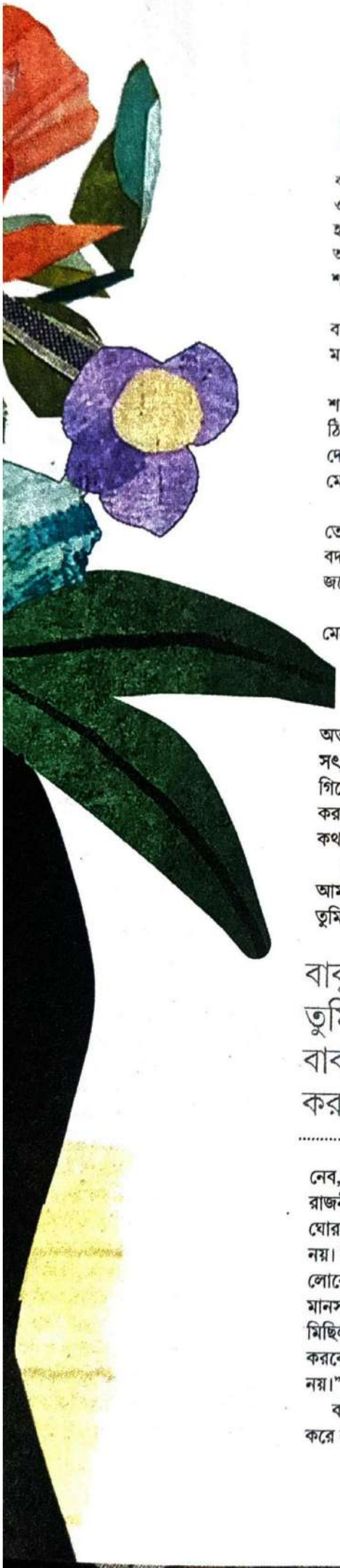

ছেলে যখন জেদ ধরে বসল, কলেজের বান্ধবীকেই বিয়ে করবে, সুমিতার ভাল লাগেনি। কেন রে বাবা, দুনিয়ায় কি মেয়ের অভাব পড়েছে যে, ওইরকম কুঁদুলে, উড়নচণ্ডীকে বৌ করে আনতে হবে? চম্পাগ্রাম ছোট জায়গা। একখানা কলেজ আর তিনটে হাই স্কুল আছে বলেই তো আর শহর হয়ে যায়নি। সবাই সবার খবর রাখে।

মায়ের গোমড়া মুখের অভিযোগ শুনে বাবুই বলল, "রিখিকে তোমার কুঁদুলে বলে মনে হয়? কতটুকু দেখেছ তুমি ওকে?"

টিভি চালিয়ে সংবাদ শুনছিলেন দুলুবাবু। শব্দমাত্রা কমিয়ে বললেন, "তোমার মা তো ঠিক কথাই বলেছে, কলেজ কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেয়, মিছিল করে, অত্যন্ত বেপরোয়া, সেই মেয়ে কুঁদুলে হবে না তো কী!"

বাবুই বলল, "কলেজে, ভার্সিটিতে পলিটিক্স তো আমিও করেছি, তাতে কি আমি গুন্ডা বদমাশ হয়ে গিয়েছি? কলেজে লেকচারশিপ জয়েন করার পরও ইউনিয়ন করছি।"

সুমিতা বলেন, "একটা ছেলের যা সাজে, মেয়ের তা সাজে না।"

"তাই নাকি?" বাবুই রাগত স্বরে বলে, "রিখি যদি তোমার মেয়ে হত, বলতে এ কথা? কোন যুগে পড়ে আছ মা? রিখি অত্যন্ত ভাল মেয়ে। উপকারী মনোভাব আছে, সৎ দলের প্রতি একনিষ্ঠ, রাজনীতি করতে গিয়ে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দেয়নি। এম ফিল করছে। ওর স্বভাব, আচার-ব্যবহার খারাপ, এ কথা ওর বিরোধীরাও বলবে না।"

দুলুবাবু বলেন, "দ্যাখো বাবা, তোমাকে আমরা খুব খোলামেলা ভাবেই বড় করেছি। তুমি নিজের ইচ্ছেয় যাকে ঘরে আনবে, মেনে নেব, কিন্তু বিয়ের পরেও যদি সেই মেয়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠেন, তা হলে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। চম্পাগ্রাম হেটো গাঁ নয়। কিন্তু শহরও নয়, তুমি জানো। এখানে লোকে আমাকে মান্য করে। আমাদের একটা মানসম্মান আছে। ঘরের বৌ ধেই ধেই করে মিছিল করে বেড়াবেন, আর লোকে ছি ছি করবে, এ আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।"

বাবুই কিছুক্ষণ দু'হাতে মাথা রেখে চুপ করে রইল। দুলুবাবু আবার টিভির শব্দ বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর অত কড়া কথায় সুমিতার ছেলের জন্য কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু স্বামীর কথার ওপর কথা বলার সাহস তাঁর নেই। ছেলের পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, "আর একটু ভেবে দেখিস বাবুই। তুই যেবারে পাশ করে বেরোলি, তার আগের বছরে সে কলেজে ঢুকেছিল। এর পর বর্ধমানেই তুই থেকেছিস বেশি। চম্পাগ্রামে সে কী করেছে না করেছে, সব তোর জানা না-ও থাকতে পারে। সেই সেবারে ডোমপাড়ার একটা ছেলে ফার্স্ট না সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত, খুন হয়ে গেল। তার মরদেহ নিয়ে সারা চম্পাগ্রাম মিছিল করেছিল রিখি। একেবারে ভয়ডর নেই। কী স্লোগান, কী চিৎকার! তখন সবাই বলাবলি করেছে, বাপরে, মেয়ে তো নয়, ডাকাত! বাপ নেই। একা মা মেয়েটাকে মানুষ করতে পারছে না। এই মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ঘর জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।"

বাবুই মায়ের দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, "মা, তুমি তো রোজ দুটো খবরের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়ো। বাবা সারা বিশ্বের খবর রাখে। একটি মেয়ে রাজনীতি করছে, এ কি খুবই বিস্ময়কর? সারা রাজ্যে, দেশে, কত জন মহিলা মন্ত্রী আছেন, সেই তালিকা তোমাদের আলাদা করে বলার কিছু নেই। রাজনীতি করা অন্যায় নয়। এবং মা, তোমাদের জানিয়ে রাখি, রিখি সমাজসেবা আর রাজনীতি নিয়েই থাকবে ঠিক করেছে। বিয়ের পরেও তার কিছু নড়চড় হবে না। তবে এটাও ঠিক, যত দিন তোমরা বিয়েতে মত না-দিচ্ছ, আমরা অপেক্ষা করব। কিন্তু অন্য কাউকে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না।"

বাবুই তার নিজের ঘরে চলে গেল। দুলুবাবু কঠিন দৃষ্টিপাতে সুমিতাকে বিদ্ধ করে বললেন, "তুমিই ওর মাথাটি খেয়েছ। ছেলে ছেলে করে পাগল, এখন বোঝো ঠেলা। এখনও বিয়েই হয়নি, হবু বৌয়ের হয়ে ওকালতি করে গেল। বিয়ে হয়ে গেলে বৌয়ের পকেটে ঢুকে বসে থাকবে।"

বাবুই মায়ের দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, "মা, তুমি তো রোজ দুটো খবরের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়ো। বাবা সারা বিশ্বের খবর রাখে। একটি মেয়ে রাজনীতি করছে, এ কি খুবই বিস্ময়কর?"

সুমিতা সবিস্ময়ে বললেন, "বৌয়ের পকেটে মানে?"

"মানে বোঝো না? ন্যাকা? সে তো শার্ট-প্যান্ট পরে। দেখোনি নাকি?"

"বিয়ের পরেও পরবে নাকি? কী যে

বলো!"

"যাও, ছেলেকে জিজ্ঞেস করে এসো, প্যান্ট-শার্ট পরা নববধূকে তো তুমিই বরণ করবে। আমার আর কী, হরিনাম করতে করতে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।"

সুমিতা উঠে পড়লেন। স্বামীর মুখের সামনে আর থাকতে ইচ্ছে করল না। মানুষটা চিরকাল কর্কশ। দাম্পত্যের আরম্ভেই সুমিতা স্বামীকে ভয় পেতে শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম দুর্বিষহ মনে হত সব কিছু। ঘুরতে-বেড়াতে গেছেন, সিনেমা দেখেছেন কত, খাওয়া-পরার অভাব নেই, তবু মনে হয়েছে, তিনি সুখী হতে পারছেন না। দুলুবাবুর জীবনে তিনি একজন গৃহিণী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না কখনও। ছেলে হওয়ার পর বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপলব্ধি করেছেন সুমিতা। কিন্তু ছেলের প্রতি মনপ্রাণ খুলে স্নেহ প্রকাশ করতেও ভয় পেয়েছেন। দুলুবাবুর কঠিন কথার ভয়, অভিযুক্ত হওয়ার ভয়। বাবুই কিছুমাত্র অন্যায় করলেই আজও শুনতে হয়, "ছেলে মানুষ করতে পারনি। একটা বাঁদরিও তোমার চেয়ে ভাল মায়ের ভূমিকা পালন করে।" অথচ, ছেলের প্রতি সাফল্যে গর্বিত পিতৃত্বসুখ উপভোগ করেছেন। সুমিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে প্রবেশ করেন। এই ঘর আর ঠাকুরঘরেই তিনি শান্তি পান। কিন্তু আজ তাঁর মন বড়ই অস্থির। এক দুর্বার ঝড়ের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে উঠেছে অন্তর। সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা, রিখি যদি এ সংসারে মানিয়ে নিতে না পারে, ছেলে পৃথক হয়ে যাবে না তো?

মাস দুয়েক পার হল। এর মধ্যে ছেলে আর বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেনি। দুলুবাবু ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁদের আপত্তি ছেলের মত পরিবর্তন করে দিয়েছে। এক রাতে খেতে বসে বললেন, "সমাজবন্ধু পাড়ায় যে থাকে, প্রবীর বোস, ওর ছেলে তোর সঙ্গে পড়ত নাকি বাবুই?"

ছেলে বলল, "না। আমার চেয়ে বড়।"

"খুব ভাল দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। এই তো সে দিন বিয়ে হল। বৌ একেবারে রূপে-গুণে লক্ষ্মী। কাগজে নাকি পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।"

ছেলে মুখের গ্রাস ধীরে ধীরে চিবিয়ে, গিলে বলল, "ও হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল। রিখির মা আর মামা এ সপ্তাহে এক দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। জানিয়ো তোমরা, কবে আসতে বলব।"

দুলুবাবু বললেন, "আগমনের হেতু?"

"আমাকে খুলে বলতে হবে? ঠিক আছে। আমাদের পার্টি এবারের ভোটে তরুণ প্রতিনিধি দিতে চাইছে। শুনছি, আমাদের এলাকায় রিখির কথা ভাবা হচ্ছে। আমরা তাই তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে নিতে চাইছি। কারণ, রিখি এখানে দাঁড়ালে হারের সম্ভাবনা খুবই কম। এর পর ব্যস্ত হয়ে যাবে। এই সব আর কী। আর কিছু জানতে চাও?"

দুলুবাবু কথা হারিয়ে ফেললেন। ছেলে তার মায়ের সঙ্গে বরাবর খোলামেলা কথা বলে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে খানিক দূরত্ব ছিল। তিনি সেই সমীহ ও ভয় মেশানো দূরত্ব উপভোগ করে এসেছেন এতকাল। এখন তাঁর মনে হতে লাগল, চাকরি পেয়ে ছেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। রাত্রে শয়নকালে স্ত্রীর কাছে তিনি পুত্রনিন্দা করতে লাগলেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে অতি নির্লজ্জ, নিজের মুখে নিজের বিবাহের কথা বলতে বাধে না এমনই অসভ্য এবং তার জন্য যে অবিমৃশ্যকারী, মূর্খ মায়েরাই দায়ী, সে বিষয়ে তাঁর তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না। সুমিতা একবার ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "সময় পাল্টে গিয়েছে। ওরা সুখী হলেই আমরা সুখী। ভগবান ওদের সুখে রাখুন।"

তেলেবেগুনে জ্বলে দুলুবাবু বললেন, "ওই সাত ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে এসে যখন দাসীর মতো খাটাবে, তখন যেন আমার কাছে কাঁদতে বোসো না। যেমন পার্টিবাজ গতরঢলানি মা, তেমনই মেয়ে। না হলে ভোটে টিকিট পায়? কত উদো-বুধো পোড় খাওয়া লোকে টিকিট পাওয়ার জন্য হেদিয়ে মরছে, আর পার্টি নাকি সেধে সেধে বিধানসভার ভোটে ওই চেংটি বিধবার পুরুষ-ধরা মেয়েকেই নমিনেশন দিচ্ছে! যেমন তুমি ভোঁদা, তেমনই তোমার ছেলে। ওকে বোকা পেয়েছে বলেই এরকম মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে।"

সুমিতা চুপ করে রইলেন। রেগে উঠলে দুলুবাবুর মুখে আগল থাকে না, তিনি জানেন, তবু এই কথাগুলো শুনতে তাঁর কান জ্বলে যাচ্ছিল। রিখিকে তিনিও মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু তার মায়ের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলা অন্যায়। চম্পাগ্রামের পরের স্টেশন আংরালে রিখির বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। রিখির মা স্বামীর আদর্শেই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর তিনি স্বামীর স্কুলেই প্যারাটিচার পদে যোগ দিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন। তাঁর বিষয়ে কোনও দুর্নাম সুমিতার কাছে পৌঁছোয়নি। যদি থাকত কিছু, মেয়ে-বৌরা বাড়ি বয়ে এসে বলে যেত। সুমিতা এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলেন। শুধুমাত্র সংসারে অশান্তির ভয়ে এতকাল স্বামীর ছায়া হয়ে থেকেছেন। আতঙ্কে, ত্রাসে দিনের পর দিন গিয়েছে। কত আপত্তির কথা প্রকাশ করতে পারেননি। কত অপমান নত মুখে সহ্য করে চলেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন দুঃখ বেদনার জায়গা থাকে, যা কাউকে বলা যায় না, ছেলেকে তো নয়-ই। কিন্তু এত কিছু সয়ে কী লাভ হল? স্বামীকে যেমন দেখছেন, ছেলের বিয়ের পর আগুন লাগবেই। তিনি যা সহ্য করেছেন, রিখি তা করবে কেন?

সুমিতার ভয়, আশঙ্কা, দুলুবাবুর উগ্র আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বাবুইয়ের সঙ্গে রিখির বিয়ে হল একেবারে অনাড়ম্বরে। দুই বাড়ির আত্মীয়-পরিজন, কয়েকজন বন্ধুর সাক্ষ্যে কাগজে সই করে বিয়ে করল তারা। প্রীতিভোজ আয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু সানাই বাজেনি, আলোর রোশনাই ফোটেনি, ফুলের সাজে সাজেনি মণ্ডপ। তবে রিখির মা ও মামারা তাকে সোনার অলঙ্কারে ভরিয়ে দিয়েছেন। রিখির মাথায় মুকুট নেই, সে ঘোমটা দেয়নি, মুখে চন্দনের সাজ পরেনি, তবু, উজ্জ্বল গোলাপি বেনারসি শাড়ির প্রভায়, রিখিকে খুব সুন্দর লাগছে বলে মনে হল সুমিতার। এমনকি, সে যে শার্ট-প্যান্ট পরে বিবাহসভায় হাজির হয়নি, তার জন্য মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলেন তিনি। সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি হতে অনেকগুলি বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল বিয়েবাড়ির সামনের রাস্তায়। খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা রিখি ও বাবুইকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। সুমিতা একেবারে কোণের দিকে সেঁধিয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন, দুলুবাবু কীরকম হেসে হেসে, হাতজোড় করে প্রত্যেককে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর সঙ্গে রিখির মা ও আরও কয়েক জন। উপস্থিত অভ্যাগতরা নেতানেত্রীদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি করছেন।

এমন সব নামীদামি অতিথি আসবেন, জানতেন সুমিতা। কিন্তু জানা আর সামনে থেকে দেখা যে কত আলাদা, তিনি উপলব্ধি করছেন। অজানা আতঙ্কে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন। চেয়ারে বসে রইলেন বিমূঢ় হয়ে। এমনই আত্মগত যে, তাঁর কাঁধে স্পর্শমাত্র চমকে তাকালেন তিনি। রিখি এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, "এ কী মা? আপনার শরীর ঠিক আছে? একা বসে আছেন কেন?"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন দুঃখ বেদনার জায়গা থাকে, যা কাউকে বলা যায় না, ছেলেকে তো নয়-ই। স্বামীকে যেমন দেখছেন, ছেলের বিয়ের পর আগুন লাগবেই। তিনি যা সহ্য করেছেন, রিখি তা করবে কেন?

সুমিতা, নববধূর মুখে এমন সটান মা ডাক শুনে সলজ্জ হেসে বললেন, "আমি ঠিকই আছি। ওখানে কত বড় বড় মানুষ। তাই এখানে এসে বসেছি।"

"বড় বড় মানুষ তো কী হয়েছে? চলুন। আসুন আমার সঙ্গে।"

"না না। কখন কী ভুল করে বসি। খুব মেলামেশার অভ্যাস তো নেই। ঘরে থাকা মানুষ আমি।"

"অত ভাবনার কী আছে মা? ওখানে সবাই আছেন, শুধু আমার শাশুড়ি অনুপস্থিত, কেন এমন হবে? তাঁরা তো আপনারই অতিথি মা। আসুন।"

সুমিতা জড়ানো পায়ে পুত্রবধূর সঙ্গে চলেছেন। একটি বড় গোল টেবিল ঘিরে বসেছেন রাজনীতিবিদরা। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ প্লেটে কিছু নিয়ে খাচ্ছেন। হাসি, কথা, হাঁকডাকে সরগরম হয়ে উঠেছে আসর। হঠাৎ উঠল শোরগোল। ওই এসে গেছে। আরে, কতক্ষণ ধরে বসে আছি। পাত্রীকে উপহার দিতে পারছি না।

কয়েক জন পারিষদ নিয়ে উপস্থিত হলেন মন্ত্রী প্রলয় ঘোষ। বর্ষীয়ান মানুষটিকে প্রণাম করল রিখি ও বাবুই। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "এ বার তা হলে উপহার দিই?'

"হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এর জন্যই তো বসে আছি আপনার অপেক্ষায়," হই হই করে উঠলেন রাজনীতিকরা। প্রলয় ঘোষ বললেন, "রিখির নিজের এলাকা থেকে রিখি আসন্ন নির্বাচনে দলের প্রতিনিধিত্ব করছে। দলের পক্ষ থেকে বাবুই ও রিখিকে বিয়েতে এই উপহার দেওয়া হল।"

প্রচুর হাততালি ও হই হই খানিক প্রশমিত হলে রিখি ও বাবুই যখন আর-একবার প্রলয় ঘোষকে প্রণাম করে উঠেছে, তিনি বললেন, "জয়ী হও মা," তার পর এক পারিষদকে লক্ষ করে বললেন, "ওটা কোথায়?"

রিখি দেখছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শাশুড়ি। এতক্ষণে সে সকলের সঙ্গে সুমিতার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল। সে আশা করছিল, বাবুই নিজেই মায়ের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু বাবুইয়ের এদিকে মনোযোগ নেই। রিখি সুমিতার হাত ধরে বলল, "সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি সুমিতা সান্যাল। বাবুইয়ের মা, আমার শাশুড়ি-মা।"

নমস্কার প্রতি-নমস্কার হচ্ছে, একজন প্রলয় ঘোষের হাতে দিল বিশাল একটি ফুলের তোড়া। নানা রঙের চেনা-অচেনা ফুলের সম্ভার। তিনি সহাস্যে সেই তোড়া বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও।"

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সুমিতা। এমন উজ্জ্বল ভিড়ের মধ্যে মনে মনে সন্ত্রস্ত তিনি যন্ত্রের মতো হাতে নিলেন সেই অপার্থিব পুষ্পের স্তবক। প্রলয় ঘোষ ও অন্য সকলেই বিব্রত বোধ করছেন। তৎক্ষণাৎ বজ্রনির্ঘোষে ফেটে পড়লেন দুলুবাবু, "আরে আরে, তুমি কি গাধা না কি! রাখো ওটা, রেখে দাও। গাঁইয়া কোথাকার। উনি তোমার জন্য এনেছেন ওটা?"

সুমিতা ত্রস্ত হয়ে বললেন, "না না। এ মা। এ আমি কী করলাম! ছি ছি!" যেন ফুলের তোড়া নয়, সাপ নিয়েছেন হাতে, এমন আতঙ্কে তাড়াতাড়ি রেখে দিলেন টেবিলে। তাঁর চোখে জল এসেছে। সে-ও ভারী লজ্জার। তিনি কি খুকি, যে বকুনি শুনে কাঁদবেন?

একটু একটু করে সরে যাচ্ছেন সুমিতা। সকলে, যেন কিছুই ঘটেনি, এমন মুখে কথালাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বাবুই, মন্ত্রীবরের অভ্যর্থনা সম্পন্ন করছে। দুলুবাবুও রয়েছেন ছেলের সঙ্গে সঙ্গে। হাতে হাত ঘষছেন। স্বপ্নেও ভাবেননি, ছেলের বিয়েতে নেতামন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। গর্বে তাঁর চোখে জোনাকি ফুটছে।

রিখি আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল শাশুড়িকে। সুমিতা বললেন, "আর কেন? কী কাণ্ড করলাম! ছি ছি! উনি যে পরে আমার মাথা কাটবেন।"

"আপনার মাথা আর কেউ কাটবেন না মা। পরিস্থিতি বদলায়। শান্ত হোন। চুপটি করে বসুন এখানে।"

বাবুইয়ের কাছে গিয়ে সে বলল, "তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে ওখানে মায়ের পাশে বসাও তো।"

বাবুই ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"যা বলছি করো, প্লিজ়। প্রলয় ঘোষ স্যারের সঙ্গে তুমি তো আছই।"

কথা না-বাড়িয়ে বাবাকে ডেকে মায়ের পাশে বসিয়ে দিল বাবুই। রিখি, তার ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে উঁচু গলায় বলল, "সবাই শুনুন, আমার কিছু কথা আছে।"

লোকজন কৌতূহলী। রিখির মা এসে অদূরে দাঁড়িয়েছেন। রিখি বলছে, "অনেক দিক থেকে দেখলে, আজ আমার জীবনের একটি অনন্য দিন। আজ আমি রাজনীতির বৃহত্তর জগতে যাওয়ার অধিকার পেলাম। আজ আমার ঘরবদল হল। রাজনীতির ভাষায় ঘরবদল খুব সম্মানজনক ধরা হয় না। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে একটি মেয়ের ঘরবদল তার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই জানেন, আমার বাবা স্বর্গগত। আজ আমার নতুন পরিবারে আমি পেয়েছি আমার পিতৃস্থানীয় শ্বশুরমশাইকে। পেয়েছি আমার আরও এক মাকে, তিনি আমার শাশুড়ি। আমার রাজনৈতিক জীবনের পথে তিনিই আমার আশ্রয়। আমার মা আমায় ভাত বেড়ে দেন, আমি পেট ভরে খেয়ে কলেজে, ভার্সিটিতে, মাঠে-ময়দানে কাজ করে বেড়াই। কাল থেকে, আমি জানি, আমার নতুন মায়ের হাতের ভাত খেয়ে আমি আগের মতোই নিশ্চিন্তে কাজে যাব। আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর বাবুই আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। আমি শাশুড়ি-মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার জীবনযাত্রা ঠিক গতানুগতিক হবে না, আপনি জানেন। আমাকে নিয়ে অসুবিধে হবে না তো? তিনি বলেন, তোমার মায়ের কি তোমাকে নিয়ে অসুবিধে হয়? আমি বলি, কখনও না। তিনি বলেন, আমাকে যদি নিজের মায়ের মতো মনে করতে পারো, আমার সঙ্গে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। মেনে যখন নিয়েছি, আমার কাছে তুমি আর বাবুই আলাদা নও।"

অনেকেই করতালি দিল। কেউ বলে উঠল, "বিয়ের কনে ভাষণ দিচ্ছে, কী দিনকাল!"

রিখি হেসে উঠল। খানিক দম নিয়ে বলল, "সে দিন শ্বশুরমশাই আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। তাতে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। মেয়েরা রাজনীতি করছে, অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। তার ওপর ছেলের বৌ ধুলো-মাটি-কাদা মেখে রাতদিন দল করে বেড়াবে, এ কি সহজে মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু কর্তব্য তো করতেই হবে। আমাকে দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি সাধ্যমতো তা পালন করতে পারি, এই আশীর্বাদ আমি শাশুড়ি-মা ও শ্বশুরমশাইয়ের কাছে চাইব। আমি নিশ্চিত জানি, জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে আমার দুই মা আমার সহায় হবেন।"

মন্ত্রী প্রলয় ঘোষের আশীর্বাদী ফুলের সেই তোড়া, যা সুমিতা বিহ্বলতায় ভুলবশত হাতে নিয়েছিলেন, সেটি শাশুড়ির পায়ের কাছে নামিয়ে দু'জনের পদধূলি নিল রিখি। তার পর এগিয়ে গেল তার মায়ের দিকে।

প্রলয় ঘোষ জোর চাপড় মারলেন বাবুইয়ের পিঠে। বললেন, "কী বুঝলে? বাবুই পাখি? মেয়েটা বহু দূর যাবে। ওর পাশে থেকো।"

"আশীর্বাদ করুন, সেই সাহস ও শক্তির অভাব যেন না হয়।"

হেসে বাবুইয়ের পিঠে আর-একটি চাপড় মারলেন মন্ত্রী। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে দুলুবাবু সুমিতার দিকে ঝুঁকে বললেন, "আমার ছেলেকে কত স্নেহ করেন উনি, দেখলে? তবে মেয়েটা খুব টেটিয়া। তুমি আবার বোকার মতো ওর কথা সত্যি ভেবে বোসো না।"

"কোন কথা?" জিজ্ঞেস করেন সুমিতা। মৃদুস্বরে।

"ওই যে সব বলল। সত্যি সত্যি তোমাকে ওর প্রচারে নিয়ে যাবে নাকি? হ্যাহ্। যত রঙ্গ।"

সুমিতা হাসলেন। নিজেকে উজাড় করা হাসি। এই প্রথম স্ত্রীকে দুর্বোধ্য লাগল দুলুবাবুর। ওই উচ্চকিত হাসির জন্য ধমকাতে গিয়েও গিলে ফেললেন ইচ্ছেটা। এই প্রথম।

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র

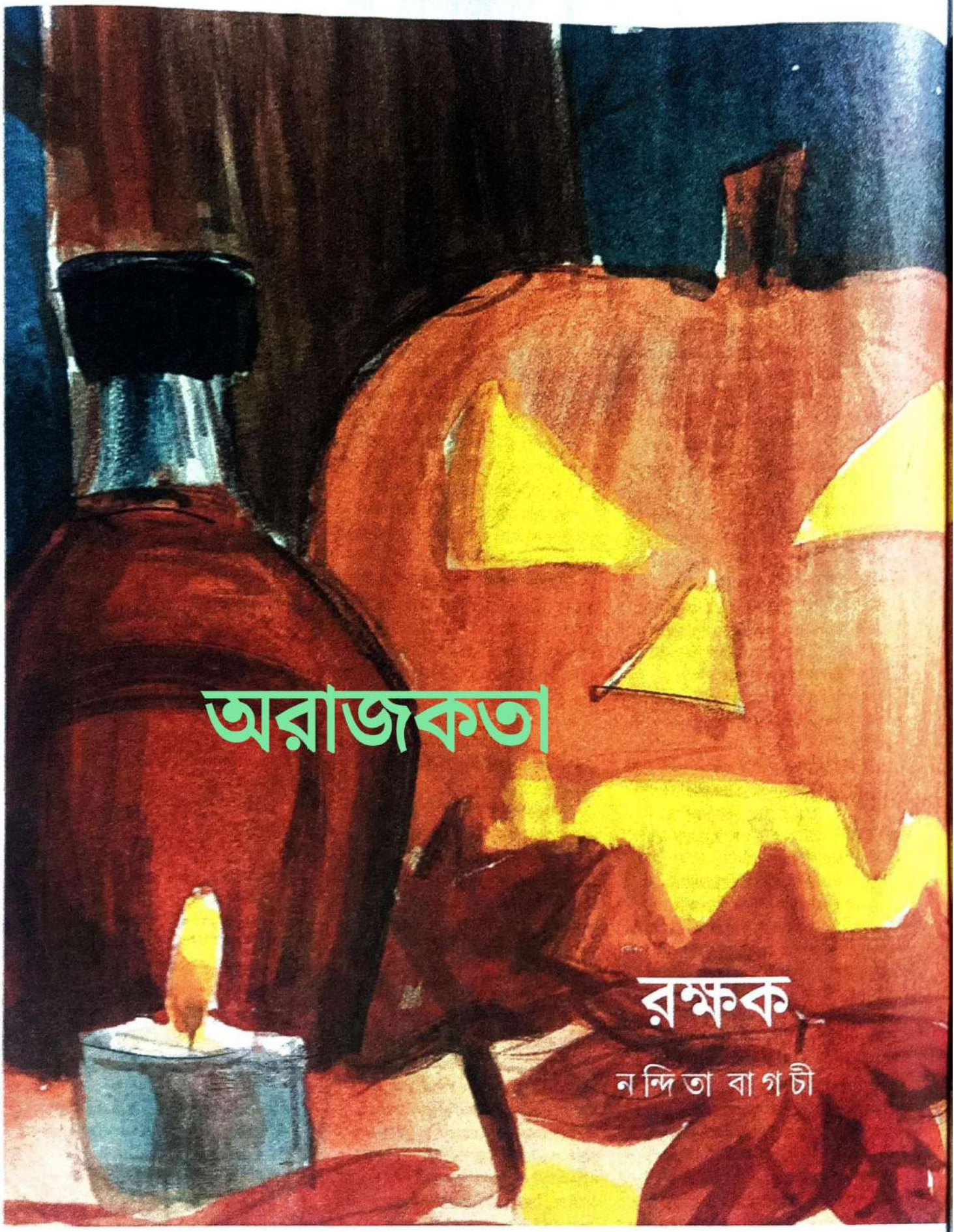

অরাজকতা

রক্ষক

নন্দিতা বাগচী

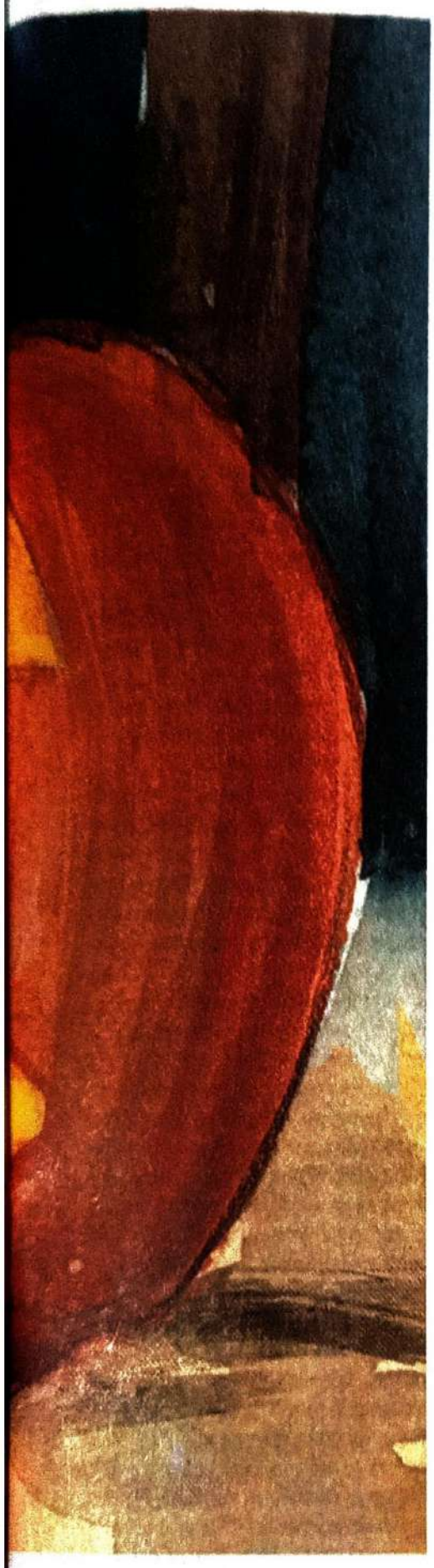

রাফায়েলের বয়স এখন সাতাশ। রোদে পোড়া লালচে গায়ের রং, ছ'ফুটের বেশি লম্বা। গ্রাম্যও কিছু কম যায় না। একশো কুড়ি কেজির কাছাকাছি ওজন। সারা জীবন ধরে পিৎজা খেয়ে আর বিয়ার পান করে ভুঁড়িটাও বাগিয়েছে ভালই। দিলখোলা মানুষ, হা হা করে হাসে।

রাফায়েল বাস করে কানাডা ছোঁয়া ভারমন্ট রাজ্যে। যদিও এই বসবাস করাটা তার নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী নয়। যে বাড়িটায় সে থাকে সেটা তার পূর্বপুরুষদের বাড়ি। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। কয়েক শতাব্দ আগে ফ্রান্স থেকে তার কোনও পূর্বপুরুষ এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন এখানে। বংশ পরম্পরায় মেপল সিরাপ তৈরি করাই ছিল তাঁদের জীবিকা। এ অঞ্চলে প্রচুর মেপল গাছ। তাঁদের নিজস্ব কয়েক একর জমিতেও বেশ কিছু শুগার মেপল গাছ লাগিয়েছিলেন তাঁরা। দেড়শো-দু'শো বছরের পুরনো গাছগুলো আকাশের সঙ্গে গলাগলি করে এখন। কিছু গাছ মরে গেলেও যে ক'টা আছে তাদের থেকে মন্দ আয় হয় না রাফায়েলের।

শীতের শেষে অথবা বসন্তের শুরুতে গাছগুলোয় ড্রিল করে ইঞ্চি দেড়েক চওড়া একটা করে ফুটো করে রাফায়েল। তবে আবহাওয়ারও খেয়াল রাখতে হয়। চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায় মেপলের শরীরে রস প্রবাহিত হয় না। তাই শীতের শেষে রাতগুলো যখন কনকনে ঠান্ডা অথচ দিনে সূর্যের আলো ঝলমল করে, তখনই কাজটা সারতে হয়। নিজের বুক বরাবর প্রতিটি গাছে একটা করে ছিদ্র করে সে। তার পর সেখানে একটা কাঠের গোঁজ লাগিয়ে দেয়। তবে হিসেবে গ্রহণ করলেন, তখন আর কষ্ট হত না। মনে হত, যত ছিদ্র তত অর্থাগম।

রাফায়েলের ঠাকুরদা বলেছিলেন, "নিজের জীবিকার সঙ্গে আবেগকে জড়াবে না। আজ যদি কসাইরা গরু ছাগল হাঁস মুরগি কাটা বন্ধ করে দেয়, তবে আমাদের মাংসের জোগান দেবে কে?"

আর একটা কথাও শিখিয়েছিলেন রাফায়েলের ঠাকুরদা। বলেছিলেন, "গাছের গায়ে ফুটোটা করার সময় একটু তেরচা ভাবে করবে। নইলে গাছের গা বেয়ে সব রস চুঁইয়ে পড়ে যাবে।"

তিন একর জমিতে শ'দুয়েক গাছ ছিল ঠাকুরদার আমলে। তখন রাফায়েলের ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা, মা মিলে সেই রস সংগ্রহ করতেন। নিজেদের জমির ভিতরেই কাঠের উনুনে সেই রস জ্বাল দিয়ে মেপল সিরাপ তৈরি করতেন। তার পর শনি রবিবারে ফার্মার্স মার্কেটে গিয়ে বিক্রি করতেন। এ ছাড়াও কিছু গরু ছিল তাঁদের। কাছাকাছি একটা ডেয়ারি ফার্মের সঙ্গে চুক্তিতে দুধ জোগান দিতেন তাঁরা। ভারী সুখের সময় ছিল তখন।

ভারমন্ট রাজ্যের গ্রিন মাউন্টেনের কাছেই তাঁদের বাড়ি। ঢেউ খেলানো ঘাসের জমিতে যখন সাদার উপর কালো ছোপ দেওয়া নধর গরুগুলো চরে বেড়াত, ছোট্ট রাফায়েল স্কুলের পড়া ভুলে তাকিয়ে থাকত। সুন্দরের পূজারি সে ছোটবেলা থেকেই। আর হেমন্তের প্রকৃতি তো পাগল করে দিত তাকে। সে বুঝতে পারত পাহাড়ের ঢালের, দূরের প্রান্তরের সব মেপল গাছের পাতারা ফিসফিসিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। তার পর হঠাৎ করে এক দিন বহুরূপীর মতো

রাফায়েলের ঠাকুরদা বলেছিলেন, "নিজের জীবিকার সঙ্গে আবেগকে জড়াবে না। আজ যদি কসাইরা গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি কাটা বন্ধ করে দেয়, তবে আমাদের মাংসের জোগান দেবে কে?"

ইদানীং চমৎকার প্লাস্টিকের গোঁজও পাওয়া যায়। সেগুলোর তলায় একটা করে বালতি ঝুলিয়ে দিলেই তার কাজ সম্পূর্ণ হয়। এর পরের কাজ প্রকৃতির। সারা দিন, সারা রাত ধরে টিপটিপ আর টপটপ। মুখঢাকা বালতিগুলোর ছোট্ট ফুটো দিয়ে তাদের অনুপ্রবেশ।

ছোটবেলায় রাফায়েলের ঠাকুরদা যখন গাছগুলোয় ড্রিল করে ফুটো তৈরি করতেন, তখন ভারী কষ্ট হত তাঁর। মনে হত গাছগুলোর শরীরে ব্যথা লাগছে বুঝি। কিন্তু নিজে যখন এই মেপল সিরাপ তৈরিটাকে একটা জীবিকা নিজের নিজের গায়ের রং বদলে ফেলছে। সবুজ থেকে হলুদ, হলুদ থেকে কমলা। সেই রঙের খেলা দেখে তার মনে হত যেন দাবানল লেগেছে বনে। প্রকৃতির প্রেমে আকুল হয়ে ছুটোছুটি করত রাফায়েল। তার সাইকেলটা ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী।

ঝড়ে যে সব মেপল গাছ উপড়ে পড়ে যেত, তাদের টুকরো করে কেটে, বৃষ্টির জলে স্নান করিয়ে, রোদ খাইয়ে পোক্ত করতেন রাফায়েলের ঠাকুরদা এবং বাবা। তার পর মেশিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চমৎকার বাটি-গামলা-

হাতা এবং ওয়াল হ্যাঙ্গিং তৈরি করতেন। শহরের মানুষের বড় পছন্দের হস্তশিল্প। রাফায়েলও সে সব হাতের কাজ শিখে নিয়েছিল ঝটপট। স্কুলের পড়াশোনায় তেমন মন ছিল না তার। রাফায়েলের ঠাকুরদা বলতেন, "কী হবে পড়াশোনা করে? আমাদের যা সম্পত্তি আছে, তাতেই হেসেখেলে চলে যাবে ওর। একটাই তো বংশধর আমাদের।"

একা হলেও একাকিত্ব ছিল না। তিনটে ভারী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল তার। চার্লি, রকি আর ব্রুনো। তবে তারা মনুষ্যেতর। গরুগুলোকে পাহারা দেওয়ার জন্য তাদের এনেছিলেন রাফায়েলের ঠাকুরদা। আর বসন্তকালে যখন মেপলের রসের বালতিগুলো ঝোলানো থাকত, সেগুলোও রক্ষণাবেক্ষণ করত তারা। কেননা, মধুলোভী ভালুকদের বড় প্রিয় এই মেপলের রস। আর পিট বুল ভয়ানক হিংস্র কুকুর। অপরিচিত মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ারেরা কাছে ঘেঁষে না একেবারেই।

তবে বয়ঃসন্ধিতে যখন ক্লারার প্রেমে পড়ল রাফায়েল, তখন তার সঙ্গেও ভাব হয়ে গিয়েছিল ওদের। ক্লারাদের একটা পৈতৃক ডেয়ারি ফার্ম আছে কাছেই। সেখানেই দুধ বিক্রি করতেন রাফায়েলের ঠাকুরদা, পরবর্তীতে বাবা। ষোলো বছর বয়সে যখন ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেল রাফায়েল, তখন দুধ ভর্তি ক্যানগুলো পিক আপ ভ্যানে চাপিয়ে সে-ই পৌঁছে দিত ক্লারাদের ডেয়ারি ফার্মে। প্রেম তো অবধারিতই ছিল। এই দুই সমবয়সি বালক-বালিকা প্রেমে তো পড়লই, সহবাসও শুরু করে দিল। অচিরেই সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ল ক্লারা।

বেলা পড়ে এসেছে। সূর্যাস্তের রং আকাশ জুড়ে। এখন ফল সিজন চলছে। মেপল গাছগুলোর এখন বিশ্রামের সময়। তবুও তাদের ভেলকিবাজির কমতি নেই। শরীরের অন্দরমহলে যেমন রস জমছে, বহিরঙ্গে তারা এখন বহুরূপী। রঙের খেলা দেখানোর জন্য রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়েছে। ভারমন্টের বনে বনে যেন আগুন লেগে গেছে। এই সময় আশপাশের শহরগুলো থেকে অনেক মানুষ আসেন এই রঙের প্লাবন দেখতে। এ অঞ্চলের হোটেল, রিসর্ট, বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টগুলোয় আর ঠাঁই থাকে না।

মেপল কাঠের একটা বড়সড় বাটি তৈরি করছে রাফায়েল। মেশিনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মসৃণ করছে সেটা আর বিয়ারের বোতলে চুমুক দিচ্ছে। মনের ভিতর নানা কথার আনাগোনা। আচ্ছা, নিজের বাড়িতে একটা বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট খুললে কেমন হয়? অনেকগুলো ঘর আছে এই বাড়িটায়। আর আমেরিকান ব্রেকফাস্ট তৈরি করা তেমন কিছু কঠিন কাজও নয়। নিজের জন্য যেমন তৈরি করে, সেটাই একটু বেশি পরিমাণে করে নিলেই হল। দুধ-সিরিয়াল তো মজুদ থাকেই, টোস্ট আর ডিম ভাজা করাও সহজ কাজ। হ্যাঁ, হ্যাশ ব্রাউন তৈরি করাটায় ঝামেলা আছে। অনেক আলু গ্রেট করতে হয়। তবে এ অঞ্চলে এসে কে আর হ্যাশ ব্রাউন খেতে চাইবে? তার চেয়ে মোটা মোটা প্যানকেক তৈরি করে তার উপরে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেপল সিরাপ ছড়িয়ে দিলেই আঙুল চেটে চেটে খাবে সবাই। এমন খাঁটি মেপল সিরাপ আর পাবে কোথায়?

প্যানকেক আর মেপল সিরাপের প্রসঙ্গে ক্লারার কথা মনে পড়ে গেল রাফায়েলের। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেপল সিরাপ খেতে ভারী পছন্দ করত সে। রাফায়েল প্রায়ই মা-ঠাকুরমার নজর এড়িয়ে ছোট ছোট মেপল সিরাপের বোতল দিয়ে আসত তাকে। প্যানকেক কিংবা ওয়াফেল তৈরি করে তার ওপরে মেপল সিরাপ ছড়িয়ে খেত সে। দু'বাড়ির গুরুজনেরা স্থির করেছিলেন বাচ্চাটা হয়ে যাওয়ার পর ওদের দু'জনের বিয়ে দেবেন।

ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে এসে চুরুটটা জ্বালাল রাফায়েল। এই একটি ব্যাপারে ভারী সাবধান সে। তাদের কর্মশালাতে ডাঁই করে রাখা আছে শুকনো মেপল কাঠের গুঁড়ি। আর কে না জানে আগুনের ফুলকি তাদের কেমন প্রিয়।

রোমিও, ব্যান্ডিট আর অস্কার খুব ভৌ ভৌ করছে। কার্ভিং মেশিনটা চলছিল বলে শুনতে পায়নি রাফায়েল। সে ভাবল, এখন আবার কে এল? মেপলের রসের সিজনে আশপাশের জঙ্গল থেকে ভালুক, হরিণ আসে রস খেতে। এ ছাড়া কাঠবিড়ালী আর খরগোশেরও উৎপাত লেগেই থাকে। তাই ওই সময়ে তিনটে কুকুরই শিকল ছাড়া থাকে। কিন্তু এখন তো রসের সিজন নয়।

রাফায়েলের বাবা ও ঠাকুরদার আমলে অনেকগুলো গরু ছিল। তাদের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করত চার্লি, রকি আর ব্রুনো। তবে তারা তো এখন নেই। তাই তাদের মৃত্যুর পর আমদানি করা হয়েছে রোমিও, ব্যান্ডিট আর অস্কারকে। এরা আরও বেশি হিংস্র, বিশেষ করে ব্যান্ডিট। কে জানে, নেকড়ের জিন আছে কি না! ব্রিডিং-এর সময়ে তো ক্রেতারা উপস্থিত থাকেন না। বিজ্ঞাপনে বলে, খুব হিংস্র পিট বুল টেরিয়ার, কিন্তু সে যে কতখানি টেরিফিক হতে পারে, সে কথা তো বলে না। তাই ওদের শিকল দিয়েই বেঁধে রাখে রাফায়েল। নয়তো বাড়ির পিছনের কোর্টইয়ার্ডে ছেড়ে দেয়। কোর্টইয়ার্ডে ছ'ফুট উঁচু কাঠের নিশ্ছিদ্র বেড়া লাগানো আছে। ওই শক্তপোক্ত উঁচু বেড়া ওরা টপকাতে পারে না। গলাবাজিই সার।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে রাফায়েলের বাড়ির সামনের রাস্তায়। রাফায়েলের পরনে একটা ডাংগারি। মাথায় শক্তপোক্ত বাম্প ক্যাপ। ডান হাতে জ্বলন্ত চুরুট। তাই সে বাঁ হাতটা তুলে বলল, "হাই!"

আগন্তুকের গাড়িতে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও তিনটে বাচ্চা। ভদ্রলোক গাড়িটা পার্ক করে এগিয়ে এলেন। বললেন, "আশপাশের হোটেল, রিসর্ট আর বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টগুলোতে জায়গা নেই। বনের মাঝে আপনার বাড়িটা দেখে ভাবলাম হয়তো কোনও রিসর্ট।"

রাফায়েল হা হা করে হেসে উঠে বলল, "না না, এটা আমার বাড়ি। আমি একাই থাকি এখানে।"

আগন্তুক কিন্তু কিন্তু করে বললেন, "আমরা হঠাৎ করেই কোনও প্ল্যান ছাড়া চলে এসেছি। ভাবতে পারিনি যে, থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না।"

রাফায়েল মিচকে হেসে বলল, "একে উইকেন্ড, তার উপরে ফল সিজন, কথাটা আপনার ভাবা উচিত ছিল।"

আগন্তুক তবুও ঘ্যান ঘ্যান করেন, "একটা রাতের জন্য একটু ব্যবস্থা করে দিন না। এত বড় বাড়ি আপনার। খাবারের চিন্তা নেই, আমরা লেট লাঞ্চ করেছি। বাচ্চাদের জন্য খাবারদাবার সঙ্গেই আছে। সকাল সকালই বেরিয়ে যাব আমরা। সেই কানেক্টিকাট থেকে এসেছি। পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা। বাচ্চাদের নিয়ে রাতে ড্রাইভ করতে চাই না।"

কিন্তু রাফায়েল বহু দিন আগেই তার মন থেকে আবেগ নামে অনুভূতিটাকে ছেঁটে ফেলেছে। তাই বলল, "সেটা সম্ভব হবে না। আমার বাড়িতে ঘর আছে ঠিকই, তবে উপযুক্ত বিছানাপত্র নেই। হিটিংয়েরও ব্যবস্থা নেই সব ঘরে। তা ছাড়া দেখছেনই তো, আমার কুকুরগুলো কেমন হিংস্র। আপনি অন্য কোথাও দেখুন। নইলে আমাদের পাশের রাজ্য নিউ হ্যাম্পশায়ার অবধি এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নিন।

ষোলো বছর বয়সে যখন ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেল রাফায়েল, তখন দুধ ভর্তি ক্যানগুলো পিক আপ ভ্যানে চাপিয়ে সে-ই পৌঁছে দিত ক্লারাদের ডেয়ারি ফার্মে। দু'জনের প্রেম তো অবধারিতই ছিল।

তবে ঘর পাওয়ার সম্ভাবনা কম।"

সন্ধে হয়ে গেছে। ওয়ার্কশপে তালা দিয়ে রোমিও, ব্যান্ডিট আর অস্কারকে ব্যাকইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল রাফায়েল। ওদের সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা করে বাড়ির পিছন দিকের দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিল। এখন ওরা গোগ্রাসে খাবে ওই ডগফুডগুলো। তার পর কোনও কাঠবিড়ালী, প্রজাপতি, টিকটিকিও ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। সামান্য আওয়াজ হলেই ভৌ ভৌ করে চেঁচাতে থাকবে।

এই সময়টায় তার পিক আপ ভ্যানটা নিয়ে কাছাকাছি গঞ্জ শহর স্টো-তে যায় রাফায়েল। সারা দিন বিয়ার পান করলেও সন্ধের পর তার চাই বর্বন হুইস্কি। আর একা বসে হুইস্কি পান করতে ভাল লাগে না। এই গঞ্জ শহরটায় তার পছন্দের একটা বার আছে। সেই পানশালাতেই আসে তার কয়েক জন বন্ধু। কেউ ছোটবেলার পরিচিত, কারও সঙ্গে পরবর্তীতে ব্যবসার খাতিরে বন্ধুত্ব। ক্লারার ভাই লুকাসও আসে সেখানে। হুইস্কির সঙ্গে পিৎজা, বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন উইং ইত্যাদি খেয়েই ডিনারটা সেরে ফেলে তারা। তার পর রাত বাড়লে টলতে টলতে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে বাড়ি ফেরে। প্রায় প্রতি রাতেই এই একই কাহিনি।

তবে রবিবার সকালে ঘুম ভাঙতেই রাফায়েল অন্য মানুষ। ঝটপট কুকুর তিনটেকে খাবার দিয়ে, নিজের ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ে সে। বেরোনোর আগে নিজের বাড়ির বাগান থেকেই সংগ্রহ করে একগোছা তাজা ফুল। তবে এখন ফল সিজন চলছে বলে সূর্যমুখী আর চন্দ্রমল্লিকা ছাড়া আর কোনও ফুল নেই বাগানে। এর পরে বরফ পড়া শুরু হলে এগুলোও আর থাকবে না।

কবরস্থানটা ওদের বাড়ির কাছেই। তাই পায়ে হেঁটেই সেখানে যায় রাফায়েল। একটা করে ফুল রাখে ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা ও মায়ের কবরের ওপরে। তার পর সবচেয়ে বড় সূর্যমুখীটা রাখে ক্লারার কবরের ওপরে। হাঁটু গেড়ে বসে বলে, "আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো ক্লারা। যা কিছু ঘটেছে তোমার জীবনে, তার জন্য দায়ী আমি। গত কুড়ি বছর ধরে এই যন্ত্রণা আমার বুকের ভিতরে বয়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো একমাত্র মৃত্যুতেই তার উপশম ঘটবে।"

সপ্তাহের এই একটা দিন কিছুই ভাল লাগে না রাফায়েলের। বন্ধুরা ডাকাডাকি করে সানডে লাঞ্চে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সে যায় না। কোনও কাজও করে না। শুধু স্মৃতি রোমন্থন করে।

তখন ওরা বাড়ির কাছাকাছি একটা হাই স্কুলে পড়ত। সাইকেল চালিয়েই চলে যেত স্কুলে। স্কুল ফেরত কখনও চলে যেত কোনও ঝরনার ধারে কিংবা কোনও প্রান্তরে। একে অন্যকে ভালবাসতে শুরু করল ওরা। একে অন্যের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সঙ্গেও পরিচিত হতে লাগল ধীরে ধীরে। এক অজানা পুলকে শিহরিত হতে লাগল মুহুর্মুহু। তার পর এক দিন জানল শীর্ষ পুলক কাকে বলে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ল ক্লারা।

এক দিন ক্লারার সোনালি রঙের কোঁকড়ানো চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে রাফায়েল বলেছিল, "আমাকে একগোছা চুল দেবে তোমার?"

ক্লারা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "আমার চুল দিয়ে কী করবে তুমি?"

ক্লারাকে চুমু খেয়ে রাফায়েল বলেছিল, "আমার বালিশের তলায় রেখে দেব। ঘুমোনোর সময় আদর করব ওগুলোকে।"

রাফায়েলের পরের জন্মদিনে ক্লারা তার বেশ কিছুটা চুল একটা গিফট ব্যাগে ভরে এনে দিয়েছিল রাফায়েলকে। বলেছিল, "এই নাও তোমার বার্থডে গিফট।"

সেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাফায়েল বলেছিল, "আমার সবচেয়ে পছন্দের উপহার, এই চুলগুলোই সব সময় তোমার উপস্থিতি জানান দেবে আমাকে।"

ক্লারা হি হি করে হেসে বলে উঠেছিল, "গত তিন মাসে আমার যত চুল উঠেছে, সব এই ব্যাগে রাখা আছে। এখন তো আরও চুল উঠবে, সেগুলোও নয়তো রেখে দেব তোমার পরের বার্থডের জন্য।"

কিন্তু রাফায়েলের পরের জন্মদিনটা আর দেখা হয়নি ক্লারার। ওদের ধর্মে ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ, তাই সন্তানটিকে জন্ম দিতে বাধ্য হল সে। একে অপরিণত বয়স, তার উপরে রোগা শরীর, মৃত শিশুর জন্ম দিয়ে নিজেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সে।

চোখের কোল বেয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়ে রাফায়েলের। গত কুড়ি বছর ধরে সম্ভবত একসমুদ্র নোনা জল গড়িয়ে গেছে তার গাল বেয়ে। সে ভেবে পায় না ঈশ্বর এত নিষ্ঠুর কেন? কেন ভক্তদের এমন শাস্তি দেন তিনি? বড় ধর্মভীরু ছিল ক্লারা। প্রতি রবিবার সকালে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করত। বরঞ্চ রাফায়েলই ছিল একটু নাস্তিক গোছের। ক্লারা বিরক্ত হয়ে বলত, "তুমি এমন কেন রাফি? কেন গির্জায় যাও না? কেন প্রভুর কাছে সমর্পণ করো না নিজেকে?"

রাফায়েল হা হা করে হেসে বলত, "তোমার প্রভু কি ম্যাজিশিয়ন? সমর্পণ করার অর্থই-বা কী? তিনি কি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন কার্লি?"

"নিশ্চয়ই রাখেন রাফি। আসল কথাটা কী জানো? বিশ্বাস। তুমি যদি বিশ্বাস করো, তিনি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তা হলে নিশ্চয়ই করবেন।"

"আমি তো ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করি না কার্লি, আমার প্রমাণ চাই। তুমি কি দেখাতে পারবে কোনও প্রমাণ?"

"কেন, মাইথোলজি পড়োনি তুমি?"

"ও সব উপকথা, পুরাকথায় বিশ্বাস নেই আমার। ও-সব বানানো গল্প। কোনও বাস্তব প্রমাণ দিতে পারো?"

না, কোনও বাস্তব ঘটনার প্রমাণ দিতে পারেনি ক্লারা। উপরন্তু অপত্য-সহ তার মৃত্যুটা আরও একটু বেশি নাস্তিক করে তুলেছিল রাফায়েলকে। আর কখনও কোনও গির্জায় যায়নি সে, বাড়িতেও কোনও ধর্মীয় নিশান রাখেনি।

রোমিও, ব্যান্ডিট আর অস্কার ভৌ ভৌ করছে। অর্থাৎ কোনও প্রাণী এসেছে ওদের বাড়ির কাছাকাছি। হ্যাঁ, ওরাই রাফায়েলের রক্ষক। বিপদে-আপদে ওরাই ভরসা। পোর্টিকোর ডেক চেয়ারটায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল রাফায়েল। পরনে ব্লু জিনস, বেজ রঙের জ্যাকেট, পায়ে ব্রাউন রঙের লেদার শু আর মুখখানা ঢেকে রাখা তার প্রিয় কাউবয়

চার দশকের কেতাবি সফর ৪০ দেশ

হ্যাটখানা দিয়ে। পাশের কাঠের টেবিলটার ওপরে রাখা গোটা তিনেক খালি বিয়ারের বোতল।

টুপিটা মুখের উপর থেকে সরিয়ে সে দেখল, লুকাসের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভওয়েতে। উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে কুকুর তিনটেকে কোর্টইয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে এল রাফায়েল। বহিরাগতরা ভয় পান ওদের। বিশেষ করে লুকাসের মেয়ে আরিয়ানা।

কোনও কোনও রবিবারে চার্চ থেকে ফেরার পথে লুকাস আসে রাফায়েলের সঙ্গে আড্ডা দিতে। দশ বছর বয়সি মেয়ে আরিয়ানাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। আরিয়ানাকে বড় ভালবাসে রাফায়েল, আর রাফিকেও খুব পছন্দ করে আনা।

আরিয়ানা পোর্টিকোতে পা রাখতেই রাফায়েল বলল, "বঁজুর মাদমোজেল।"

প্রত্যুত্তরে আনাও বলল, "বঁজুর মঁসিয়ে। তুমি যে এই পচা ভারমন্টে কী করছ! তোমার কোথায় যাওয়া উচিত জানো?"

আরিয়ানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাফায়েল জিজ্ঞেস করল, "কোথায় মাদমোজেল?"

"হলিউডে। তোমাকে দেখতে না একেবারে একজন হলিউড হিরোর মতো।"

"কার মতো বলো তো?"

"আমি তো নাম জানি না, তবে ছবিতে দেখেছি।"

বুকের ভিতর কিছু একটা গলতে থাকে রাফায়েলের। ক্লারাও তো বলত, "তোমাকে দেখতে একেবারে হলিউড হিরোদের মতো।"

পিসি-ভাইঝির চেহারা আর কথাবার্তায় খুব মিল। তাই তো রাফায়েল এত ভালবাসে আরিয়ানাকে। সে যেন ক্লারার প্রতিরূপ।

"রাইট ইউ আর," বলে কিচেনে চলে গেল রাফায়েল। আরিয়ানাও তার পিছন পিছন গেল এবং মিনিট দশেকের মধ্যে মোটা মোটা প্যানকেক প্লেটে সাজিয়ে তার উপরে মেপল সিরাপের বন্যা বইয়ে নিয়ে এল।

দু'চোখ ভরে আরিয়ানার প্যানকেক খাওয়া দেখে রাফায়েল। ঠিক এমনি করেই মেপল সিরাপ মাখিয়ে মাখিয়ে প্যানকেক খেত ক্লারা। এমনি করেই আঙুলের ডগাগুলো চাটত বসে। আর এমনি করেই তার সমুদ্র-নীল চোখের মণিতে ঝিলিক তুলে বলত, "ডেলিশাস!" আর আশ্চর্য, এমনই সোনালি রঙের কোঁকড়ানো চুল ছিল তার। সেই জন্যই তো কার্লি বলে ডাকত রাফায়েল। জিনের কী অদ্ভুত খেলা!

আরিয়ানাকে নিয়ে চলে গেছে লুকাস। একা বসে আছে রাফায়েল। ভাবছে, আজ যদি ওর নিজের সন্তান বেঁচে থাকত, তবে তো কুড়ি বছর বয়স হত তার। সে হয়তো কোনও ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্র্যাড করত এখন। কোথায় পড়ত সে? বস্টনের হার্ভার্ডে নাকি মন্ট্রিয়লের ম্যাকগিলে? দুটো ইউনিভার্সিটিই ওদের বাড়ি থেকে তেমন দূরে নয়। দিব্যি উইকেন্ডগুলোয় চলে যেত ও আর ক্লারা। সারা দিন ঘুরে-ফিরে খেয়ে-দেয়ে মেয়েটাকে খুশি করে দিয়ে আসত। হ্যাঁ, কন্যাসন্তানই চেয়েছিল রাফায়েল, কিন্তু তার কোনও নামকরণ হয়নি। রাফায়েল আর ক্লারা কেউই তেমন পড়াশোনা করেনি। স্কুলের গণ্ডিটুকুও তো পেরোয়নি তারা। কিন্তু নিজেদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

রোমিও, ব্যান্ডিট আর অস্কার ভৌ ভৌ করছে। হয়তো খিদে পেয়েছে ওদের। বেচারা অবোলা জীব। বন্দি জীবনে প্রভুর দেওয়া খাদ্যের উপরেই ভরসা করে থাকতে হয়। তাই কাবার্ড থেকে ওদের ডগফুড বের করে ব্যাকইয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেল রাফায়েল। ওরাও তো তার সন্তানতুল্যই।

আরিয়ানাকে নিয়ে চলে গেছে লুকাস। একা বসে আছে রাফায়েল। ভাবছে, আজ যদি ওর নিজের সন্তান বেঁচে থাকত, তবে তো কুড়ি বছর বয়স হত তার। সে হয়তো কোনও ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্র্যাড করত এখন।

আরিয়ানার কোঁকড়ানো, সোনালি চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে রাফায়েল বলল, "এত বড় কমপ্লিমেন্ট শুনে আমার বুকটা আরও চওড়া হয়ে গেল। তা হলে তো একটা ট্রিট দিতেই হয় তোমাকে।"

হি হি করে হেসে আরিয়ানা বলল, "আমি জানি কী ট্রিট।"

"আচ্ছা! বেশ সবজান্তা হয়ে গেছ দেখছি। বলো দেখি কী ট্রিট?"

"ভেরি সিম্পল, প্যানকেক অ্যান্ড মেপল সিরাপ," জিভে ঝোল টেনে বলল আরিয়ানা।

হেমন্ত শেষ হয়ে শীতকাল এগিয়ে আসছে। রাফায়েলদের বাড়ির চৌহদ্দিটা ঘিরে এখন ঝরাপাতার সরসরানি। হাওয়ার দাপটে যখন শুকনো পাতাগুলো এ-দিক থেকে ও-দিক ছুটোছুটি করে, একটা অতিপ্রাকৃত পরিবেশ তৈরি হয়। মনে হয় যেন কৌলিক আত্মারা এসে ফিসফিস করছেন। হ্যাঁ, এই সময়েই তো মৃত মানুষের আত্মারা এসে হাজির হন তাঁদের উত্তরপুরুষদের কাছে। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর সময় তো হয়েই এল। আসছে সপ্তাহেই হ্যালোইন। কিছু কুমড়ো কিনে আনতে হবে। পাম্পকিন কার্ভিং-এ ওস্তাদ রাফায়েল। সেই ছোটবেলায় ঠাকুরদার কাছে শিখেছিল। লুকাসকেও ডেকে নেয় ওই দিন। এখন তো আরিয়ানাও চলে আসে বিচিত্র ভাবে সেজে। এসেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, "ট্রিট অর ট্রিক?" সঙ্গে সঙ্গে তার কোঁচড় ভরে লজেন্স, চকোলেট, কেক, মেপল সিরাপের বোতল ইত্যাদি দিতে হয়। নইলেই হুমকি, "দ্যাখো আমি কী করি! আমাকে তো চেনো না, হা হা হা।"

আজকাল বেলা তিনটেতেই সন্ধে নেমে আসে। পাম্পকিন কার্ভিং দিয়ে পোর্টিকোটা সাজাচ্ছিল রাফায়েল। ভয়ানক আকৃতির কুমড়োগুলোর মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে একটা প্লেটে মেপল সিরাপে ভেজানো কিছু প্যানকেক রেখে দিল ও। আশপাশে কিছু মেপল সিরাপের বোতল। আরিয়ানার জন্য একটা গুডিব্যাগ ভর্তি করে তার পছন্দের খাবারদাবার রেখে দিল।

সন্ধের পর হিম পড়তে শুরু করে বলে রোমিও, ব্যান্ডিট আর অস্কারকে পোর্টিকোতে এনে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দিল রাফায়েল। সন্ধে পাঁচটা বাজতে না-বাজতেই এসে হাজির লুকাস। গাড়ির আওয়াজ শুনেই ভৌ ভৌ করতে শুরু করল ওরা তিনজন। সমস্বরে। তার পর লুকাসকে দেখে একটু আশ্বস্ত হল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণীটিকে দেখে তাদের বিস্ময়ের সীমা নেই! একটা হরিণ কী করে গাড়ি থেকে নামতে পারে! তাই যথারীতি তাদের গলাবাজি দিয়েই অভ্যর্থনা শুরু করল তারা।

হ্যাঁ, আজ হ্যালোইন বলে হরিণ সেজে এসেছে আরিয়ানা। পুরো শরীরে বাদামি ভেলভেটের আঁটসাঁট বডিসুট। মুখটা ঢাকা হরিণের মুখোশ দিয়ে আর মাথায় ডালপালার মতো শিং। ফলে সারমেয়-বুদ্ধিতে তাকে বন্য জন্তু ভাবতে কোনও বাধা নেই। ওরা তো জানে না হ্যালোইন কাকে বলে!

ওদিকে আরিয়ানাও ভীত-সন্ত্রস্ত। সে কিছুতেই পোর্টিকোর দিকে যেতে রাজি হয় না। বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ির সামনে। রাফায়েল বলে, "একটু দাঁড়াও আনা, আমি ওদের ভিতরের ঘরে রেখে আসছি।"

শিকল তিনটে খুঁটি থেকে খুলে ওদের ভিতরের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় রাফায়েল। হঠাৎ করে রাফায়েলের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায় ব্যান্ডিট। আর তার পিছন পিছন রোমিও আর অস্কারও। কিংকর্তব্যবিমূঢ়

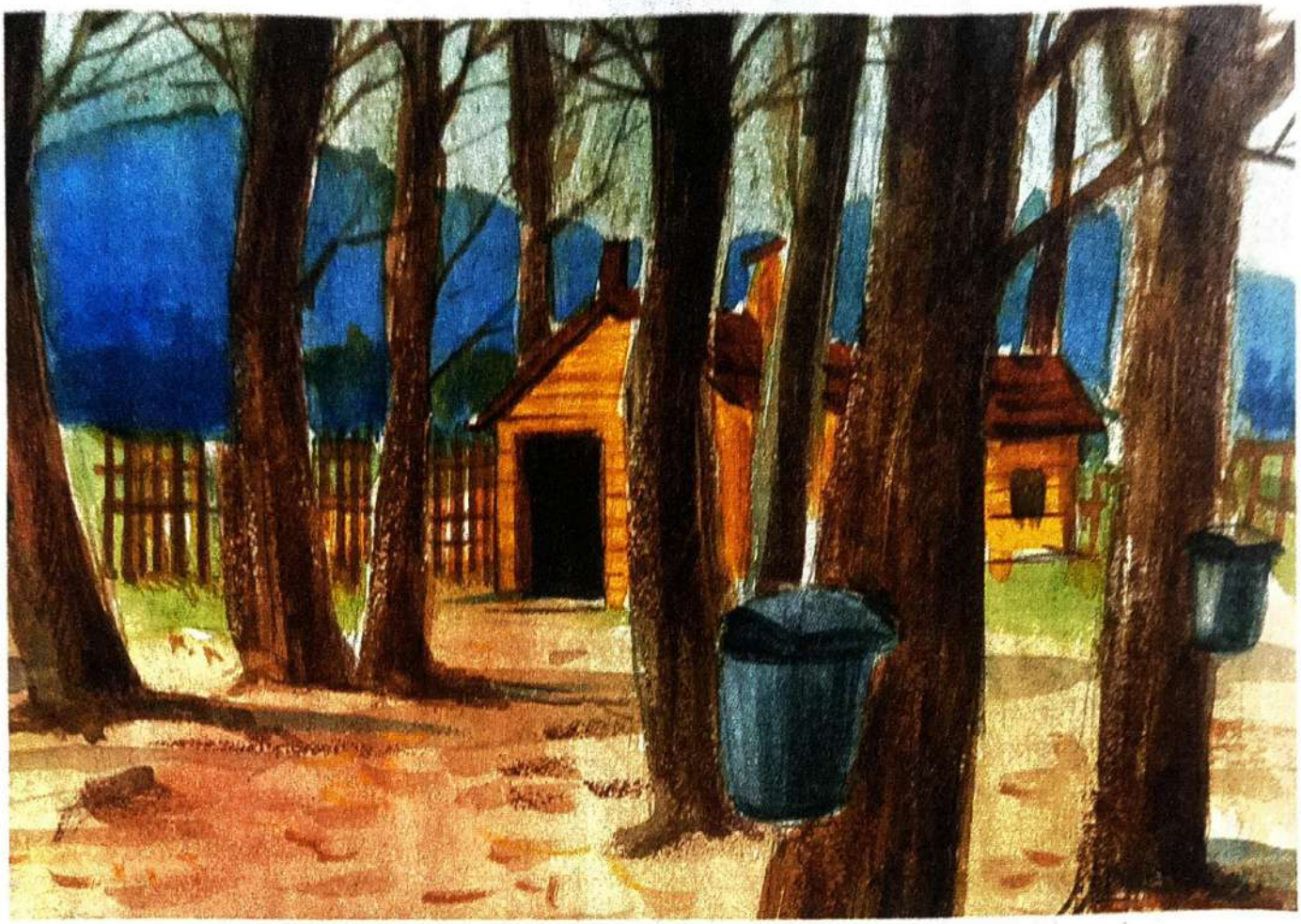

রাফায়েল ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে রিভলভারটা নিয়ে আসে। লুকাস আর আনাও ছুটে গিয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আনার শরীরটা ঢুকলেও পা দুটো বাইরে রয়ে যায়। আর সে দুটোকেই কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে ওরা।

পর পর তিনটে গুলির আওয়াজ। তার পর সব শান্ত। রাফায়েল আনাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে নিজের পিক আপ ভ্যানে শুইয়ে দেয়। লুকাসও গিয়ে বসে পড়ে তার পাশে।

আজ হ্যালোইন বলে হাসপাতালে খুব ভিড়। এই দিনটিতে নানা রকমের দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তাই ডাক্তার আর নার্সরাও তৎপর থাকেন। আনার মা-ও পৌঁছে গিয়েছে। তাকে সামলাচ্ছে লুকাস। আর রাফায়েল ছুটোছুটি করছে। একবার ডাক্তার-নার্সদের কাছে, একবার লুকাসের কাছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলছে, "সব দোষ আমার। আমি একজন ক্রিমিনাল। তোমাদের পরিবারের মেয়েদের ক্ষতি করে চলেছি আমি। আমাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না।"

রাত গভীর হয়েছে। হাসপাতালের ভিজিটর্স রুমে বসে আছে ওরা। ডাক্তার বলেছেন, চিন্তার কিছু নেই, আরিয়ানা ভাল আছে। দুটো পা জুড়ে অনেক সেলাই পড়েছে ঠিকই, তবে সেগুলো ওর আঠারো বছর বয়স হওয়ার পর প্লাস্টিক সার্জারি করে নেওয়া যাবে। ওই মোটা ভেলভেটের অ্যাটায়ারটার জন্য বেঁচে গেছে ও। নয়তো উরুর মাংস খুবলে খেয়ে ফেলত ওরা। তবে তিনটে কুকুর মিলে কামড়েছে তো, অনেকগুলো ইনজেকশন নিতে হবে। সেখানেও বাঁচোয়া যে, কুকুরগুলো ভ্যাকসিনেটেড ছিল।

ভূতগ্রস্তের মতো বসে আছে রাফায়েল। তার মনের ভিতর হাজার কথার আঁকিবুকি। যে-কথাগুলো কখনওই লুকাসদের পরিবারের কাউকে বলে উঠতে পারেনি সে, সেই কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে। সেটা ছিল বসন্তকাল, অর্থাৎ রসের সিজন। ক্লারাকে কবর দেওয়ার দু'দিন পরেই কবর খুঁড়ে তার মৃতদেহটা বের করেছিল কোনও জন্তু। শুধুমাত্র হাড়গোড়গুলো পড়ে ছিল সেখানে। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে এই অঞ্চলে। আশপাশের জঙ্গলে অনেক হিংস্র ভালুক আছে। আর বসন্তকালে মেপলের রসের লোভে প্রায়ই এ অঞ্চলে হানা দেয় তারা। তাদেরই কুকীর্তি ধরে নিয়েছিলেন সবাই। রাফায়েলের ঠাকুরদাই সব চাইতে বেশি নিশ্চিত ছিলেন সে ব্যাপারে।

কিন্তু রাফায়েলের মনে হয়েছিল অন্য কিছু। তাই সে পর দিন চার্লি, রকি আর ব্রুনোর মল নিয়ে ডিএনএ টেস্ট করাতে নিয়ে গিয়েছিল এক পরিচিত ল্যাবরেটরিতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ক্লারার সোনালি, কোঁকড়ানো চুলের গোছাটি। পাঁচ দিন পর যখন রিপোর্ট হাতে এল, তখন বাড়িতে এসেই ঠাকুরদার রিভলভারটা দিয়ে শেষ করে দিয়েছিল কুকুর তিনটেকে।

ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন ঠাকুরদা। পাহারাদার কুকুর ছাড়া যে তাঁর ব্যবসা চলে না। আর, একটা পিট বুলের দাম দেড়-দু'হাজার ডলার। কয়েক বছর ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রাখার পর আমদানি করা হয়েছিল রোমিও, ব্যান্ডিট ও অস্কারকে।

অঝোরে কেঁদে চলেছে রাফায়েল। সে জানে না এই অশ্রুপাত কি ক্লারার স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে আসার ফলে, নাকি আরিয়ানার কষ্টভোগের কথা ভেবে? নাকি অপত্য স্নেহে পালিত রোমিও, ব্যান্ডিট ও অস্কারকে হত্যা করার অপরাধ বোধে?

অঙ্কন: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

ভালবাসার গল্প

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

এখন

"অমল, শেষ পর্যন্ত তুই এ ভাবে আমাদের ঝোলালি! লজ্জা করল না! একটা মেয়ের জন্য এ ভাবে আমাদের সঙ্গে বিট্রে করলি! বলরামদা বলেছে কোনও দিন তোর মুখ দেখবে না," কথাটা বলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে গেল নিতাই।

অমল কী বলবে বুঝতে না পেরে জলের দিকে তাকাল। সামনে দিয়ে দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে শ্রাবণের ভরা মেঘনা।

নদীর পারে মহিদুলদার কাঠের কারখানা। অমল সেখানে এসে একা-একা বসে থাকে। কখনও-কখনও নিতাইও আসে। কিন্তু আজ

নিতাই এলেও বসেনি। ও-ই ওকে দোষারোপ করে চলে গিয়েছে।

আর সত্যি বলতে কী, নিতাই ভুলও কিছু বলেনি। ওদের বহরিয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন আজকের ফাইনালে তো ওরই জন্য জিততে পারেনি। একাই চারটে গোল মিস করেছে অমল। তার মধ্যে একটা পেনাল্টি। প্রথম হাফে ওর করা গোলটার যেন আর কোনও মূল্যই রইল না। দুই-এক গোলে হারের সব দায় এসে পড়েছে ওর ওপর। ও জানে বহরিয়ার মানুষজন ওকে আরও অপমান করবে। জানে, সবাই ওকে বিশ্বাসঘাতক ভাববে। কিন্তু ও কি একটা মেয়ের জন্য এমন করেছে!

মেঘনার বুকে জেলে-নৌকারা ফিরে আসছে এখন। হইয়ের মধ্যে জ্বলে থাকা হলুদ আলোর টিপ হাওয়ায় কেমন যেন কাঁপছে। মনে হচ্ছে জলের ওপর দিয়ে যেন ভেসে আসছে জোনাকিরা।

ও মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। মেঘনার পার থেকে ওদের বাড়িটা খুব কিছু দূর নয়। ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে! মা কি সন্ধে দিল? বাবা কি ফিরল মল্লিকদের বাড়ির পুজো সেরে?

অমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, কেউ কোনও দিন বুঝবে না কেন আজকের ম্যাচটা ছেড়ে দিয়েছে ও।

আজ, কিছু আগে

আসু জ্যাঠা চাঁদপুর টাউনে নিজের বাড়ির নীচেই সাইকেলের দোকান দিয়েছে। সেখানে মাঝেমধ্যে বসে অমল। আসু জ্যাঠা খুব ভালবাসেন অমলকে। একটা সাইকেল দিয়েছেন তিনি। সেই সাইকেল করেই প্র্যাকটিসে যায় ও।

বহরিয়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মেঘনা। তার কিছুটা দূরেই ডাকাতিয়া খাল। এই নদ আর খালের মাঝেই ওদের বাড়ি। লোকে বলে ঠাকুরবাড়ি। চার হিস্সায় বাড়িটা ভাগ করা। অমলদের পূর্ব হিস্সা। একটা বড় উঠোন ঘিরে চারটে ভাগ। বাড়ির পিছনে সামান্য একটা বাগান আছে। সুপুরি নারকেল গাছের সঙ্গে আরও কিছু মরসুমি ফলের গাছও আছে।

এ বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে অমল। ওর ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু সংসারের যা হাল তাতে মা বলছে জামশেদপুরে গিয়ে ওখানকার লোহা কারখানায় চাকরি নিতে। বড় মামা নাকি অমলের জন্য কথা বলে রেখেছেন। মামার বাড়িতেই অমল থাকবে।

কিন্তু অমলের একদম চাকরি করার ইচ্ছে নেই। ও তো ফুটবলার। সূর্য চক্রবর্তীর মতো ও নিজেও কলকাতা গিয়ে বড় ক্লাবে খেলবে। পাশাপাশি সেখানে কলেজে পড়বে। সে সব বাদ দিয়ে কি কেউ লোহা কারখানায় গিয়ে কাজ করে!

আসু জ্যাঠা যদিও এ সবের থেকে বাইরে বেরোতে বলেন। বলেন, "এ সব পাগলামি রাখ। গরিব লোকদের এ সব ভাবলে হয় না। তোর বাপের অবস্থা জানিস না? বড় ছেলে হিসেবে তুই হাল না ধরলে তোর পরের সাত ভাই-বোনের কী হবে ভেবে দেখেছিস? জীবন কি শুধু নিজের বাঁচার জন্য? জীবন আসলে অন্যকে বাঁচাবার জন্য। ভুলে যাস না তোর বাবার কথা।"

বাবার কথা ভাবলে অমলের মন নরম হয়ে আসে। এই মানুষটাকে ও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। কিন্তু মানুষটা বড় দুর্বল। ছোট থেকেই বাবার চোখের অবস্থা খুব খারাপ। ইয়া মোটা কাচের চশমা পরে। তার সঙ্গে শরীরটাও খুব একটা পোক্ত নয়। কিন্তু এই নিয়েও বাবা গোপনে বিপ্লবীদের টুকটাক সাহায্য করত। লিফলেট ছাপানো, জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা, কাউকে বাড়িতে এনে লুকিয়ে রাখা—এই সব করত।

অমলের মনে আছে ওদের বাড়িতে মাস্টারদা এসেছিলেন দু'বার। শ্যামলা মানুষটার চোখ দুটো এখনও মনে আছে অমলের। একই সঙ্গে অমন তীব্রতা আর ঔদাসীন্য কী ভাবে স্থান পায় দৃষ্টিতে!

চট্টগ্রামের ওই ঘটনার পর বাবাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। অত্যাচার করেছিল খুব। আসলে মাস্টারদার খোঁজে ব্রিটিশ পুলিশ আকাশ-পাতাল এক করে দিয়েছিল।

তার পর যখন ছেড়ে দিয়েছিল, বাবাকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল অমলের। বাবা হাঁটতে পারছিল না ঠিক করে। কথাও জড়িয়ে যাচ্ছিল। কানেও ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছিল না।

তার পর দু'বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু বাবা এখনও ঠিক মতো হাঁটতে পারে না। কথা বলতে গেলে জিভটা কাঁপে। মুখচোখ লাল হয়ে যায়। সঙ্গে কানের সমস্যা তো আছেই।

ওদের যা আর্থিক সঙ্গতি, তাতে খুব কিছু চিকিৎসাও ওরা করাতে পারেনি।

আগে যে স্পিনিং মিলে বাবা চাকরি করত, সেটা চলে গিয়েছে। এখন বাবা পুজোআচ্চা করে কোনও মতে সংসার চালানোর চেষ্টা করে। যদিও সেটা চলেই না প্রায়। তাই মা সেলাইয়ের কাজ করে। গ্রামের সবচেয়ে ধনী যারা, সেই মল্লিক গিন্নির সেলাইয়ের খুব শখ। মল্লিক গিন্নি মাকে টুকটাক সাহায্য করে।

মা সেই সাহায্য হাত পেতে নিতে বাধ্য হয়। আর তাতে মায়ের যে কী মানে লাগে! মাঝে মাঝে রাতের বেলা বাবাকে যা খুশি তাই বলে অপমান করে মা। বাবা মাথা নিচু করে বসে থাকে। কোনও কথা বলে না। সামান্য একটা কুপির আলোয় ওদের আধো আবছায়া ঘরে বাবাকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে অমলের মনে হয়, যেন একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি অন্ধকার ঘরের কোণে পড়ে আছে।

চোখ জ্বালা করে অমলের। বাবাকে কেউ কিছু বললে ওর এত খারাপ লাগে! তবু অমল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু যে বলতে পারে না, তার কি আর কষ্ট হয় না!

বাবাকে নিয়ে গ্রামের লোকজনও হাসি মশকরা করে। আসলে মানুষ তো সহজেই অতীত ভুলে যায়। তাদের সস্তার মজা আর রঙ্গ-রসিকতা করতে পারলেই হল। অন্যের মনের খবর কে রেখেছে!

সব মিলিয়ে এক দম বন্ধ করা বাক্সের মধ্যে যেন থাকে অমল। তবে তারই মধ্যে ওকে বাঁচিয়ে রাখে ফুটবল আর স্পিনিং মিলের ছোট ম্যানেজার হ্যারিংটন সাহেবের মেয়ে এলা।

এলাকে ও প্রথম দেখেছিল এক বছর আগে বালিথুবার মাঠে। একটা এক দিনের ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল সেখানে। ওদের ক্লাবের হয়ে গিয়েছিল অমল। যদিও প্রথম দলে সুযোগ পায়নি। মাঠের ধারে বসেছিল। আর ফাইনালে বহরিয়া স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলা পড়েছিল ডরোথি স্পিনিং মিলের টিম 'ইলেভেন স্টার্স'-এর। 'ইলেভেন স্টার্স'-এর টিমে হ্যারিংটন সাহেব ছাড়াও পাঁচ জন সাহেব খেলেছিল। সঙ্গে বাঙালি ছিল পাঁচ জন। খেলাটায় দুই-শূন্য গোলে হেরে গিয়েছিল 'বহরিয়া স্পোর্টিং'। কিন্তু তাতে খুব কিছু কষ্ট হয়নি অমলের। কারণ ওই— এলা।

সেদিন হালকা নীলের ওপর সাদা লেস বসানো একটা জামা পরেছিল এলা। পায়ে লাল বুট। মাথায় নীল রিবন দিয়ে বাঁধা বাদামি চুল। ওর সমবয়সি কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে বসে এলা কখনও হাসছিল, কখনও উত্তেজনায় চিৎকার করছিল। গোলের পরে পাশে রাখা একটা সাদা রুমাল তুলে নাড়ছিল। আর দূরে বসে অমল শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল দৃশ্যটা। আর যেন ঝুপ ঝুপ শব্দ শুনতে পাচ্ছিল

অমলের মনে আছে ওদের বাড়িতে মাস্টারদা এসেছিলেন দু'বার। শ্যামলা মানুষটার চোখ দুটো এখনও মনে আছে অমলের। একই সঙ্গে অমন তীব্রতা আর ঔদাসীন্য কী ভাবে স্থান পায় দৃষ্টিতে!

গোপনে। এমন শব্দ ও নিস্তব্ধ রাত্রিবেলা শুনতে পায়। মাটিতে বাবার পাশে শুয়ে ও শোনে মেঘনার স্রোতের টানে পার ভেঙে পড়ছে। বাবা অস্ফুটে, জড়িয়ে বলে, "মৃত্যু! সেও এমন ধীরে-ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এক দিন এই সব কিছু হারিয়ে যাবে, জানিস অমল।"

অমলের যে কী ভয় লাগে এ সব কথা শুনলে। ও বাবার রোগা হাতটা ধরে থাকে।

কিন্তু সে দিন মাঠের ধারে বসে, নদীর এই ভাঙনের শব্দের মধ্যে ও কোনও ভয়ের আভাস পায়নি। বরং বুঝেছিল এই ভাঙনের মধ্যে এক অনাবিষ্কৃত আনন্দই লুকিয়ে আছে।

নিতাইকে পরের দিন ব্যাপারটা বলেছিল ও।

নিতাই বসু ওর ক্লাসেই পড়ে। ভাল ছেলে। অমলকে ভালওবাসে খুব। একটা পা পোলিওয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে নিতাইয়ের। তাই নিজে ফুটবল খেলতে পারে না। কিন্তু ফুটবল-পাগল এই ছেলেটা ওদের টিমের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

খেলায় হেরে নিতাইয়ের মনখারাপ ছিল খুব। ওরা বসেছিল মহিদুল ভাইয়ের কাঠের কারখানার সামনে।

অমল আলতো করে বলেছিল এলার কথা।

কী বলছে অমল! নিতাই প্রথমে বুঝতেই পারেনি। তার পর ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ায় ও বলেছিল, "ওরে বাবা। হ্যারি সাহেবের মেয়ে! হ্যারি সাহেব তো আমার বাবার কর্তা। ছোট ম্যানেজার। খুব ভাল লোক। বৌ মারা গিয়েছে। মেয়েকে তাই নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। বাবা বলে, বড় সাহেব মানে রিচার্ড আর্চার নাকি হ্যারি সাহেবকে খুব চাপের মধ্যে রাখে।"

নিতাইয়ের বাবা স্পিনিং মিলের ওভারসিয়ার। তাই নিতাই জানতেই পারে। অমল তাকিয়েছিল আরও কিছু জানার জন্য। কিন্তু নিতাই এলার কথা না বলে রিচার্ড সাহেব কী ভাবে হ্যারিংটন সাহেবকে নানা ভাবে অপদস্থ করে, সে সবই বলছিল। শেষে এটাও বলেছিল, "বাবা তো বলে আসলে রিচার্ড নিজের ছোট শালাকে এই পদে চাকরি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হ্যারিংটন সাহেব সেই পদে এসে যোগ দিয়েছে তো, তাই বড় সাহেবের খুব রাগ।"

বিরক্ত লাগছিল অমলের। এ সব জেনে ও কী করবে। ও বলছে এক কথা আর নিতাই হাবিজাবি উত্তর দিচ্ছে। ও বুঝেছিল নিতাইকে বলে লাভ নেই।

মেঘনার পারে এলাকে তার পর থেকে মাঝে মাঝেই দেখত অমল। আরও কিছু ওর বয়সি ব্রিটিশ মেয়ের সঙ্গে আসত এলা। সঙ্গে এক জন বাঙালি আয়াও থাকত।

আর শুধু নদীর পারেই নয়, স্কুল যাওয়ার পথেও ছোট সাহেবের বাংলোর সামনে দিয়ে যেত অমল। আর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখত নিচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ির সামনে, দোলনায় বসে কী একটা বই পড়ছে এলা। বাদামি চুল এসে পড়েছে মুখে। ওর মনে হত জীবনে এমন কিছু জিনিস থাকে, যার কাছে কোনও দিন পৌঁছোনো যায় না। সে সব রাতের আকাশের তারার মতো।

এভাবেই ছ' মাস কেটে গিয়েছিল। তার পর সেবার বন্যা হল ভীষণ।

নদী ছাপিয়ে জল ঢুকে পড়ল গ্রামে। ডাকাতিয়া খাল, ছোট-বড় পুকুর, রাস্তাঘাট, বেনিয়ার মাঠ সব এক হয়ে গেল। ইলিশ মাছ এসে ছটফট করতে লাগল দাওয়ায়। কই মাছ বেয়ে উঠল গাছে। ঘরে ঢুকে চালে জড়িয়ে গেল সাপ।

অন্য উপায় না দেখে ওরা গ্রাম ছেড়ে গিয়ে উঠল আসু জ্যাঠার চাঁদপুর টাউনের বাড়িতে। সেই তিন সপ্তাহ এলাকে আর দেখতে পায়নি অমল। আর তাতে কী যে মনখারাপ হয়েছিল ওর! এই একমুখী ভাল-লাগা যে আরও গভীরে চারিয়ে গিয়েছে, ও বেশ বুঝেছিল। বিকেলবেলা একা ও চুপ করে বসে থাকত সাইকেলের দোকানে। মনে হত যেন ওর নির্বাসন চলছে।

তার পর জল নেমে গিয়েছিল এক সময়। ওরা জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়িতে। কাদায় ডুবে থাকা বাড়ি পরিষ্কার করতে সময় লেগেছিল বেশ। তার পর দিন আবার কাটছিল একই ভাবে।

চার দশকের কেতাবি সফর

সপ্তাহখানেক আগে এক বিকেলে মহিদুলদার কাঠের কারখানায় নিতাইয়ের সঙ্গে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিল অমল। আচমকা এলার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ও। সর্বনাশ! কী ভাবে যে পালাবে বুঝতে পারছিল না অমল। মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে যেন একটা গোটা স্টিমার ঘাটের কোলাহল ঢুকে পড়েছে।

ও মাথা নিচু করে চলে যেতে-যেতে নিজের অজান্তেই একবার তাকিয়েছিল এলার দিকে। আর অবাক হয়ে দেখেছিল এলা ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ পড়তে এলা হেসেছিল সামান্য। তার পর মাথা নিচু করে আয়ার সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

আবার বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছিল অমলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

নিতাই বলেছিল, "সাহেব জানতে পারলে চাবুক দিয়ে মারবে। তোর বাবা মা জ্যাঠা কাকারা জানতে পারলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এ সব করিস না অমল।"

অমল ভেবেছিল, ও করলটা কী!

বলরামদা, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আজ সকালে ক্লাবে অমলকে ধরে বলেছিল, "অমল কলকাতার বড় ক্লাব থেকে লোকজন আসবে ম্যাচে। আজ ফাইনালে তোকে ভাল খেলতে হবে কিন্তু। আমি ওদের তোর কথা বলেছি। এক বছর আগে 'ইলেভেন স্টার্স' আমাদের এই ম্যাচেই হারিয়েছিল মনে আছে তো? আজ পারবি না শোধ নিতে?"

কী যে আনন্দ হয়েছিল অমলের! ভাল খেলতে পারলে তা হলে কলকাতা।

ও দৌড়ে বাড়ি এসেছিল কথাটা মাকে বলবে বলে। কিন্তু বাড়ি এসে দেখেছিল যে, তুলকালাম হচ্ছে।

বাসবকাকা বলে পাড়ার একজন বাড়িতে চিৎকার করে বাবাকে যা নয় তাই বলছে। অমল দেখেছিল বাবা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশ পাতার মতো কাঁপছে।

অমল বুঝেছিল ব্যাপারটা। বাবা পঁচিশ টাকা ধার নিয়েছিল বাসবকাকার কাছ থেকে। সেটা ফেরত দিলেও কথামতো আরও পাঁচ টাকা সুদ এখনও দেয়নি। সেই নিয়ে লোকটা বাবাকে যা নয় তাই বলছিল। অমলের মনে হচ্ছিল বাসবকাকার নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়। ও ভাবছিল ওর টাকা থাকলে ও এখনই ছুড়ে মারত বাসবকাকার মুখে।

মা শেষে একটা রুপোর দুল বের করে বাসবকাকার হাতে দিয়েছিল। বলেছিল, "দয়া করুন আমাদের।"

বাসবকাকা যাওয়ার সময় বাবাকে বলেছিল, "মরে যেতে পারিস না!"

অপমানে বাবা যেন আরও ছোট্ট হয়ে গিয়েছিল। দাওয়ার এক কোনায় বসেছিল মাথা নিচু করে। বাসবকাকা চলে যাওয়ার পরে মা-ও যে কত কিছু বলছিল বাবাকে। মোটা কাচের ভেতর দিয়ে বাবার চোখ দুটো কেমন যে লাগছিল অমলের। ও ভাবছিল টাকা রোজগার না করতে পারলে পৃথিবীতে এত অপমানিত হতে হয়! ভাবছিল, কোনও বাবাকে যেন তার সন্তানের সামনে এ ভাবে অপদস্থ হতে না হয়। সন্তানের সামনে এমন অপমান পিতার কাছে মৃত্যুর শামিল।

আর সেই রাগটাই আছড়ে পড়েছিল খেলার মাঠে।

প্রথম অর্ধে অমল দারুণ খেলেছিল। এক গোল দিয়ে টিমকে এগিয়েও দিয়েছিল। তবে শেষ মুহূর্তে ওদের ডিফেন্সের দোষে একটা সেম-সাইড গোল খেয়ে যায়।

মাঠের ধারে জার্সি খুলে বসে থাকা অমলকে বলরামদা বলেছিল, "সেকেন্ড হাফেও কিন্তু ভাল খেলতে হবে। ওদের পুঁতে দিতে হবে।"

অমল জার্সিটা নিয়ে উঠে বসেছিল, "আজ জিতবই। বলরামদা আমি একটু ওই ঝোপের দিক থেকে হালকা হয়ে আসছি।"

নিতাইও বলেছিল, "চল, আমিও যাব।"

কাজ শেষ করে সাহেবদের টেন্টের পেছনের রাস্তা ধরেছিল অমল আর নিতাই। অমলের লোভ হচ্ছিল আসলে। যদি এলাকে এক বার দেখা যায়! আর ভাবতে ভাবতেই সেই টেন্টের বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল ও। দেখেছিল, বড় টগর গাছের পাশে দুই বান্ধবীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে এলা।

বাদামি চুলের এলা কাঁদছিল। কিন্তু অমল যেন দেখতে পাচ্ছিল বাসবকাকার মুখ। দেখতে পাচ্ছিল আবছায়া একটা ঘর। আর তার মধ্যে ছোট্ট একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে ওর অসহায় বাবা।

এখন

মাথা তুলে সামনে তাকাল অমল। নৌকাগুলো তীরে এসে লাগছে এখন। ওই তো জেলে পাড়ার গৌরদা, মাধো, সতীশ— জল থেকে ফিরে এসেছে ওরা।

গৌরদা অমলকে দেখে চিৎকার করে বলল, "আরে অমল যে! শোন না, বলেছিলি না আমাদের সঙ্গে মাছ ধরতে সমুদ্রে যাবি? আমরা সামনের হপ্তায় যাব। তুই যাবি?"

অমল জোর করে হাসল। বলল, "না গো। আমি সামনের সপ্তাহে জামশেদপুর চলে যাব। লোহা কারখানায় কাজ পেয়েছি একটা।"

"সে কী," গৌরদা চমকে উঠল। বলল, "যাঃ! গ্রাম ছেড়ে চলে যাবি?"

অমল মাথা নাড়ল শুধু।

গৌরদা যেন জোর করেই প্রসঙ্গ পাল্টাল, "তা আজকের খেলায় কী হল রে?"

অমল উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। হেরে গিয়েছে বলতে ভাল লাগছে না। চারটে সুযোগ নষ্ট করেছে ও। গ্রামের সবাই গালি দিচ্ছিল। বলরামদা বলেছে ও যেন মুখ না দেখায়। নিতাই বলেছে একটা মেয়ের জন্য ও এমন করেছে। কিন্তু সত্যিটা কেউ জানবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না।

ওই টেন্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও শুনেছিল টগর গাছের ডাল ধরে, এলা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, রিচার্ড নাকি ওর বাবাকে আজকেও খুব হেনস্থা করেছে। সারাক্ষণ নাকি হেনস্থাই করে। আর আজ এলার সামনেই বলেছে এই ম্যাচ না জিতলে চাকরি থেকে লাথি মেরে বের করে দেবে। কিছু দিন আগে মা মারা গিয়েছে ওর। তার পর চাকরি চলে গেলে বাবা যে কী করবে।

বাদামি চুলের এলা কাঁদছিল। কিন্তু অমল যেন দেখতে পাচ্ছিল বাসবকাকার মুখ। দেখতে পাচ্ছিল আবছায়া একটা ঘর। আর তার মধ্যে ছোট্ট একটা পুঁটলির মতো পড়ে আছে ওর অসহায় বাবা। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেন নিজেকেই লুকিয়ে ফেলতে চাইছে এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে। ওর মনে হয়েছিল সন্তানের সামনে তার বাবাকে অপদস্থ করার মতো খারাপ কাজ পৃথিবীতে খুব কম আছে।

বাড়ির দিকে যেতে-যেতে অমল মেঘনার দিকে তাকাল। পার ভাঙছে স্রোত। এই নদ এক দিন সব গ্রাস করে নেবে। কিন্তু তাও ভালবাসাকে গ্রাস করতে পারবে না।

নিতাই অবোধ, তাই বলেছে যে একটা মেয়ের ভালবাসার জন্য ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হ্যাঁ, অমল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিন্তু সেটা কোনও মেয়ের জন্য নয়। সেটা এক জন বাবার জন্য। সেই বাবা যেন সন্তানের সামনে অপদস্থ না হয়। যেন হেরে না যায়, তার জন্য। এই বিশ্বাসঘাতকতা, ভালবাসারই নামান্তর।

আসলে ভালবাসা ছাড়া সন্তান আর কী-ই বা দিতে পারে তার বাবা-মাকে!

অঙ্কন: কুনাল বর্মণ

১৯৬৪

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা শহরে যে এরকম কিছু থেকে থাকতে পারে, তা জানা ছিল না সজলের। বড় হোটেল মানেই সাহেবি খানা এমনটাই ধারণা ছিল ওর। সেই সব হোটেলকে বাইরে থেকে দেখতে হয় শুধু, আর কখনও ভিতরে ঢুকে পড়লেও, চারপাশ দেখে নিয়ে, বেরিয়ে আসতে হয় তৎক্ষণাৎ, বসে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। যেমন প্রশ্ন ওঠে না, নিজের অতীত নিয়ে মুখ খোলার। কবে থেকে এই শহরে, তার আগে কোথায় বসবাস ছিল, এই জাতীয় প্রশ্নকে ক্যালেন্ডারের পাতার মতো উল্টে যেতে হয়, সজল জানে। জানে মানে শিখেছে, গত আট বছরে।

হ্যাঁ, আট বছর আগের এক ভাদ্রমাসের বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যায় সে পা রেখেছিল এই শহরে। ততদিনে দেশের থেকে ট্রেনে করে এখানে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, একরকম। তাই,

বাস, নৌকা, গরুর গাড়ি চেপে, পায়ে হেঁটে, কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল সজল। তবে সেই আসার ভিতরে আগমনীর সুর নয়, ভয়, উদ্বেগ আর দুর্ভাবনাই ছিল। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে কলকাতা আসার সঙ্গে তা তুলনীয় নয় একেবারেই। শৈশবের সেই যাত্রার মধ্যে মধ্যে মিশে ছিল রোমাঞ্চ; গোয়ালন্দে গাদার মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে যাওয়ার পর দলা করে মাখা শুকনো ভাত মুখে পুরে গিলে দেওয়ার ভিতর থেকেও আনন্দই জেগে উঠেছিল সেবার। কিন্তু আট বছর আগে সজল কলকাতায় চলে এসেছিল চুপিচুপি, পরিবারের লোকেদের বাইরে তেমন কেউ জানত না ব্যাপারটা।

পরিবার বলতে কাকু কাকিমা আর ওঁদের চার ছেলেমেয়ে। সোনা, মনা, মানিক আর রত্না। আট বছর বয়সে মাকে আর বারো বছরে বাবাকে হারানো সজল যখন নিজের মায়ের পেটের বোন সন্ধ্যাকেও হারিয়ে ফেলল ম্যালেরিয়ায়, তখন নিজের বলতে আর কে ছিল ওর? কাকু, কাকিমাই নিজেদের বড় ছেলের মর্যাদা দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন ওকে; আম হোক বা মিষ্টি, সজলকে প্রথমে না-দিয়ে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের দেননি কখনও। দিলে পরে আনন্দই পেত সজল। ওরা প্রত্যেকেই যে প্রাণের টুকরো ছিল ওর। উল্টোদিকে ও ছিল ওদের সব দাবিদাওয়ার কেন্দ্রে। সাভার-এর মাঠে সার্কাস বসেছে, নিয়ে যেতে হবে সজলকে; বারদিতে লোকনাথ বাবার মন্দিরের সামনে পুষ্প প্রদর্শনী দর্শন, সেও সজলেরই দায়িত্ব। এর পাশাপাশি সন্ধ্যা হলেই ওদের পড়াতে বসানোও সজলের কর্তব্যের ভিতরে পড়ত আর সেই সময়টা রীতিমতো কঠোর প্রশিক্ষক সাজারই চেষ্টা করত সে। কিন্তু ব্যর্থ হত প্রায় রোজই। মানিককে তবুও যা পারত একটু, বোনগুলোকে বকাঝকা শুরু করলেই তারা ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে শুরু করত। একসময় সজল বুঝে গিয়েছিল যে, ওই কান্না ওকে বোকা বানানোর কৌশল; কিন্তু বুঝতে পারলেও সব কিছু বুঝিয়ে বলা যায় না। কী করে বোঝাবে যদি নিজেই অনুভব করে যে, ওদের উপর ভালবাসার জোর যতখানি, শাসনের জোর ততটা নয়।

ঘরের শাসনে সোহাগ মিশে থাকবেই। কিন্তু বাইরের শাসনের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করে মানুষ। আর সেখানে যখন পক্ষপাতের ছায়া পড়ে তখন শাসনই অপশাসন হয়ে ওঠে। সেই ছ্যাঁকা যার গায়ে লাগে সেই বোঝে, যন্ত্রণা কতখানি। ক্লাসে প্রথম হয়েও যখন জলপানির জন্য নাম বিবেচিত হল না সজলের, তখন কেবল ওই যে বুঝল, তা নয়, কাকাও বুঝলেন। সজল যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবকে ওর কাকা যতীন্দ্রনাথ বসু অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন একবার। একজন অভিভাবক হিসেবেই নয়, পার্শ্ববর্তী একটি হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক হিসেবেও। কিন্তু ওঁকে বলা হয়, অন্য স্কুলের কে কী পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, তাই নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে, নিজের বিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।

"আমার ভাইপো বলে বলতে আসি নাই। সজল সত্যই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। স্কলারশিপ পাইলে পর বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করতে পারব ও।"

যতীন্দ্রনাথের কথা শেষ হতেই সজলের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই বেশ ক্ষুণ্ণ গলায় বলে ওঠেন, "আমাদের তেমন চিরাগ নিয়া কাম নাই, যে চিরাগ কেবল আপনাদের পোলাপানরাই জ্বালাইতে পারে! ব্রিটিশ আমলে অনেক ব্রিলিয়ান্স দেইখ্যা লইসি, আপনাদের। যত ডাক্তার, যত মোক্তার, সবই তো আপনেগো বাড়ির। অহন কয়দিন আমাগো পোলাদের ভেলকি দেখাইতে দেন।"

"পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াও জলপানি পাইব না তয়?"

"চারদিক নজর করেন, নদীর জল শুকাইয়া গেসে গিয়া। আর পানি তো আপনারা পান করবেন না, তাই না?"

"জলও যা, পানিও তাই। আমি রিকোয়েস্ট করতাসি আপনেরে..."

"প্যাচাল পাইরেন না। মেলা কাম আসে আমার। পরে কোনও ব্যবস্থা হইলে খবর পাঠামু নয়। অহন আসেন গিয়া। সজলের স্কুলের হেডমাস্টার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।"

তার পর আর বসে থাকা সম্ভব নয়, কাকাও তাই ভাইপোর হাত ধরে স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন গনগনে রোদ, জ্যৈষ্ঠের ধান না-পোঁতা মাঠ, বৃষ্টির অপেক্ষায়। আচ্ছা বৃষ্টির জল নেমে আসে পৃথিবীতে, নাকি পানি? সজলের মনে হল।

"তুই এইহানে থাইক্যা বিশেষ কিছু করতে পারবি না। কইলকাতা চইল্যা যা।" যতীন্দ্রনাথ বসুর বাণী বাতাস কেটে নেমে এল তখনই। কাকার সাইকেলে চেপে ঘরে ফেরার পথে, আরও অন্তত বার তিনেক সজল শুনল কথাটা। কিছুই বলল না উত্তরে।

কিন্তু সেই রাতেই যখন অন্ধকার আকাশকে ধুইয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামল মুষলধারে, বাজ পড়তে থাকল কাছে-দূরে, গোয়ালের ভিতর থেকে সদ্য বাছুর-বিয়োনো গোরু ডেকে উঠল ঘুমের ভিতরেই, তখন সজলও আর থাকতে পারল না। এক ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। নাছোড় বৃষ্টির অঝোর ধারায় ভিজতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর একটা ছেঁড়া ছাতা মাথায় কাকা বেরিয়ে এলেন ওর খোঁজে।

"জ্বর আইব তো কালই। ভিজতাছস ক্যান, গরুর লাখান?"

"গোয়ালের গোরুরে আপনি তাড়াইয়া দিতে পারবেন? পারবেন না যখন, আমারে চইল্যা যাইতে কইতাসেন ক্যান?"

"কইতাসি কারণ তুই গরু না। তোর একখান ভবিষ্যৎ আসে।"

"ভবিষ্যতের দরকার নাই আমার। আমি, ভাইবোনগুলানরে ফালাইয়া যামু না কোত্থাও।"

"আমাগো লাইগ্যাই মাইনষের মতো মাইনষ্ হইতে হইব তরে। আমাগো ভরসা যে তুই।"

"কিন্তু অত দূরে গিয়া আমি কী করতে পারুম কারও লাইগ্যা?"

"আশমানের বৃষ্টিও তো দূর থিক্যাই আসে ধরায়। তার পরশে বন্ধ্যা মাটি জাইগ্যা ওঠে না?"

"আপনে গুলাইয়া দিয়েন না তো আর।"

"তরে এই দ্যাশে শুকাইয়া মরতে দিমু না।"

"কলকাতায় আমি চিনি কারে যে সামনে গিয়া খাড়ামু?"

"অচেনা লোক ভালও হইতে পারে। চেনা শয়তানের সুরত তো দেইখ্যা আইলি আজ।"

আর কথা বাড়াতে পারেনি সজল। সেই রাত্রের তিন মাসের মাথায় কলকাতার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল আর শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে বেরিয়েই ভিজে গিয়ে মনে হয়েছিল, যে-বৃষ্টি ওর ভিটে ছেড়ে যাওয়ার আখ্যানের ইট পুঁতেছিল, সেই বৃষ্টিই কি আশ্রয় দেবে আবার?

বাঙালির ভোজন-বিলাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরার স্বপ্ন নিয়ে যে-নতুন হোটেল শুরু হয়েছে, রায় পরিবারের সঙ্গে সেখানে ঢোকার মুহূর্তে সজলের কানে বেজে উঠল, কাকার বলা সেই কথাগুলো—'তুই গরু না। তোর একখান ভবিষ্যৎ আসে।'

অনুরাধার মা এবং ওকে উল্টোদিকের চেয়ারে বসিয়ে, ওর বাবার জন্য নিজের পাশের চেয়ার টেনে পিছিয়ে দেওয়ার সময় সজলের একবার মনে হল, ওদের বাড়ির সেই গরু কি বেঁচে আছে এখনও? আজ, আট বছর পর?

শৈশবের সেই যাত্রার মধ্যে মধ্যে মিশে ছিল রোমাঞ্চ; গোয়ালন্দে গাদার মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে যাওয়ার পর দলা করে মাখা শুকনো ভাত মুখে পুরে গিলে দেওয়ার ভিতর থেকেও আনন্দই জেগে উঠেছিল সেবার।

দুই

চলতে-চলতে তাকালে পর, চালু ঘড়িকেও বন্ধ বলেই মনে হয়। অথচ বাস্তবে যে তৃতীয় কাঁটাটি ঘুরতেই থাকে, সেই বাধ্য করে বড় দুটো কাঁটাকে ঘুরতে। আসলে, মুহূর্তই মহাকালকে নির্মাণ করে কিন্তু কাল কেটে যাওয়ার আগে অবধি তা বুঝতে পারে কে?

সজল যখন জুটমিলে উদয়াস্ত খাটার পরেও রাতের কলেজের ক্লাসে মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করত, তখন সেও বুঝতে পারেনি।

শীত-গ্রীষ্ম একে অপরের জায়গা নিয়েছে; বোধনের উৎসাহ আর বিসর্জনের কান্না একইরকম ঠেকেছে কানে। মাঝে একবার কেবল, যে-পাড়ায় থাকত, তার প্রতিমার ভাসানে গিয়ে জলে নেমে পড়েছিল যখন, প্রতিমার গায়ে ঠেকে গিয়েছিল পা। তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে প্রতিমাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেছিল, জল শুধু জল। না বস্ত্র, না চরণ কিছুই স্পর্শ করতে পারেনি আর। সেই দশমীর রাতে বাড়ি ফিরে এসে কেঁদেছিল সজল। তার মনে হয়েছিল আর কখনও বুড়িগঙ্গার জলের ছিটে মুখে নেওয়া হবে না, বারদিতে যাওয়া হবে না প্রদীপ জ্বালাতে।

অনার্সে ভাল ফল করার পর, সামান্য কয়েকটা টিউশনি আর একটা স্টেশনারি দোকানের খাতা লেখার ভরসায় যখন ছেড়ে দিয়েছিল জুটমিলের চাকরি, তখন সলতে কিংবা তেল কোনওটাই ওর নাগালে ছিল না। কিন্তু সময় যদি ঠিক করে নেয় যে, আলো জ্বালবে তবে প্রদীপের বদলে মোমবাতির জোগান সেই দিয়ে দেয়। নইলে শেয়ালদার যে-মেসে সজল থাকত, সেখানকার সরু সিঁড়ি বেয়ে বিলাসদা উঠে আসবে কেন একদিন?

ওদের বাড়িতে বছর দুয়েক ছিল বিলাসদা, ফরিদপুরের কোটালিপাড়া থেকে এসে। কাকা ওকে নিজের স্কুলে একটা মাস্টারির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আধা-গ্রামের স্কুলে ছাত্র পড়াতে পড়াতেই বিলাসদা কলকাতা আসার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশভাগের দু'তিন বছরের মধ্যেই।

অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে কাকা বারণ করায় বিলাসদা বলেছিল, যেতে যখন হবেই তখন আগে যাওয়াই ভাল।

পঞ্চাশ সালে কথাটার মানে সজল বোঝেনি। বুঝেছিল ছাপ্পান্নয়, যখন নিজেই উদ্বাস্তু হয়ে পা রাখল কলকাতায়। আর ষাট সালে শেয়ালদা স্টেশনে পিঠে একটা চাপড় খেয়ে মুখ ঘোরাতেই বিলাসদাকে দেখে ও।

"কবে আইলি?" প্রশ্ন করেছিল বিলাসদা।

সজল তখনও চিনতে পারেনি ওকে। কিন্তু বিলাসদার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ওর চোখের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল, এক যুগের। রাতে ঘুমের ভিতরেও ফিরে আসছিল সেই প্রশ্ন— "স্যাররে নিয়া আইতে পারলি না?"

কেউ কেউ ভিটে ছাড়ে না, হাজার কষ্টেও। মেসের একটা ঘর আরও তিনজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া সজল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। ভাবতে পারেনি যে, দশ দিনের ভিতর, বিলাসদা একেবারে চাকরির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হবে ওর মেসে।

"কিন্তু তুমি এতখানি..."

সজলকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বিলাসদা বলেছিল, "সেই সময় স্যার ব্যবস্থা না-করলে পরে ভুখা পেটে মরতে হইত। তুই, ভাল শার্ট আর প্যান্ট গায়ে দিয়া যা দেখি একদিন।"

"কিন্তু ফাইনাল না দিয়া আমি..."

সেই অসাধ্যসাধনও করেছিল বিলাসদা। 'মিলার অ্যাসোসিয়েটস'-এর 'জুনিয়র ফাইন্যান্স অফিসার'-এর চাকরি প্রায় পাঁচমাস ধরে রেখেছিল সজলের জন্য। শেষমেশ সজল যখন চাকরিতে যোগ দেয় তখন একষট্টি সাল। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পালনের ধুম। সেই আবহে ওর মনে পড়ে গিয়েছিল, ও কলকাতায় চলে আসার আগের বছরই নিজের স্কুলে বড় করে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করতে গিয়ে কেমন অপমানিত হতে হয়েছিল যতীন্দ্রনাথ বসুকে। শুনতে হয়েছিল, "রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের ঘটাপটা হিন্দুস্তানে গিয়া পালন করেন"।

সেই কথায় দমেননি কাকা, পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন যে, বাংলা জুড়েই হতে হবে রবিঠাকুরের শতবর্ষ পালন; সেই বাংলা হিন্দুস্তানের অংশ হোক বা পাকিস্তানের। পাশেও পেয়েছিলেন অনেককে। কিন্তু লড়াই শেষ অবধি জিতলেও তার ক্ষত ভিতরে থেকেই যায়। তা ছাড়া, কাঁহাতক লড়তে পারে মানুষ?

সজল তাই দেরি না-করে চিঠি পাঠিয়েছিল কাকাকে, সকলকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসার জন্য। ও যে-দুই কামরার বাসা ভাড়া নিয়েছে বেলেঘাটায়, তা জানাতেও ভোলেনি।

সেই চিঠি একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টিতেও আট-দশবার ভারত থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের ঠিকানায় গেছে কিন্তু প্রতিটির উত্তরেই কাকা ইনিয়েবিনিয়ে লিখেছেন যে, ওই বছরের ব্যাচটা খুব ভাল, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি কলকাতায় চলে আসতে পারবেন না।

'আর আমাদের সঙ্গে ইতিহাস যে বিশ্বাসঘাতকতা করল?'—জবাবি চিঠিতে লিখেছিল সজল।

উত্তরে সোনার বিয়ের খবর দিয়েছিলেন কাকা। ওখানকারই একটি ছেলের সঙ্গে। সজলের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

সজল টাকা পাঠিয়েছিল বোনের বিয়েতে। বিলাসদার হাত দিয়ে।

"এইটারে লৌকিকতা কয়, আত্মীয়তা নয়।" বিলাসদা টাকাটা হাতে নিয়ে বলেছিল।

"বিশ্বাস করো, আর যেতে ইচ্ছে করে না ওখানে। যেখানে প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হতে হয়, সেই জায়গাটাকে তুমি আজও নিজের দেশ বলে ভাবতে পারো, আমি পারি না।"

"তুই পাক্কা ক্যালকেশিয়ানদের মতো কথা কইতাছস!" বিলাসদা হেসে উঠেছিল, বেরিয়ে যাবার আগে।

খারাপ সজলেরও লাগছিল, কিন্তু অনন্তকাল তো ঝুলে থাকতে পারে না মানুষ। বিশেষ করে সে যদি অফিসের এক বড়কর্তার নজরে পড়ে যায়। রমেন্দ্রনাথ রায়কে দূর থেকে সেলাম ঠুকে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত ও, কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই যখন কারণে-অকারণে ডেকে পাঠাতে লাগলেন ওকে নিজের চেম্বারে, তখন অস্বস্তির পাশাপাশি একটা ভাললাগাও তৈরি হচ্ছিল।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, সাহেবের মন চেনে পিওন। এক্ষেত্রেও যুগল দেবনাথ ত্রাতা হয়ে অবতীর্ণ হলেন, সজলের কাছে। যুগলদার দেশ বরিশালে, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ এবং নির্ভুল ইংরেজিতে দু'পাতা চিঠি লিখতে পারেন।

"আপনি পিওনের চাকরি করেন কেন?" জিজ্ঞেস করেছিল ওকে সজল একবার।

"কীর্তনখোলা নদীতে ভেসে না-গিয়ে এখানে কী ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, প্রশ্ন সেটা হবে।" যুগলদা উত্তর দিয়েছিলেন।

একেবারে কলকাত্তাইয়া ভাষায় কথা বলতেন যুগলদা আর কোনও একটা কারণে সজলকে স্নেহ করতে শুরু করেছিলেন। একদিন ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, স্যার, বাড়ি কোথায় ইত্যাদি জানতে চাইলে, পূর্ববঙ্গের কথা উচ্চারণ না-করতে।

"কিন্তু আমার বাবা-মার চিতা জ্বলেছে যে-মাটিতে—"

যুগলদা থামিয়ে দিলেন সজলকে—"বাপ-মায়ের অস্থি ভাসিয়েছ নদীতে। আর তুমি জিন্দা আছ। যা বলছি শুনলে, মঙ্গল তোমারই হবে।"

আর পাঁচজনের থেকে একটু বেশি বুঝতেন যুগলদা। সাতদিনের মধ্যে স্যারের চেম্বারে দাঁড়িয়ে টের পেল সজল।

কোনও একটা ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ রায়। হাতের ফোনটা নামিয়েই সজলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আসবে সব চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল থেকে। ওদিকে দেশ কোথায় জানতে চাইলেই বলবে, আমার জন্ম এখানে! তোর জন্ম কোথায় কে জানতে চেয়েছে রে মিথ্যুক!"

সজলের মাথা দপদপ করছিল। ও বেরিয়ে যাবার জন্য পিছন ঘুরতেই রমেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায়? আমার মেয়ের পরীক্ষা সামনে। সেই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

তিন

অনুরাধার সঙ্গে আলাপের পর থেকে কথাও কবিতা হয়ে উঠতে থাকল। রমেন্দ্রনাথ রায়ের মেয়েকে হিসাবশাস্ত্র বোঝানোর চক্করে ওঁদের তালতলার বাড়িতে যাতায়াত, হিসেবের ভিতর থেকেই বেহিসেবের উৎপত্তি, একদিন দু'জনের একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া এবং তাই নিয়ে রমেনবাবুর স্ত্রীর সস্নেহ কৌতুক, সবটাই ম্যাজিকের মতো ঘটছিল। যে-ম্যাজিকে সর্বহারারও সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ঘটে যায়।

সজলের জীবনে সেই প্রাপ্তি ঘটে গিয়েছিল অনুরাধার ঠোঁট ওর গালে নেমে আসায়। মনে হয়েছিল, চুম্বন নয়, ওর হারিয়ে যাওয়া দেশ তথা কৈশোরকেই অনুরাধা এঁকে দিয়েছে ওর গালে। এমন ভাবে, তা আর মুছবে না কখনও।

মুছে যাচ্ছিল অন্য একটা অতীত, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চিঠি আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেন, কী কারণে, সেই খোঁজ আর নেওয়া হয়নি সজলের। জীবন যখন সিংহদরজা খোলে তখন খিড়কির দরজার কথা কাঁহাতক মনে রাখা যায়?

অবশ্য মাসদুয়েক আগে কলকাতার খবরের কাগজে পূর্ব পাকিস্তানে, মিথ্যে গুজব থেকে, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও অশান্তির খবর পড়ে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। উত্তর না-আসায়, দ্বিতীয় চিঠি লিখতে মন করেনি সজলের।

সত্যিটা হল, মনের সবটা জুড়েই অনুরাধা ডানা মেলছিল বলে অন্য কিছু ভাবার ফুরসত ছিল না। ওদিকে অফিসেও প্রোমোশন হল, একটা। তার পিছনে রমেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা নিয়ে গুজগুজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

"রাজার মাকেও তো লোকে আড়ালে ডাইনি বলে। সাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়েটা সুসম্পন্ন হয়ে গেলে আরও বলবে। পাত্তা দিলে হবে?" চা দিতে ঘরে ঢুকে যুগলদা বলেছিলেন একদিন।

কথাটায় জোর পেয়েছিল সজল।

ওই বিয়ের কেটারার ঠিক করতেই, অনুরাধার জেদাজেদিতে, এই নতুন হোটেলে আসা। এর মালিকের কেটারিং সার্ভিসও রয়েছে, অনুরাধা কোন বন্ধুর বিয়েতে খেয়ে এসেছে। প্রাচীনপন্থী রমেন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল প্রথমে কিন্তু ছেলে জার্মানি গিয়ে মেম বিয়ে করে ফেলার পর থেকে তিনি মেয়ের সব কথাতেই সায় দেন একরকম। এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি।

হোটেলের প্রত্যেকটি খাবারই যে রায় পরিবারের প্রত্যেকের মন জিতে নিচ্ছিল, সজল তা টের পাচ্ছিল। ভাল ওরও লাগছিল, কিন্তু সব ছেড়ে আসলেও বাঙালের ঝালের প্রতি টান যায় না। খাবারগুলো একটু মিষ্টি মিষ্টি ঠেকছিল বলে ও তাই কচ করে পাতের কাঁচালঙ্কায় কামড় দিয়েছিল বার দুই।

ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন রমেন্দ্রনাথ। হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগে জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে বাঙালদের মতো লঙ্কা খেতে শিখলে সজল?"

অনুরাধার মা স্বামীকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "যত অবান্তর প্রশ্ন।"

তখনই অনুরাধা ফিসফিসিয়ে সজলকে বলল হোটেলের সামনেই ফুটপাথে বসে থাকা মেয়েটার কাছ থেকে জুঁইফুল কিনে ওর খোঁপায় জড়িয়ে দিতে।

সজল খেয়াল করেনি প্রথমে। অনুরাধার আবদার শুনে রাস্তার ফুলওয়ালির দিকে তাকাল ও। আর তাকাতেই মনে হল একসঙ্গে একশোটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছে। প্রায় ন্যাতা হয়ে যাওয়া একটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে পদ্মাসনা লক্ষ্মীর মতো পথে বসে থাকা রত্না ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "ভাল আছস তো বড়দা?"

সজল মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। কিন্তু ততক্ষণে হিরোশিমার বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

মা-বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অনুরাধাও জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়েটা তোমার কে হয়?"

চার

না, তখন অনুরাধার খোঁপায় মালা পরিয়ে দিতে পারেনি সজল। রায় পরিবারের তিনজনের করা প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেনি। অনুরাধা আর ওর মায়ের প্রশ্নের উত্তরে রত্না যা বলছিল তার থেকে ও-ই বরং জানতে পারল ঘটে যাওয়া সব দুর্ঘটনা। জানল, যতীন্দ্রনাথ বসু হার্ট অ্যাটাক হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। নিজের একমাত্র ছেলেকে সরস্বতীপুজোর দিন একদল জল্লাদ কুপিয়ে কেটেছে, এই দৃশ্য দেখার পর কোন বাবার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে না? আরও জানল যে, সোনা এখনও ওই ভূমিতে থাকলেও, মেজোবোন মনাকে পড়শিবাড়ির সঙ্গে অসমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সজলের বিধবা কাকিমা, রত্নাকে সঙ্গে নিয়েই কলকাতার একটা বস্তিতে উঠে এসে দুই বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছেন।

সজলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে দেখেও রমেন্দ্রনাথ একপ্রকার জোর করেই সজলকে নিজেদের গাড়িতে তুলে, গাড়িটা কয়েকশো মিটার এগিয়ে নিলেন।

"কেন আমাকে ওঠালেন আবার আপনাদের গাড়িতে? আমি তো আমার পরিচয় গোপন করেছিলাম। আর এখন আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সবই জেনেছেন আপনারা। রবিবার সকালে খাসির মাংস কেনার লাইনে দাঁড়ায় না কলকাতার বাবুরা? সেই খাসিটার কথা ভেবেছেন কখনও যার শরীরটা অনেক টুকরা হইয়া অনেক থলিতে ঢুইক্যা যায়? আমাদের পরিবারগুলিও ওই মাংসের। একটা টুকরা আসামে, একটা নারায়ণগঞ্জে, একটা এই কলকাতায়..."

"...এটা কোন ভাষায় কথা বলছ!" রমেন্দ্রনাথ গর্জে উঠলেন সজলের কথার মাঝেই।

"আমার মাতৃভাষায়। আপনি, আপনাদের ভাষায় কথা বলা কারও সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন।"

"তা হয় না। কারণ মেয়েটা তোমায় ভালবাসে।" পিছনের সিটে বসা অনুরাধার গলাটা ওর বাবার গলার মতোই দাপুটে শোনাল।

"উত্তরটা যখন পেয়েই গেলে তখন তাড়াতাড়ি নিজের কাকিমা আর বোনের থাকবার সুবন্দোবস্ত করো। টাকার কথা ভেবো না।"

"এ কথা বলতে আমায় গাড়িতে তুললেন?"

"হ্যাঁ, কারণ রমেন্দ্রনাথ রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলে না।"

আর আমাদের রাস্তাই পৃথিবী — বলতে গিয়েও না বলে সজল নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

অনুরাধাও নামল গাড়ির পিছনের দরজা খুলে। বলল, "আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

পাঁচ

সঙ্গে যাব বললেও সঙ্গে যেতে পারছিল না অনুরাধা কারণ সজল দৌড়োচ্ছিল। আর দৌড়ের কারণটা ও নিজেই খোলসা করল রত্নার কাছে পৌঁছে।

"আমার মনে লইতাসিল তুই আমারে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া না যাস। কিন্তু আমি তো আর হারাইতে পারুম না। আচ্ছা রত্না, তর মনে আসে তগো তিন বইনরেই আমি ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া 'বুড়িগঙ্গা' বইল্যা ডাকতাম?"

"থাকব না ক্যান? কিন্তু আমি এইহান ছাইড়্যা যাইতাম কই? সব ছাইড়্যাই তো আইয়া পড়সি এই শহরে।"

"অহন এইখানেই থাকবি। আমার বাসায়। ভুল কইলাম, আমাগো বাসায়।"

"কিন্তু ওই যে সুন্দরী ছেমড়িটা তোর সন্ধানে আইয়া পড়সে, ও আমাগো থাকতে দিব তরে বিয়া করনের পর?"

সজল দেখল, অনুরাধা ওর দশ-হাত দূরত্বে। দ্রুত হেঁটে আসতে হল বলে কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে ওর। কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছে!

"কী রে বড়দা, দিব?"

রত্নাকে হাত ধরে ফুটপাথ থেকে তুলে দাঁড়িয়ে করিয়ে দিয়ে সজল বলল, "মাইনষের যেমন ঘরের দরকার হয়, ঘরও মানুষ চায়। তা ছাড়া ওই মাইয়াটাও গঙ্গা। কইলকাতার গঙ্গা। বুড়িগঙ্গার মতো না হইলেও, ভাল। খুব ভাল।"

অঙ্কন: বৈশালী সরকার

কবিতার খাতা

বিমল লামা

একটা কবিতার খাতা হারিয়ে গেলে কী হয়? ঘোড়ার ডিম হয়। অন্তত অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছে। বিশেষ করে, যারা ওই খাতার একটা কবিতাও পড়েনি।

কিন্তু খাতার মালিকের কাছে? যার ওই একটাই মাত্র কবিতার খাতা! যে-খাতার পৃষ্ঠাসংখ্যা এক হাজার। যে-খাতার প্রথম পাতায় প্রথম কবিতার পাশে তারিখ লেখা ২০ অগস্ট ১৯৭৩। শেষ পাতার শেষ কবিতার তারিখ ২৫ এপ্রিল ২০১৫। সময়, সকাল ১১টা। মানে বিয়াল্লিশ বছরের কবিতা-প্রয়াস!

ঠিক এই রকমই ঘটেছিল সে দিন। সকাল ১১টায়। খাতার এক হাজার পৃষ্ঠায় শম্ভুনাথ লিখেছিলেন তাঁর শেষ কবিতা। লেখা শেষ করে তিনি নিজেই হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ঢাউস খাতাটার দিকে। মনে এমন আনন্দ হচ্ছিল যে, বলার ভাষা ছিল না তাঁর। এভারেস্টের মাথায় উঠে হয়তো এমন আনন্দই হয়েছিল তেনজিংয়ের!

হাতের তালু প্রসারিত করে শম্ভুনাথ কবিতার ওপর রাখেন। চোখ বন্ধ করে অনুভব করার চেষ্টা করেন অক্ষরগুলোর স্পন্দন। মনে হয়, সত্যিই কবিতার কথারা তিরতির করে কাঁপছে। এতই স্পষ্ট সেই কাঁপুনি যে, শিহরন ছুটে যায় শিরা ধমনীতে। আলোড়ন ওঠে বুকের ভেতর।

এক গোছা পাতা ধরে তিনি উল্টে দেন। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। নিমেষেই সময় পিছিয়ে যায় ম্যাজিকের মতো। মার্জিনে তারিখ ৪ জুলাই ২০০৩। কত সহজেই পেরিয়ে যায় গোটা একটা যুগ। উঠে আসে ফেলে আসা অনুভবের নিবিড় পঙ্‌ক্তিমালা। কত সহজেই পিছিয়ে যায় তার ভাবনা। যেন সত্যিই আগের পাতার গল্প সে সব। সাদা কাগজের উল্টো পিঠে দিব্যি আছে অক্ষর হয়ে। ঘুমন্ত নীরবতায় লীন হয়ে যেন। অথচ জীবন তখন কত মুখর। গোটা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার দুই নাতনি এক নাতি। সঙ্গে এক জোড়া জার্মান শেফার্ড। তাদের পিছনে দুই বউমা। কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির বৌমার শাশুড়ি। পরম তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে। তেমনই সুখবিলাসী কবিতা গোটা পাতা জুড়ে। যেন মুক্তাক্ষরে আঁকা আনন্দ-ঝর্না। তার ওপর হাত রাখলে আজও কানে বাজে সেই প্রাণোচ্ছল কলধ্বনি। উষ্ণতা ফোটে হাতের তালু ভর্তি।

মাথার ভেতর একটা শব্দ বাজে— অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ়। শম্ভুনাথ ভাবেন, আদৌ কি ঘড়ি কখনও উল্টোদিকে ঘোরে! জোর করে ঘোরালে হয়তো ঘুরবে। কিন্তু শুধু ঘড়িই ঘুরবে। সময় ঘুরবে না।

কিন্তু তাঁর সামনেই তো সময় ঘুরছে পিছন দিকে। ম্যাজিকের মতো ঘুরছে। জীবন যেন এক আয়না। যত সামনে ঠেলবে, ততই পিছিয়ে যাবে।

এক গোছা পাতা ধরে আবার পিছিয়ে আসেন শম্ভুনাথ। এখানেও শিশুরা দৌড়ে বেড়াচ্ছে বাড়িময়। তাদের উৎপাতে বাড়ি লন্ডভন্ড। মাত্র চারটি শিশু। তিন ছেলে এক মেয়ে। দু'টি তাঁর। দু'টি তাঁর ভাইয়ের। তখনও যৌথ পরিবার। গুরুজনের আসনে আসীন শম্ভুনাথের বাবা-মা। কত দিনই-বা আগের কথা! মার্জিনে তারিখ লেখা ১ মার্চ, ১৯৮০। মানে পঁয়ত্রিশ বছর হল।

তার মাত্র কয়েক বছর আগেও তো ফাঁকা ছিল তাঁর হাজার পাতার খাতা। খাতাই ছিল না আসলে। ভাবলে অবাক লাগে এক হাজার কবিতা তিনি লিখে ফেলেছেন। অথচ, শুরু করেছিলেন একটাই খোলা পাতা দিয়ে। পাতা জুড়তে জুড়তে সেটা খাতা হতে থাকে, মোটা হতে থাকে। আরও অবাক হন দেখে, ৯৯৯ পাতায় তারিখ লেখা ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫। মানে, প্রায় তিন মাস পর তিনি কবিতা লিখলেন আজ।

হিসাব করে দেখলেন, বছরে তিনি গড়ে মাত্র চব্বিশটা করেই কবিতা লিখেছেন। মানে, মাসে মেরেকেটে দুটো করে কবিতা। অথচ আজ তিনি এক হাজার কবিতার মালিক। মালিক নয়, স্রষ্টা। মনে মনে বিড়বিড় করেন শম্ভুনাথ, হাজার

শম্ভুনাথের বুক ধড়ফড় করতে থাকে কথাটা ভেবে। সাহস করে আর তিনি ভাবতেও পারেন না। এক হাজার গুণিতক এক লক্ষ কত হতে পারে! ভাবনা ওখানেই মুলতবি রেখে তিনি বাকি পাতাগুলো উল্টে ফেলেন।

অথচ তার কয়েক পাতা পরেই বিষাদগাথা। বিদায় বেলার করুণ সুর। পাঁচ বছরের পরিসর যেন ওই কয়েকটা পাতায় জীবাশ্ম হয়ে রয়েছে। এক দিকে স্ত্রীর মৃত্যু, অন্য দিকে দুই ছেলের নতুন চাকরি নিয়ে দেশান্তরে পাড়ি। বউ-বাচ্চা সমেত। গোটা বাড়িতে বধির করা নীরবতা। যেন হঠাৎই কেউ বন্ধ করে দিয়েছে তার জীবনের সব গান। সব কলতান। যেমন করে রেডিয়ো বন্ধ করে লোকে।

দেওয়ালে ঘড়ি চলে টিকটিক। অনেকক্ষণ সে দিকেই চেয়ে বসে থাকেন শম্ভুনাথ। তাঁর কবিতার কবি! হাসেন আপন মনেই।

আগেও তাঁর মাথায় এসেছে কথাটা। একটা বই করার কথা। কিন্তু আমল দেননি নিজেই। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন কথাটা। রীতিমতো তাচ্ছিল্য করেই। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, এই তাচ্ছিল্য ছলনা মাত্র। নিজের সঙ্গে নিজের করা ছলনা। কারণ, বই করার ভাবনা মন থেকে কখনও যায়নি। যত দিন গেছে, প্রবল হয়েছে সে ভাবনা। ভাবনা থেকে ইচ্ছে, ইচ্ছে থেকে আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা। শুধু সঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারেননি কারও কাছে।

তাই বলে হাজার পাতার বই! হাজারটা কবিতা নিয়ে! চাইলে একশো পাতার দশটা বইও করা যায়। কিন্তু তাতে তাঁর কবিতাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে একে অপরের কাছ থেকে। বিগত বিয়াল্লিশ বছরের এক নির্মাণকে দশ টুকরো করে ফেলার মতো হবে সেটা। তার চেয়ে গোটাই থাক তাঁর কবিতা সংগ্রহ।

কিন্তু এত বড় কবিতার বই কে কিনবে! হাজার পাতার বই হাজার টাকা দাম তো হবেই। তাকে তো কেউই চেনে না। নামও শোনেনি কেউ তার। কেন হাজার টাকা দিয়ে কিনবে তার বই?

ভাবতে খারাপ লাগে, প্রত্যেক কবিতার মূল্য দাঁড়াচ্ছে মাত্র এক টাকা। এতই কি সস্তা তাঁর কবিতা? এতই ফ্যালনা! অবশ্য ওই ভাবে ভাবার কোনও কারণ নেই। এক টাকা করে যদি এক লক্ষ লোকে কেনে, তা হলেই তো হয়ে গেল লাখ টাকার কবিতা। একই তো কবিতা, তার এক লক্ষ কপি। সেই হিসাবে ১০০ টাকা করে যদি এক লক্ষ লোকে কেনে! ওরে ব্বাবা! সে তো একশো লক্ষ টাকা! মানে কোটি টাকা।

শম্ভুনাথের বুক ধড়ফড় করতে থাকে কথাটা ভেবে। সাহস করে আর তিনি ভাবতেও পারেন না। এক হাজার গুণিতক এক লক্ষ কত হতে পারে! ভাবনা ওখানেই মুলতবি রেখে তিনি বাকি পাতাগুলো উল্টে ফেলেন। এক নিমেষে প্রথম পাতায়। তারিখ ২০ অগস্ট, ১৯৭৩।

তখন তাঁর আটত্রিশ বছর বয়স। বিবাহিত। দুই সন্তানের পিতা। সরকারি চাকরি করেন উচ্চ পদে। নবীন সুখী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিবার। কলহাস্য মুখর দিনযাপন। হঠাৎ সব ওলট-পালট হয়ে যায়।

সরকার এক নতুন প্রকল্প নিয়ে আসে। গ্রামে ফেরো। যারা গ্রাম থেকে শহরে এসেছে রুজি রোজগারের জন্য, সবাইকে গ্রামে ফিরতে হবে। শহরের রোজগার যাতে একই থাকে, সেটা সরকার দেখবে।

গ্রামের বাড়িতে তখন বাবা-মা থাকেন। সুদূর পশ্চিম প্রদেশে দুর্গম হিমালয়ের কোলে। পুরনো দিনের সম্পন্ন কৃষক পরিবারের বাড়ি। সেই বাড়িতে আবার ফিরে গেছিলেন শম্ভুনাথ। ওখানেই শুরু তাঁর কবিতা লেখার। বছর দশেক পর আবার ফিরে আসেন কাঠমান্ডু শহরে। সরকারি প্রকল্প পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর। বাবা, মা-ও গত হয়েছেন তত দিনে।

প্রথম পাতার অক্ষর সব বিবর্ণ হয়ে গেছে। কোথাও-বা ক্ষয় ধরেছে প্রান্তসীমায়। যেন-বা অস্তিমের শুরু হয়েছে তাদের অস্তিত্বের। যেন তারা কবিতা নয়। মরণশীল জীব কোনও। অথবা পচনশীল ভাবনা।

কিন্তু তখন তাঁর আটত্রিশ বছর বয়স। জন্ম থেকে গ্রামের গণ্ডির ভেতরেই আটকে

থেকেছেন জীবনের বেশির ভাগ সময়। আজ তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ। এত দিনে ভাবনা কি পাল্টাবে না! বিশেষ করে এক হাজার কবিতা লেখার পর। কত যে ঝড় বয়ে গেল দেশের ওপর দিয়ে। শুধুই তো ভাবনার লড়াই। তাঁর মতো মানুষ রাষ্ট্রীয় ভাবনার ভাড়াটে সৈনিক ছাড়া তো আর কিছু নয়। ওই কাজই করে এসেছেন সারা জীবন। এমনকি, অবসরের পরেও রয়ে গেছে সেই স্বভাব। যেন-বা চেতনার ভেতর ছড়িয়ে গেছে শেকড়বাকড়। আজ হঠাৎ মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভাবনা ওল্টাতে বললে হয়?

তার পর আবার হাতের তালু প্রসারিত করে রাখেন প্রথম পাতার ওপর। তাঁর উদ্‌গ্রীব ত্বকে কোনও সাড়া জাগে না। যেন মরে লাশ হয়ে গেছে তার প্রথম কবিতার শব্দেরা। এক ফোঁটা স্পন্দন নেই কোনও বর্ণে। দেখার শুধু এটুকুই, এরা কি মৃত? নাকি অসুস্থ?

শম্ভুনাথ খাতাটা বন্ধ করেন। মলাটের ওপর হাত রেখে বোঝার চেষ্টা করেন আদৌ এর কোনও তাৎপর্য আছে কি না! ভাবনারা জট পাকিয়ে থাকে মাথার ভেতর। স্পষ্ট কোনও উত্তর আসে না। হয়তো উত্তর নেই। থাকে না কখনও। তাই সুযোগ থাকে বেছে নেওয়ার। বেছে নিতে হবে নিজেকেই। না হলে বেছে দেবে অন্য কেউ।

ঘড়ি দেখেন শম্ভুনাথ। পৌনে বারোটা বাজে। মানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তিনি ভাবছেন। তবু কিছুই ভেবে উঠতে পারেননি। পারার কথাও নয়। বিয়াল্লিশ বছরের ভাবনা। কত ঝড়-জল। কত ওঠাপড়া। না জানি আরও কত কি আছে বাকি।

দরজা লাগিয়ে বাইরে আসেন শম্ভুনাথ। একটু চা খেয়ে আসবেন পাড়ার দোকানে। সঙ্গে একটা সিগারেট। বারণ করার তো কেউ নেই। বারণ করারও কিছু নেই। আশি বছর বয়সে আর সিগারেটে ভয় থাকা উচিত নয়। নেইও তাঁর সে ভয়। বরং মনে হয়, হলে ভালই হত! আর কত?

একটা চা শেষ করে আর একটা নেন। একটা সিগারেট শেষ করে আর-একটা। চা-সিগারেট আজ কেন এত ভাল লাগছে কে জানে। মাঝে মাঝে হয় এ রকম। অকারণেই ভীষণ ভাল লেগে যায় কোনও কিছু। অকারণে নয় হয়তো। শুধু অজানা থেকে যায় কারণটা।

দ্বিতীয় চায়ে তৃতীয় চুমুক দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ চলকে পড়ে যায় চা। অকারণেই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর্তচিৎকার ওঠে চারদিকে। তার পর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে থাকে

চার দশকের কেতাবি সফর ৪০ প্রতিভাস

মানুষের ঘরবাড়ি। মাথা ঘুরে রাস্তার উপর পড়ে যান শম্ভুনাথ। রাস্তায় থেবড়ে বসেই তিনি দেখেন গোটা পাড়া কেমন ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল চোখের সামনে। চিৎকার আসে কানে, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

পরক্ষণেই আবার সব স্থির। যেটুকু গেল, গেল। যা রয়ে গেল, যেন রয়েই যাবে বরাবর। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে টিকে যাওয়ার মতো। শম্ভুনাথও রয়ে গেলেন টিকে যাওয়াদের দলে। কিন্তু তাঁর বাড়ি! বাড়িতে এক হাজার কবিতা।

কথাটা মাথায় আসতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান শম্ভুনাথ। দ্রুতপায়ে হাঁটা দেন বাড়ির দিকে। রাস্তায় মাত্র একটা বাঁক। সামান্যই পরিসর। তারই মধ্যে বিস্তৃত ধ্বংসের করাল রূপ। টিকে যাওয়া মানুষের আর্তনাদ আর কান্নাকাটি। যারা টিকতে পারল না তাদের জন্য। প্রিয় মানুষ। প্রিয় বিষয়-আশয়। প্রিয় কত সামগ্রী। কবিতার খাতা।

শম্ভুনাথের বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছে। ধূলিসাৎ হয়েছে তাঁর পাড়া। তাঁর প্রাণের শহর কাঠমান্ডু। রাবিশের স্তূপ পড়ে আছে তাঁর কলহাস্য মুখর পাড়ার জায়গায়। সেই স্তূপের তলায় কোথাও হয়তো চাপা পড়ে আছে তাঁর এক হাজার কবিতা। কী জানি তাদের উদ্ধার করতে আরও এক হাজার বছর লাগবে কি না। যেমন আমরা খুঁড়ে তুলি ইতিহাস। খুঁড়ে তুলি প্রত্নসামগ্রী।

রাস্তার ওপরেই বসে পড়েন শম্ভুনাথ। তাঁর বাসগৃহের ধ্বংসস্তূপের সামনে। যেন সেটাই বসার জায়গা। কেউ কিছু মনেও করে না। কারও কোনও অসুবিধা হয় না। পুলিশ আসে। দমকল আসে। আসে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। আসে অসংখ্য অ্যাম্বুল্যান্স। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করে না কেন তিনি রাস্তায় বসে আছেন। দিন শেষ হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসে আকাশ থেকে। কিন্তু রোজকার মতো ঝলমলিয়ে ওঠে না তাঁর পাড়া। দোকান-বাজার। শব্দ ওঠে জেনারেটরের। বড় বড় আলো পড়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর। যেন সেটাই মঞ্চ। যা কিছু দেখার মতো, ওখানেই আছে। নেপথ্যে হলেও আছে। যেমন আছে তাঁর কবিতার খাতা।

সারা রাত কারও ফুরসত হয় না তাঁর দিকে নজর দেওয়ার। শম্ভুনাথ ঠায় বসে থাকেন একই জায়গায়। চোখের সামনে দিয়ে আসে-যায় অ্যাম্বুল্যান্স। লাল বাতি নীল বাতি জ্বালিয়ে। বারবার। বহুবার। হাজার বার। হয়তো তাঁর কবিতার চেয়েও বেশি বার। বসেই থাকেন শম্ভুনাথ।

পর দিন সকালে কেউ তাঁকে কাগজের প্লেটে খাবার দিতে যায়। শম্ভুনাথ হাত বাড়ান না। তাঁর সামনে কাগজের প্লেটটা নামিয়ে রেখে দেয় খাবার আনা লোকটা। শম্ভুনাথ খাবারের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। রাস্তার ধুলো-ময়লা আর আবর্জনার ওপর কাগজের প্লেট। প্লেটে খাবার। যেন রাস্তারই অংশ।

খাবারের দিকেই চেয়ে ছিলেন শম্ভুনাথ। খাবারের পাশে একটা লাঠির মাথা দেখতে পান। কয়েক বার রাস্তা ঠোকে লাঠিটা। কানে নির্দেশ আসে, "উঠুন উঠুন। সাইডে যান। ডোজার ঢুকবে। ডোজার।"

শম্ভুনাথ চোখ তুলে তাকান। এক জন পুলিশ। ডোজারের জন্য রাস্তা বানাচ্ছে। কিন্তু ডোজার কেন? তাঁর বাড়িতে কি ডোজার চলবে এ বার? কেন? তিনি তো তেমন কিছু করেননি! শুধু তো কবিতাই লিখেছেন। কবিতা লেখার জন্য কি বাড়িতে ডোজার চলতে পারে?

অত ভাবার সময় কেউ দেয় না তাঁকে। দু'জন এসে টেনে তোলে তাঁর শরীরটা। নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়। খাবারটাও এনে দেয় তাঁর নতুন জায়গায়। শম্ভুনাথের দূরত্ব বাড়ে তাঁর কবিতা থেকে।

"এটা আপনার বাড়ি?"

এক জন আপৎকালীন ইউনিফর্ম পরা লোক জানতে চায়। শম্ভুনাথ চোখ তুলে তাকান।

দিন শেষ হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসে আকাশ থেকে। কিন্তু রোজকার মতো ঝলমলিয়ে ওঠে না তাঁর পাড়া। দোকান-বাজার। শব্দ ওঠে জেনারেটরের। বড় বড় আলো পড়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর। যেন সেটাই মঞ্চ।

অধৈর্য প্রশ্ন আবার বাজে কানে, "আপনার বাড়ি?"

আঙুল ধ্বংসস্তূপের দিকে। শম্ভুনাথ মাথা নাড়েন। হ্যাঁ সূচক। পরের প্রশ্ন, "কেউ ছিল ভেতরে?"

শম্ভুনাথ আবার মাথা নাড়েন। আবার হ্যাঁ সূচক। পরের প্রশ্ন, "কে ছিল?"

শম্ভুনাথের শুকনো ঠোঁট কেঁপে ওঠে, ফাঁক হয়। অস্ফুটে কিছু বলেন তিনি। বোঝা যায় না। আপৎকালীন ইউনিফর্ম পরা মানুষটি বলে, "কে?"

এ বার শরীরের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি এক করে শম্ভুনাথ বহু কষ্টে উচ্চারণ করেন, "কবিতা!"

শম্ভুনাথের কানে হঠাৎ মাইক বেজে ওঠে। ঘোষক বলছে, "কবিতা ম্যাডাম, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? পারলে সাড়া দিন। অথবা শব্দ করুন। আমরা উদ্ধারকর্মী। আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। পারলে শব্দ করুন। সাড়া দিন। কবিতা ম্যাডাম... কবিতা..."

শম্ভুনাথ দু'হাত তুলে কিছু বলতে যান উদ্ধারকর্মীকে। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে এসে পড়ে এক চলমান লৌহযান। বুলডোজার। মূর্তিমান ধ্বংসদূত যেন সশরীরে ঢুকে আসে ধ্বংসস্তূপের ভেতর। যদি কিছু বাকি থেকে থাকে ধ্বংস হতে, সেটাই সম্পন্ন করতে যেন। দেখতে দেখতে ধ্বংসদূত মুখ ঘোরায় শম্ভুনাথের বাড়ির দিকে। তার পর বিরাট দাঁতালো চোয়াল বাড়িয়ে দেয়। এক কামড়ে তুলে নেয় তাঁর বাড়ির বিরাট একটা খণ্ড। শূন্যে আধ পাক ঘুরিয়ে আবর্জনার মতো ফেলে দেয় একটা ময়লার গাড়িতে। ঝরে পড়া আবর্জনার ঝর্নার ভেতর শম্ভুনাথ ঠাহর করার চেষ্টা করেন, তাঁর কবিতা আছে কি না! ঠিক মতো দেখে ওঠার আগেই বুলডোজার দ্বিতীয় কামড় বসিয়ে দেয় তাঁর বাড়িতে। সেই অংশও তুলে এনে ঝর্না করে ফেলতে থাকে ময়লার গাড়িতে। ঝর্নার ভেতর ভাঙা গৃহস্থালির হরেক জিনিস। তাদের নতুন ঠিকানা জঞ্জালের গাড়ি।

শম্ভুনাথ ঠাহর করার চেষ্টা করেন, তারই ভেতর কবিতার খাতাটা উঠে এলো কি না। ঠিক মতো দেখার আগেই সব গিয়ে পড়ে জঞ্জাল-গাড়ির পেটে। পরক্ষণেই এসে পড়ে পরের খাবলা। পরের কামড়। আবর্জনার পরবর্তী খেপ।

শম্ভুনাথ হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠে দাঁড়ান ঝটকা দিয়ে। ধেয়ে যান জঞ্জালের গাড়িটার দিকে। তার লোহার কঠিন ডালা দু'হাতে ধরে হাহাকার করে ওঠেন, "কবিতা... কবিতা..."

দু'জন পুলিশ এসে তাঁকে ধরে। জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় নিরাপদ দূরত্বে। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। তাঁর কানের কাছে মুখ এনে এক জন বলে, "ভেতরে কেউ ছিল না। হয়তো কবিতা ম্যাডাম আগেই বেরিয়ে গেছিলেন। আমরা খোঁজ করছি। আপনি চিন্তা করবেন না।"

এক জন পুলিশ পকেট থেকে একটা নোট বই বের করে। সাদা পাতার ওপর কলম ধরে বাগিয়ে। যেন কবিতা লিখবে। কিন্তু কবিতা সে লেখে না। যদিও জিজ্ঞেস করে কবিতার কথাই। বলে, "কবিতা ম্যাডামের পদবি কী ছিল? বয়স কত?"

শম্ভুনাথ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন অফিসারের দিকে। অফিসার অবাক হয়ে বলেন, "কী হল? বলুন?"

শম্ভুনাথ বলেন, "কবিতার কি কোনও পদবি হয়? নাকি বয়স?"

অঙ্কন: পিয়ালী বালা

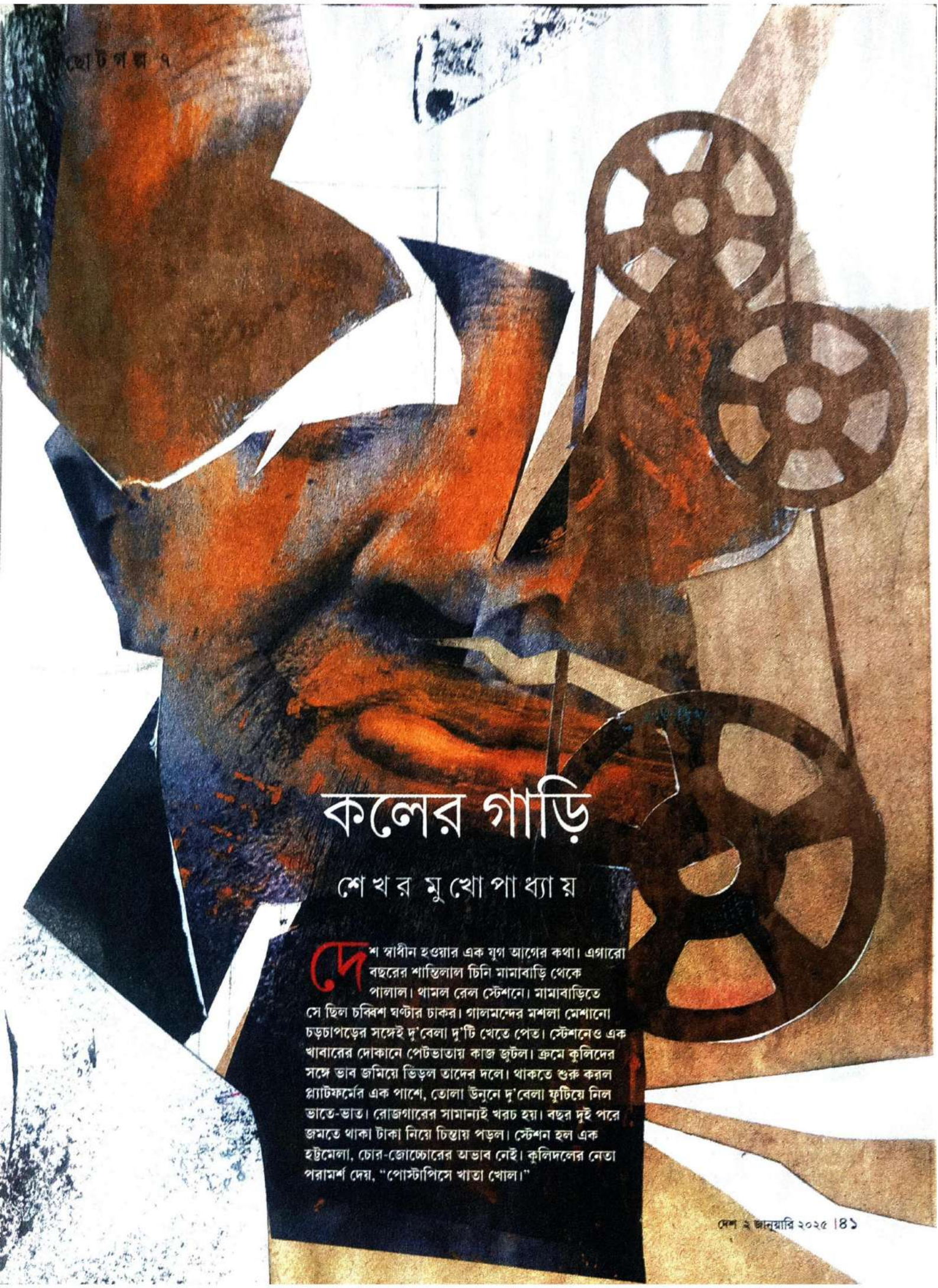

কলের গাড়ি

শেখর মুখোপাধ্যায়

দেশ স্বাধীন হওয়ার এক যুগ আগের কথা। এগারো বছরের শান্তিলাল চিনি মামাবাড়ি থেকে পালাল। থামল রেল স্টেশনে। মামাবাড়িতে সে ছিল চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। গালমন্দের মশলা মেশানো চড়চাপড়ের সঙ্গেই দু'বেলা দু'টি খেতে পেত। স্টেশনেও এক খাবারের দোকানে পেটভাতায় কাজ জুটল। ক্রমে কুলিদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ভিড়ল তাদের দলে। থাকতে শুরু করল প্ল্যাটফর্মের এক পাশে, তোলা উনুনে দু'বেলা ফুটিয়ে নিল ভাতে-ভাত। রোজগারের সামান্যই খরচ হয়। বছর দুই পরে জমতে থাকা টাকা নিয়ে চিন্তায় পড়ল। স্টেশন হল এক হট্টমেলা, চোর-জোচ্চোরের অভাব নেই। কুলিদলের নেতা পরামর্শ দেয়, "পোস্টাপিসে খাতা খোল।"

পোস্ট অফিসের কর্মচারী ফর্মটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বয়স কত?"

শান্তিলাল লম্বা, বয়স্ক সাজার চেষ্টায় টান টান হয়ে কর্কশ স্বরে জবাব দিল, "আঠারো।"

ডাককর্মী বেজার মুখে বলেন, "আমাকে ছাগল পেয়েছিস! বড় জোর পনেরো কি ষোলো। সত্যি করে বল।"

শান্তিলাল জবাব দেয়, "সার্টিফিকেট আছে।"

"সার্টিফিকেট যে জাল নয় তার প্রমাণ কী?"

শান্তিলালের মুখ শুকিয়ে যায়। তার বয়স এখন তেরো। কুলিদাদা কাউকে ধরে জাল শংসাপত্র তৈরি করে এনেছে। পাশ থেকে দাদা সবিনয় মিথ্যাভাষণ করে, "বাবুজি, ও আমার চচেরা ভাই। বয়স আঠারোই বটে।"

"তোর নাম কী?"

"জি, হনুমন্ত পাশোয়ান। আমার খাতা আছে এখানে।"

"বেটা হনুমান, যার পদবি চিনি সে পাশোয়ানের খুড়তুতো ভাই হয় কী করে!"

হনুমন্ত জিভ কেটে বলে, "বাবুজি, রক্তের সম্পর্কে নয়। আমার বাবা আর ওর বাবা ছিল বহুত করিবি দোস্ত। চাচা বলতাম। তা হলে তো ও আমার চচেরা ভাই-ই হল।"

"তা হল বটে! অ্যাই ছোঁড়া, কত টাকা জমা করবি, দে।"

শান্তিলাল এক আনা, দু'আনা মিলিয়ে পঁচিশ টাকা এগিয়ে দেয়। টাকা গুনেগেঁথে যথাস্থানে রেখে ডাকবাবু ফর্মে খটাস খটাস সিল মারেন। সিল মারা এক চিলতে কাগজ শান্তিলালকে দিয়ে বলেন, "যা, তোর অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। পরে স্লিপ দেখিয়ে পাসবই নিয়ে যাস।"

হারু দত্ত বছরে দু'বার বারাণসী যায়। এই লাইনে একটাই বারাণসীগামী ট্রেন চলে। ট্রেনের সময় সকাল সাড়ে-চারটে। হারু প্রতি বারই আগের দিন সন্ধেবেলা স্টেশনে হাজির হয়। গোপালপুর গঞ্জে তার ধানের আড়ত, হারাধন দত্ত এলাকার বড় কারবারি। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, লোকে সমঝে চলে। আড়ালে বলে, "বুড়ো, পিঁপড়ের পিছন টিপে খায়!" কুলিরা তার ধারেকাছে ঘেঁষে না। শান্তিলাল ঘেঁষে। মানুষটার সোজা কথা, আর কম কথার মানুষ। হারুও মনে হয় তাকে পছন্দ করে। বাড়ি থেকে আনা খাবারের ভাগ দেয়। পরিবর্তে শান্তিলাল তার হুঁকোয় তামাক সেজে দেয়। ঝোলাঝুলি তৃতীয় শ্রেণির কামরায় তুলে দিয়ে, হাঁকডাকে সবাইকে শশব্যস্ত করে বসার জায়গা করে দেয়। হারু অবশ্য এক পয়সাও কুলি-ভাড়া দেয় না। বারাণসী থেকে ফিরতি গাড়ি এই স্টেশনে পৌঁছোয় দুপুরবেলা। হারু তিন-চার দিন পর সেই গাড়িতে ফেরে। শান্তিলাল ছুটে গিয়ে হারুর কাঁধের ঝোলা দু'টি নিতে হাত বাড়ায়। হারু আপত্তি করে না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে ঝোলা দু'টি ফিরিয়ে নেয়। হাঁটতে থাকে গোপালপুরের রাস্তায়। গাড়িঘোড়া ভাড়া করে না।

আজও সন্ধেয় স্টেশনে ঢুকল হারু। "জেঠা, ট্রেন তোমার সকালে," প্ল্যাটফর্মে হারুর ঝোলা গুছিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করে শান্তিলাল, "তুমি আগের দিন সন্ধেয় চলে আস কেন?"

"বাপু, এ হল কলের গাড়ি, যদি আগেই এসে পড়ে!"

শান্তিলাল হেসে গড়িয়ে পড়ে, "জেঠা, গাড়ি বরং লেট করে আসে। যদি কোনও কারণে বিফোর টাইম স্টেশনে ঢুকেও পড়ে, ছাড়বে টাইম হলে তবেই।"

"কলের গাড়ি রে বাপু!" হারু মাথা নাড়ে, "সে কি আর মানুষের মতো ভাবে!"

"মানুষ কি মানুষের কথা ভাবে?"

কিশোরের মুখে গম্ভীর প্রতর্কের সূচনায় হারুর কপালে ভাঁজ পড়ে। একদৃষ্টে শান্তিলালকে দেখতে দেখতে বলে, "বয়স কত হল তোর?"

"পনেরো।"

হারু বারাণসী যায়। ক'দিন পরে ফিরতি গাড়ি থেকে নেমে শান্তিলালের হাতে ঝোলা ধরিয়ে বলে, "চল।"

শান্তিলাল বিনাবাক্যে দু'টি ঝোলা দুই কাঁধে তুলে হারুর পাশে পাশে হাঁটে। হারু হাঁটে একটানা ধীরগতিতে, জোয়ান শান্তিলাল তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। ক্রোশ তিনেক অতিক্রান্ত হতে শান্তিলাল ক্লান্তিবোধ করে। আরও কিছু পথ পেরিয়ে এক-একটি ঝোলা মণখানেক ঠেকে, তার ওপর ঘোর গ্রীষ্মের ঠা-ঠা রোদ। শান্তিলালের গতি কমে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে টাঙা, গরুর গাড়ি। একটা থামিয়ে উঠে পড়লে কী হয়! হারু দৃকপাত করে না। গোপালপুর যখন আরও এক ক্রোশ দূরে, শান্তিলালের জিভ বেরিয়ে পড়ে। হারু জোর করে ঝোলা দু'টি ছিনিয়ে নেয়। রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখিয়ে বলে, "খানিক জিরো।"

শান্তিলাল গাছের ছায়ায় বসে হাঁপায়। হারু হাসে, "কী জানিস, মানুষকে দোষ দেওয়া বেকার। তার জীবনটাও ওই কলের গাড়ির মতোই। আগে থেকে তার সব হিসাব বোঝা যায় না। সময় থাকতে যে যেমন পারে গুছিয়ে নিতে চায়। বুঝলি, তাই আমি সন্ধেয় স্টেশনে আসি পর দিন সকালের গাড়ি ধরতে।"

শান্তিলাল গাছের ছায়ায় বসে হাঁপায়। হারু হাসে, "কী জানিস, মানুষকে দোষ দেওয়া বেকার। তার জীবনটাও ওই কলের গাড়ির মতোই। আগে থেকে তার সব হিসাব বোঝা যায় না।"

গোপালপুর গঞ্জের মুখেই হারাধন দত্তের আড়ত। বাড়ি গঞ্জের অপর প্রান্তে। হারু কারবার ও পরিবারে দূরত্ব রাখায় বিশ্বাসী। কারবারের কর্তা সে, পরিবারেরও। তবে পরিবারে দৈনন্দিন সংসারযাপনের ক্ষেত্রে কর্ত্রী তার স্ত্রী মিনতিবালা। তাদের চার সন্তান। বড় মেয়ে বিয়ে হয়ে সংসার করছে শ্বশুরবাড়িতে। বড় ছেলেও বিবাহিত, আড়তে বাপের পাশাপাশি কারবার সামলায়। ছোট ছেলে কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। সবার ছোট সুধাময়ী সাত বছরের বালিকা, পণ্ডিতমশায়ের কাছে বাড়িতে পড়ে।

সম্পন্ন চাষিরা আড়তে নিজেই ধান বিক্রি করতে আসে। বাকিদের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে যোগাযোগ করতে হয়। বাজারে আছে অসংখ্য ফড়িয়া, লোকে পাইকার বলে, তারা চাষির কাছ থেকে ধান কিনে আনে, যে-আড়ত বেশি দাম দেয় সেখানে বেচে। পাইকারদের সঙ্গেও তাই খাতির রাখতে হয়। পারলে, তাদের আগেই পৌঁছে যেতে হয় চাষির ঘরে। ধান কিছু সস্তায় মেলে। এই কাজের জন্য হারুর লোক বহাল করা আছে। তারা সাইকেলে চড়ে উদয়াস্ত গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে এবং হারুর হয়ে চাষির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে। শান্তিলালকেও সে এই কাজে লাগাল। পরবর্তী ছ'বছরে শান্তিলাল সকলের চোখে চতুর পাইকার তথা ধুরন্ধর কারবারি সাব্যস্ত হল। এক দিন সন্ধেয় আড়ত বন্ধের পর তাকে ডেকে পাঠাল হারু। "শান্তি, আমার ছোট মেয়েটা, বুঝলি, তেরো বছরের হল। জীবনও হল তোদের ওই কলের গাড়ির মতো, মরণ কখন এসে পড়ে ঠিক নেই। আমি ভাবছি আরও ক'দিন বাঁচব, ঝোলা গুছিয়ে রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করছি না, হঠাৎ গাড়ি চলে এল হুইসিল বাজিয়ে..." হারু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "সুধাকে তো তুই দেখেছিস। দেখতে-শুনতে..."

তার পর আচমকা জিজ্ঞেস করে, "বিয়ে করবি আমার মেয়েটাকে?"

"আমি!"

"হ্যাঁ, তুই।"

"জেঠা," শান্তিলাল বোঝায়, "কোথায় তোমরা, কোথায় আমি! একটা মাপ তো থাকবে! তোমার মেয়ে লেখাপড়া জানে, বড় ঘরে বিয়ে

হবে। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বর পাবে। এত ছটফট করছ কেন?" ইতস্তত করে যোগ করে, "তোমার মাথাটা ঠিক নেই মনে হচ্ছে।"

"বাড়িতেও সবাই বলছে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে," ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে হারু, "মাথা আমার ঠিকই আছে। বড় ঘর-বর! আমি বছরে দু'বার কাশী কেন যাই জানিস?"

"না।"

"পিসি থাকে। বিয়ে হয়েছিল বড় ঘরে। বাপ মারা যেতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলে মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমিও জায়গা দিতে পারিনি, এমনই আমার কপাল! রেখে এসেছি কাশীতে। মাসে মাসে মানি অর্ডারে টাকা পাঠাই, বছরে দু'বার গিয়ে দেখে আসি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খবরও নেয় না।"

জমাট স্তব্ধতা নামে ঘরে। হারুই নৈঃশব্দ্য ভাঙে, "শান্তি, যারা নিজের মাকে দেখে না, তারা পরের মেয়েকে ভালবাসবে বিশ্বাস হয় না। আমি তোর হাতে সুধাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

"জেঠা, আমার যে চালচুলো নেই। তোমার বাড়ির লোক আমাকে তোমার চাকর জানে। তোমার মেয়েও ..."

"চালচুলো তোর হবে," হারু বলে, "মেয়ে তত দিন আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু, বিয়েটা হয়ে যাক। জীবন হল কলের গাড়ি। কত দিন বাঁচব কে জানে! তার আগে ..."

শান্তিলালকে চিন্তিত দেখায়। হারু বলে, "মিনি মাগনা নয়, শান্তি। তুই-ই বল কী নিবিটিবি।"

শান্তিলাল কিছুক্ষণ ভেবে বলে, "নগদ বারো হাজার টাকা আর একটা সাইকেল।"

"নগদে বারো হাজার!" হারু চোখ কপালে তুলে বলে, "এ যে তুই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দরই চাইছিস, শান্তি!"

শান্তিলাল হাসে, "তা, তুমি আমাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে ভাল পাত্র মনে করো, তার সমান দামটা অন্তত দেবে না!"

"ভাল," হারু মাথা নাড়ে, "আমার কথার গিঁটে আমাকেই বাঁধলি?"

শান্তিলাল নীরব। হারু জিজ্ঞেস করে, "পোস্ট অফিসে কত জমেছে তোর?"

"শ'পাঁচেক।"

হারু হাসে, "চার বছর কুলিগিরি আর ছ'বছর ধানের পাইকারি করে দু'আনি-চার আনি জমিয়ে যখন পাঁচশো বানিয়েছিস, বারো হাজার মূলধন তোর হাতে বহু গুণ বাড়বে।"

একুশ বছরের শান্তিলাল আর তেরো বছরের সুধাময়ীর বিয়ে হয়ে যায়। বাসর জমে না। ফুলশয্যার বন্দোবস্ত হয় দত্তবাড়িরই এক ঘরে। রাত নামে একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে। বিছানায় উপুড় হয়ে সুধাময়ী ফুলে ফুলে কাঁদে। শান্তিলাল অস্বস্তিভরে জিজ্ঞেস করে, "কাঁদছ কেন?"

সুধাময়ী ঝেঁঝে ওঠে, "বাবাকে কী মন্ত্রে বশ করেছ?"

"মন্ত্র!"

"অশিক্ষিত চুয়াড়! আমার কত আশা ছিল, বড় ঘর, শিক্ষিত বর ..."

শান্তিলাল কথা বাড়ায় না। পরদিন নগদ বারো হাজার টাকা আর ঝকঝকে নতুন সাইকেল নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে উদয়পুরের পথে পাড়ি জমায়।

বছর তিন পরে হারু মারা গেল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের বছর। তত দিনে উদয়পুরে শান্তিলালের ধানের আড়ত জমতে শুরু করেছে। আরও দু'বছর যায়। শান্তিলাল খবর পায় হারাধন দত্তের রেখে যাওয়া কারবারে ধস নেমেছে। আড়তটা শেষ পর্যন্ত থাকে কি না সন্দেহ। লোকে আজকাল ধান বেচতে গোপালপুর যায় না, আসে উদয়পুরে। তার দুই সম্বন্ধী তাকেই গাল পাড়ে। সে-ই নাকি তাদের ব্যবসা ছিনিয়ে নিচ্ছে। সুধা চিঠি লেখে শান্তিলালকে। সে যেন তাকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। আর, মাকে কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে সুধা? দাদারা হয়তো মাকে কাশী কি বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেবে, বাড়িতে তেমনই আলোচনা চলছে।

শান্তিলাল গোপালপুর আসে। নগদ বারো হাজার টাকা ধরিয়ে দেয় বড় সম্বন্ধীর হাতে, "হারুজেঠার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম।"

সম্বন্ধীর মুখে তিক্ত হাসি, "তাও ভাল!"

"বলছিলাম," শান্তিলাল সবিনয় নিবেদন করে, "উদয়পুরে শুরুতেই একা সুধার পক্ষে সংসার সামলানো সহজ হবে না। শাশুড়ি-মা যদি..."

"সে মাকে তোরা নিয়ে যা। রাখ নিজেদের কাছে। অসুবিধা নেই।"

বউ এবং শাশুড়িকে নিয়ে উদয়পুর রওনা হয় শান্তিলাল। বউ আসে ম্লান মুখে। মিনতিবালা নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে। কারও জন্যই সান্ত্বনাবাক্য খুঁজে পায় না শান্তিলাল।

মা-মেয়ের হাতে সংসার গুছিয়ে ওঠে। ক্রমে তিন সন্তানের জননী হয় সুধা। দুই ছেলে হীরালাল ও পান্নালাল, এক মেয়ে নীলা। নীলা সবার ছোট। শান্তিলালের কারবার বাড়ে। ধানের আড়তদার থেকে হয়ে ওঠে রাইস মিল, কাঠগোলা এবং সবশেষে পেট্রল পাম্পের মালিক। জমিজমাও যথেষ্ট করেছে। ভাল ঘর-বর দেখে মেয়ের বিয়ে দেয়। হীরালাল লেখাপড়ায় বিশেষ এগোল না। ঢুকে গেল বাপের কারবারে। ছোট ছেলে মেধাবী পান্নালাল বিদেশে পড়তে গিয়ে থিতু হল সেখানেই। ইতিমধ্যে মিনতিবালা পরলোক গমন করেছেন। ছেলেরা অন্ত্যেষ্টিকালেও আসেনি। তখন থেকে শান্তিলাল প্রায়ই স্ত্রীকে বলে, "সুধা, একটা বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করলে কেমন হয়?"

সুধা অবাক হয়ে বলে, "কেন? কার জন্যে?"

"বুড়োবুড়িদের জন্যে। আমরাও তো বুড়ো হব, আমাদের জন্যেও বলতে পারো। রক্তের সম্পর্কের ভরসা নেই। বাঁচতে হয় নিজের দাপটে। বয়স হলে দাপট কমে। তখন বুড়োবুড়িদের একটু বেঁধে বেঁধে থাকা দরকার। বৃদ্ধাশ্রম নিজের হলে, ম্যানেজমেন্টও হবে আমাদের নিজের। সে একরকম নিজের বাড়িই বলতে পারো।"

"কী সব হাবিজাবি ভাবো!" সুধা বিরক্তিভরে জবাব দেয়, "এত বড় বাড়ি, ছেলে-বউ-নাতি-নাতনি নিয়ে এমন ভরা সংসার ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে কি মরতে যাব! তুমি বাপু এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ!"

শান্তিলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

শান্তিলালের বয়স হল সাতষট্টি। শরীর ভাল যাচ্ছে না। শরীরের দোষ নেই। কারবার বাড়ানোর চেষ্টায় শান্তিলাল উদয়াস্ত পরিশ্রম যেমন করেছে, নাওয়া-খাওয়ার অনিয়মও কম করেনি। ছোটখাটো শারীরিক জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করায় তার জুড়ি মেলা ভার। সহসা ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। বাধ্য হয়ে যখন গেল, আবিষ্কার হল অগ্ন্যাশয়ে বাসা বেঁধেছে কর্কট ব্যাধি, অন্তিম পর্যায়। পারিবারিক আবহাওয়ায়

চার দশকের কেতাবি সফর

প্রতিভাস

দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। রোগশয্যায় শুয়ে সবই টের পায় শান্তিলাল। এক দিন হীরালাল সামনে এসে দাঁড়ায়, "বাবা, সময় থাকতে সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করে যাও। নইলে, পরে ঝামেলা বাধবে।"

"নিশ্চিন্ত থাক। সব তোদের তিন জনের মধ্যে সমান ভাগ করে দেব।"

"তিন জন!"

"কেন! তুই, পান্না আর নীলা।"

"পান্না দেশে ফিরবে না। নীলা তো মেয়ে!"

"পান্না ফিরুক, না-ফিরুক, সম্পত্তিতে ওর তিন ভাগের এক ভাগ পাওনা। আর, আজকের আইন জানিস না! বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের সমান ভাগ।"

"না, মানে, তুমি যদি উইল করে ..."

"পান্না আর নীলাকে বঞ্চিত করে যাই? কেন করব?"

"পান্না আর নীলা তোমাকে দেখতে আসছে? দেখছি তো আমি।"

"এই তো মাত্র ক'দিন একটু দেখছিস। তা-ও," সোজাসুজি বলে শান্তিলাল, "আমার টাকা আছে তাই। টাকা না থাকলে কী হত আমি জানি। যা ভাল বুঝব তা-ই করব। সারা জীবন খেটে যেমন শরীরের এই রোগ হয়েছে, তেমনই এই অধিকার আমি অর্জন করেছি। যা, ভাগ, জ্বালাস না।"

বড় ছেলে গজগজ করতে করতে চলে যায়। উকিল বলরাম চৌধুরী তাঁর সহকারীদের নিয়ে মক্কেলের বাড়িতে এসে দানপত্র তৈরি করেন। শেয়ারবাজারের দালাল পরাশর জানাও ডাক পেয়ে আসেন চিনিবাড়িতে। শান্তিলালের সঙ্গে দু'জনেরই রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। কী ব্যাপার কেউ জানতে পারে না।

শান্তিলালকে প্রতি দিন আরও অসুস্থ দেখায়। থেকে থেকে বিকৃত স্বরে বলে ওঠে, "কলের গাড়ি! আগেই এসে পড়েছে! আর সময় নেই।"

সময় যে নেই সে সবাই বোঝে। কিন্তু দানপত্র লিখলেই হয় না, প্রাসঙ্গিক দফতরে তার নথিভুক্তি ঘটিয়ে দলিলে রূপান্তরিত করা চাই। সেই উদ্দেশ্যে দাতাকে মুখ দেখাতে হয় সেই সব দফতরের আধিকারিকদের কাছে। শান্তিলালের অসুস্থতা দর্শিয়ে বাড়িতেই কমিশন বসানো হল। পান্নালাল তখনই বিদেশ থেকে আসতে পারল না। তবে, হীরালাল আছে, মেয়ে-জামাইও হাজির। শান্তিলাল দৃশ্যত উঠে বসতেও অপারগ। চোখ বুজে মুখ হাঁ করে শ্বাস নেয়, বুক হাপরের মতো ওঠে আর নামে।

সাব-রেজিস্ট্রার সাহেব বিছানার পাশে চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করেন, "এ দিকে তাকান। সম্পত্তি কাকে দিচ্ছেন?"

মুহুরি, বড় ছেলে এবং জামাই শান্তিলালের কানের কাছে চিৎকার করে অফিসারের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। শান্তিলালের ঠোঁট নড়ে। মুহুরি বলে, "দুই ছেলে আর মেয়েকে তো?"

শান্তিলালের মাথা বালিশে কেঁপে ওঠে। সাব-রেজিস্ট্রার সাহেব বলেন, "আপনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এ সব দান করছেন?"

আবারও সকলে প্রশ্ন শান্তিলালের কর্ণকুহরে চালানোর চেষ্টায় সোচ্চার হয়। শান্তিলাল আবারও কিছু বলতে গিয়ে কেঁপে ওঠে। সবাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নেয়।

"বেশ," সাব-রেজিস্ট্রার শুনানি সমাপ্ত করেন, "মানুষটার তো শ্বাস উঠে গেছে, মশায়!"

শান্তিলালের চোখ জ্বলে ওঠে, স্পষ্ট স্বরে বলে, "কলের গাড়ি।" বুকে ঘড়ঘড় আওয়াজ

এক দিন আবিষ্কার হল অগ্ন্যাশয়ে বাসা বেঁধেছে কর্কট ব্যাধি, অন্তিম পর্যায়। পারিবারিক আবহাওয়ায় দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। রোগশয্যায় শুয়ে সবই টের পায় শান্তিলাল। এক দিন হীরালাল সামনে এসে দাঁড়ায়।

শান্তিলাল, সুধাকে বলে, "বুঝলে, তোমাকে কিছু দিলাম না। যা দেব, আমি চোখ বোজামাত্র হীরা সব ওর নামে লিখে দিতে বলবে। সুধাময়ী তখন স্নেহময়ী মা হয়ে সেই দাবি মেনেও নেবে। ফলে, লাভ নেই।"

"আমার চিন্তা কোরো না," সুধাময়ী জবাব দেয়, "মুখে কিছু আটকায় না তোমার। বড্ড কাঠ কাঠ কথা বলো। সংসারের চিন্তা ছেড়ে শান্ত হও। শরীর তোমার ভাল নেই, তার উপর এ সব..."

হয়, দূরাগত রেলগাড়ির মতোই। মাথা হেলে পড়ে। চোখ জ্যোতিহীন স্থির।

দু'বছর কেটে গিয়েছে। পান্নালাল সম্পত্তিতে তার অংশ বড় ভাই হীরালালকে বিক্রি করে বিদেশে ফিরে গিয়েছে। চিনিদের অট্টালিকার সামনের রাস্তা দিয়ে রিকশা চালিয়ে আসছিল মিলন। দেখে, বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হীরালাল চিনি। পিছনে তার বিধবা মা। হীরালাল হাতছানি দিয়ে মিলনকে ডাকে, "মাকে রাধানগর পৌঁছে দিতে হবে।"

রাধানগর উদয়পুর থেকে বিশ কিলোমিটার রাস্তা। মিলন জিজ্ঞেস করে, "রাধানগরে কোথায়?"

হীরা ঠিকানা বলে। মিলন চমকে ওঠে। ভাবটা লুকিয়ে বলে, "তা দেব। ভাড়ায় খাটব বলেই তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি।"

হীরা পিছনে তাকিয়ে বলে, "মা, এসো।"

সুধা রিকশায় উঠে বসে। তার বয়স এখন একষট্টি। মিলনকে বলে, "চল, বাবা।"

হীরালাল তাড়া দেয়, "যা, মিলন।"

মিলন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি যাবে না?"

"না। তুই মাকে ছেড়ে আয়।"

"না," গোঁজ হয়ে বলে মিলন, "আমাকে কেউ ধরলে, আমি কী বলব! এই ঝামেলায় আমি নেই।"

"কেউ ধরবে না, কোনও ঝামেলা নেই। ওখানে সব ব্যবস্থা করা আছে।"

মিলন পাল্টা তর্ক করে, " সঙ্গে যেতে তোমার অসুবিধা কিসের?"

"আমার অন্য কাজ আছে," হীরা পকেট থেকে পাঁচশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দেয়।

মিলনের অস্বস্তি বাড়ে। মোটা টাকা বড়মানুষে লোভ দেখাতে দিতেই পারে, গরিবের নিতে পারার সাহসও তো থাকা চাই। সে মাথা নেড়ে বলে, "না বাপু, আমার কেমন লাগছে।"

সুধা মুখ খোলে, "মিলন, তুই ভাবিস না। কেউ কিছু বললে আমি জবাব দেব। চল, আর দেরি করিস না।"

মিলন, হীরার হাত থেকে টাকা নিয়ে প্যাডেলে চাপ দেয়। ঘণ্টা দেড়েক লাগে গন্তব্যে পৌঁছোতে। রাধানগর বৃদ্ধাশ্রম। বছর পাঁচ হল এর পত্তন হয়েছে। কাঁটাতারে ঘেরা প্রায় দশ বিঘা জমির সামনের দিকে একতলা লম্বাটে বাড়ি। এলাকার কয়েক জন মানী মানুষ, উকিল বলরাম চৌধুরী, শেয়ারবাজারের দালাল পরাশর জানা, আরও পাঁচ জন মিলে আশ্রমটা চালান। সুধা রিকশা থেকে নেমে আশ্রমের গেটের দিকে এগোয়। মিলন জিজ্ঞেস করে, "মা, আমি যাব সঙ্গে?"

সুধা জবাব দেয়, "না, মিলন। সব বলা-কওয়া আছে। চিন্তা নেই।"

পরদিন সকালে উকিল বলরাম চৌধুরী এলেন সুধার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গেই এসেছেন শেয়ারবাজারের দালাল পরাশর জানা। দু'-চার কথার পর বলরাম ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করেন, "বউদি, এতে আপনার ব্যাঙ্কের পাসবই, চেকবই, আরও কিছু কাগজপত্র আছে ..."

"আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট!"

"হ্যাঁ, বউদি। শান্তিদা আমাকে বলে গিয়েছেন, তিনি নিজে আপনাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে

গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন।"

সুধা ক্ষণেক চিন্তা করে বলে, "তা, নিয়ে গিয়েছিল বটে, বহু বছর আগে। ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"আপনার অ্যাকাউন্টে নিয়মিত টাকা জমা পড়েছে," বলরাম জানান, "শান্তিদা জমা করেছেন।"

পরাশর জানা বলেন, "শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নয়, শান্তিদা আপনার হয়ে শেয়ার বাজারে ইনভেস্টমেন্ট চালু করে গিয়েছেন, আজ থেকে বিশ বছর আগে। ভেবে দেখুন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাগজে আপনাকে দিয়ে সইটই করিয়েছেন।"

"সে তো থেকে থেকে করিয়েছে অনেক, কী কারণে কখনও বলেনি। মানুষটা অমনই ছিল। সব কথা খুলে বলত না।"

"নিরুপায় হয়ে, বউদি," পরাশর বলেন, "শেয়ার বাজারে টাকা ভালই খেটেছে, বেড়েছেও। তার কিছু নিয়মিত জমা হয়েছে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।"

"তাঁর দূরদৃষ্টির কণামাত্রও আমার ছিল না," সুধা ধরা গলায় বলে, "কখনও ভাবিনি ..."

পরাশর বলেন, "আপনি কি শেয়ারের কাগজ ভাঙবেন? নাকি, চালিয়ে যাবেন?"

"কী ভাবে চালাব?"

"শান্তিদা চলে যাওয়ার পর গত দু'বছর যে ভাবে চলেছে সে ভাবেই। মার্কেট থেকে আয়ের খানিকটা আবার মার্কেটে ঢুকুক যেমন ঢুকছে, বাকিটা জমা পড়ুক আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।"

বছর দুই যায়। সুধা এখনও কর্মঠ। নিরন্তর কর্মহীনতায় সে হাঁপিয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে আশ্রমটার ব্যবস্থাপনা খারাপ নয়। তবু আরও অনেক কিছুই করা যায়। দশ বিঘা জমির বেশিটাই পতিত পড়ে আছে। সুধার মাথায় নানা পরিকল্পনা আসে। বলরাম চৌধুরী এবং পরাশর জানা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। সবাই বলে, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি। সুধা একদিন বলরামকে জিজ্ঞেস করে, "বৃদ্ধাশ্রমের মালিক তো আপনারাই?"

"কেন, বউদি?"

"চাইলে, আশ্রমটা আরও ভাল করে চালানো যায়। কিন্তু ..."

"তা হলে সে আপনাকেই করতে হবে, বউদি।"

সুধা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। বলরাম বোঝান, "আড়ালে থেকে শান্তিদাই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। উইল করে আমাদের ভার দিয়ে গিয়েছেন পরিচালনার। একটা ট্রাস্ট তৈরি করে দিয়েছেন, সঙ্গে গড়ে দিয়ে গিয়েছেন তার তহবিল। আমরা কয়েক জন ট্রাস্টের মেম্বার। আপনি ট্রাস্টের প্রধান। আপনার হয়ে কাজ চালানোর মোক্তারনামা আমাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া নেই। শান্তিদা আপনার নাম করে বলে গিয়েছেন, 'আগ বাড়িয়ে কিছু জানানোর দরকার নেই। ও যদি নিজে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে তখন বলিস। নইলে, তোরা যেমন পারবি, চালাবি।'"

সুধা শেয়ারবাজারের কিছু বিনিয়োগ ভাঙে। আবাসিকদের নিয়ে বৈঠক করে। তাদের কাছে নানা প্রস্তাব রাখে। শুরুতে সবই সন্দেহ এবং আশঙ্কার চোখেই দেখে বেশির ভাগ আবাসিক। মাত্র কয়েকজন সুধার পাশে দাঁড়ায়। তাদের নিয়েই সে কাজ শুরু করে। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকও নিয়োগ করা হয়। শুরু হয় চাষাবাদ। মহিলা আবাসিকরা অনেকেই ঘরোয়া শিল্পকর্মে নিপুণ। সুধা তাদের উৎসাহ দেয় সেই সব হাতের কাজ শুরু করতে। শিল্পকর্মগুলি বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়। লভ্যাংশের বারো আনা আবাসিক শিল্পীদের দিয়ে, চার আনা আশ্রমের খাতায় জমা হয়। কাজের অগ্রগতি এবং সুফল দেখে ক্রমে বাকি আবাসিকরাও এগিয়ে আসে। সুধা আশ্রমের অছি পরিষদ ও পরিচালন সমিতির সদস্যপদে আবাসিকদের মনোনীত করে, আর দু'টিতেই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। উকিল বলরামবাবু এক দিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন, "বউদি, ট্রাস্ট এবং ম্যানেজমেন্টে বোর্ডারদের প্রভাব বাড়ছে। শান্তিদা আমাকে সাবধান করে গিয়েছেন, আশ্রমের ম্যানেজমেন্ট যেন ভুল লোকের হাতে না যায়।"

সুধাকে ভাবুক দেখায়, "বলরামবাবু, উনি বলতেন জীবন হল কলের গাড়ি। চিরদিন আমি, আপনি কেউই থাকব না। তখন আশ্রম চলবে কী ভাবে! ভিতর থেকে যোগ্য মানুষজন নিয়মিত তুলে আনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।"

আবাসিকদের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানের নাম 'রাধানগর বৃদ্ধাশ্রম' থেকে বদলে করা হল 'শান্তিসুধা সমবায়'। নামডাক বাড়ার সঙ্গেই বাড়তে থাকে আবাসিকদের সংখ্যা। সুধা সমবায়ের বাড়ির নকশা আনায়। "বলরামবাবু," নকশা দেখতে দেখতে সুধা বলে, "এ তো দেখছি, তিন তলার পারমিশন নেওয়া আছে।"

"হ্যাঁ, ভিতও করা আছে সে ভাবেই।"

"তা হলে, আরও দুটো তলা তুলতে হবে। দরকারে তৈরি করতে হবে নতুন বাড়ি। নইলে রোজ যে-সংখ্যায় অ্যাপ্লিকেশন আসছে, এত মানুষকে জায়গা দেওয়া যাবে না।"

বলরাম অবাক হয়ে বলেন, "কী করতে চাইছেন, বউদি?"

"সম্মানজনক বাসস্থান গড়তে চাইছি। বয়স হয়ে গেলে মানুষকে গরু-ছাগল ভাবা সমাজের অভ্যাস, বৃদ্ধাশ্রম যেন খোঁয়াড়। এটা বদলানো দরকার। আজ বুঝতে পারি, আমার স্বামী আমার কাছে এটাই চেয়েছিলেন।"

বলরাম করজোড়ে বলেন, "আমার ছেলে এ দেশে থাকলে কী হত বলতে পারি না। সে থাকে বিদেশে। জানি না, বুড়ো-বুড়ি কত দিন নিজেদের দেখভাল করতে পারব। বউদি, আমরাও হয়তো এক দিন আসব, ঠাঁই যেন পাই।"

এখানে বাসা বাঁধার পর কেটে গিয়েছে একত্রিশ বছর। বিরানব্বই বছর বয়সে সুধার শরীর কিছুটা নুয়ে পড়লেও, সম্পূর্ণ অশক্ত নয় এখনও। এক দিন আসে হীরালাল। মায়ের সঙ্গে দেখা করে। বয়স তার তিয়াত্তর। জানায়, বৃদ্ধাশ্রমে সস্ত্রীক আশ্রয় চায়।

"বৃদ্ধাশ্রম নয়, সমবায়," সুধা বোঝায়, "বাবা, তোকে আর-পাঁচজনের মতোই অ্যাপ্লিকেশন জমা করতে হবে।"

"সঙ্গেই এনেছি মা," হীরালাল ঝোলা থেকে আবেদনপত্র বের করে, "ছেলে সব নিয়ে নিলেও, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আমার এখনও আছে। সব বৃদ্ধাশ্রমে দান করব।"

"বৃদ্ধাশ্রম নয়, সমবায়," সুধা বলে, "অ্যাপ্লিকেশন অফিসে জমা করে যা। আগামী রবিবার জমা পড়া সব অ্যাপ্লিকেশন সমবায়ের ট্রাস্টি বোর্ড খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে।"

"মা!" হীরালাল সবিস্ময় বলে, "এই বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আমার বাবা। তুমি ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন!"

"বৃদ্ধাশ্রম নয়। সমবায়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।"

"শাস্তি দিচ্ছ মা!" হীরালাল ধরা গলায় বলে, "এক দিন যে-ভুল করেছি তার শোধ তুলছ!"

সুধা কেঁপে ওঠে। "কলের গাড়ি! কাকে যে কখন টিকিট কাটতে হয়!" কপালের দু'পাশ টিপে ধরে বলে, "অ্যাপ্লিকেশন অফিসে জমা করে যা, হীরা।"

অছি পরিষদের বৈঠক বসে। হীরালাল চিনির আবেদন কেন্দ্র করে গোল বাধে। এক দল বলে, এ হীরালাল চিনির কারবারি কৌশল। শান্তিসুধা সমবায়কে ও পারিবারিক সম্পত্তি ভেবে নিয়েছে, প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হাতাতেই এই সব নাটক করছে। সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে। অন্য দল বলে, না, উদয়পুরে সবাই জানে হীরালাল চিনির ছেলে মা-বাপকে দেখে না। একই বাড়িতে থেকেও খেতে পর্যন্ত দেয় না। প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে হীরার দালাল বলে। দ্বিতীয় দল প্রথম দলকে নির্দয় বাস্তুঘুঘু বলে গালি দেয়। এ সব ক্ষেত্রে অছি পরিষদের প্রধান তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। পরিস্থিতি সে দিকেই এগোয়। সুধা আঁচলে চোখ মোছে, "গাড়ির সময় কি এখনও হয়নি? আর যে আমি পারি না!"

অঙ্কন: প্রসেনজিৎ নাথ

ছোটগল্প ৮

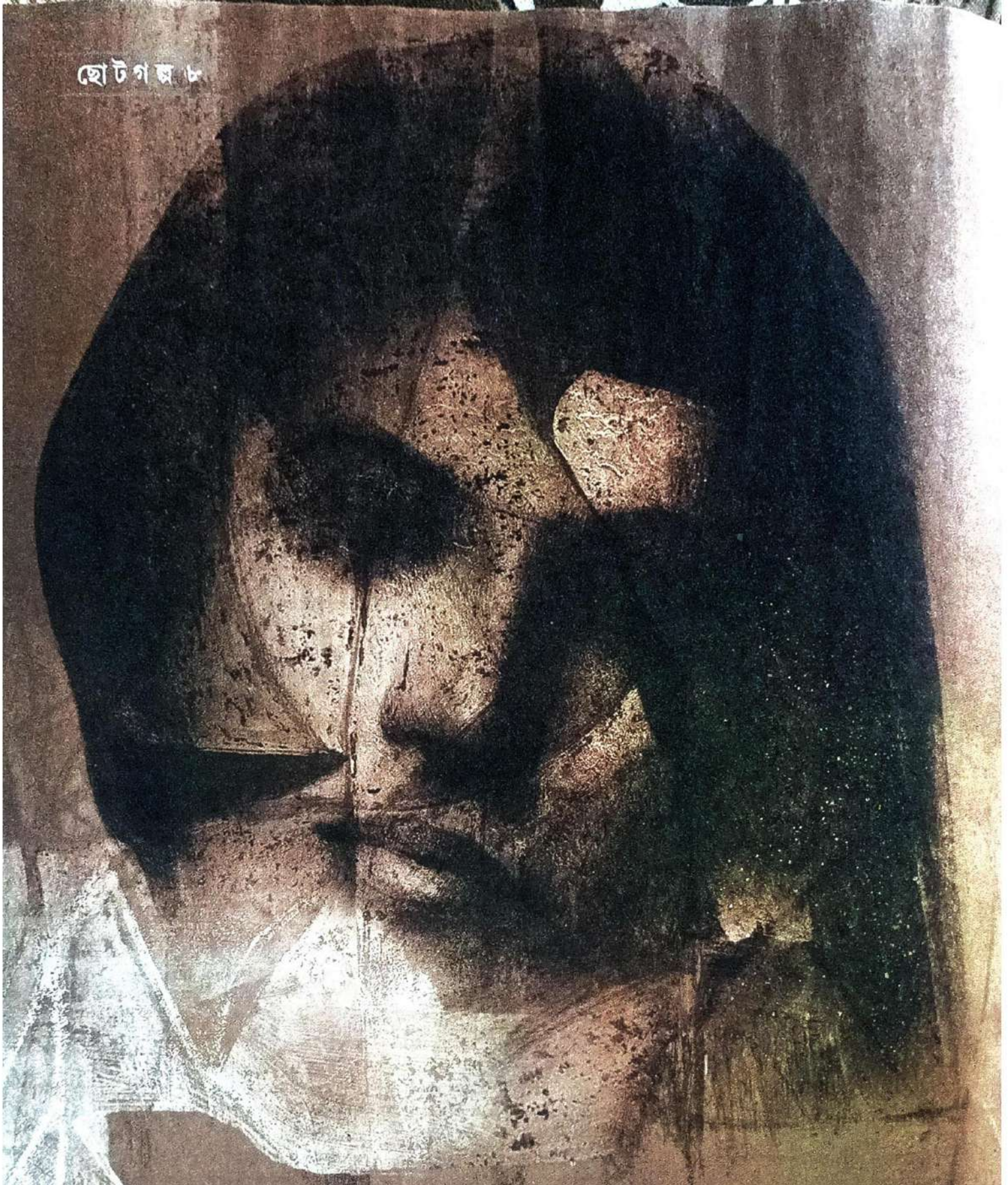

সুপর্ণা এবং সুপর্ণা

প্রচেত গুপ্ত

টিভিতে খবর শুরু হয়েছে, "শুভ সন্ধ্যা, আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুপর্ণা। এবার আপনারা দেখবেন চ্যানেল সংবাদ-এর বিশেষ বুলেটিন— 'বাংলার ভিতর বাংলা'। প্রথমে হেডলাইনস—"আজ সকালে বেলঘরিয়া হাইওয়েতে এক পথ দুর্ঘটনায়..."

বাংলার ভিতর বাংলা বারো মিনিটের খবর। খবর শেষ করে সঞ্চালকের ফ্লোর ছাড়তে এক মিনিটেরও কম সময় লাগার কথা। প্রতি দিন তাই লাগে। আজ বেশি লেগে গেল। কারণ, সুপর্ণার শাড়ির আঁচলের ভিতর রাখা লেপল সুতোর সঙ্গে জড়িয়েছে। জট না-ছাড়ালে এই লুকোনো মাইক্রোফোন বের করা যাচ্ছিল না। শাড়ি পরার এই ঝামেলা। না পরেও উপায় নেই, চ্যানেল হেড বলে দিয়েছেন, সন্ধের পর মেয়েদের শাড়ি পরেই ক্যামেরার সামনে বসতে হবে।

মেকআপ রুমের ভিতর লাগোয়া এক টুকরো চেঞ্জ-রুম-এ ঢুকে শাড়ি বদলে জিন্‌স কুর্তি পড়ল সুপর্ণা। অনেকটা পথ যেতে হবে। ন'টা তিনের গাড়িটা ধরতে পারলে তাও খানিকটা আগে বাড়ি ঢোকা যায়, নইলে পৌঁছোতে রাত। ট্রেনে গোলমাল হলে আরও দেরি। মা না-খেয়ে বসে থাকে। বাবা—সন্তোষ পাল— এক সময় রাগারাগি শুরু করবে। তার পর শুরু হবে মা-বাবার তুমুল ঝগড়া।

বাবা বলবে, "মেয়ের এই চাকরি করার দরকার কী?"

মা বলবে, "আজকাল চাকরির আবার ছেলেমেয়ে কী? সবাই সব করে।"

বাবা গলা তুলে বলবে, "কে কী করে আমার জানার দরকার নেই। আমাদের ফ্যামিলির মেয়ে মাঝরাতে মুখে রং মেখে বাড়ি ফিরছে, এটা চলবে না।"

মা বলবে, "কী বলছ বাজে কথা! সুপু যে কাজ করে সেটা কত সম্মানের তুমি জানো না? টিভিতে খবর পড়া, অ্যাঙ্করিং করা কি চাট্টিখানি কথা? কত লোক তাকে চেনে, সমীহ করে। লেখাপড়া না জানলে এই কাজ কেউ পারে? ক্যামেরার সামনে বসে গোটা দুনিয়ার কথা বলে, নানা ধরনের অনুষ্ঠান সামলায়, বড় বড় লোকের ইন্টারভিউ নেয়। মুখে রং মাখলেই এ সব করা যায় না। পেটে বিদ্যা থাকতে হয়।"

বাবা গরগর করতে করতে বলবে, "তোমার মেয়ের যখন এতই বিদ্যেবুদ্ধি, সে অন্য কাজ নিচ্ছে না কেন? সভ্যভব্য সময়ে বাড়ি ফিরত।"

"সুপু কাজটা ভালবাসে। সেই ছোটবেলা থেকে গান, আবৃত্তি শিখেছে। তা ছাড়া... তা ছাড়া চাকরির বাজার তুমি জানোও না? লেখাপড়া শিখলেই-বা কাজ কোথায়? এমএ, বিএ পাশ করে রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে।"

মায়ের এ সব কথায় সন্তোষ পালের রাগ কমবে না। কিছু লোক আছে, যারা রাগ কমাতে পারে না।

"মা-মেয়েতে মিলে যা ইচ্ছে তাই করছ। এখনও সময় আছে। সুপুকে ওই বিশ্রী কাজ ছেড়ে দিতে বলো। বিয়ের জন্য ছেলে খোঁজো। এর পর তা-ও পাবে না। যে-মেয়ে রাতবিরেতে পাউডার মেখে বাড়ি ফেরে, তার জন্য কোনও পাত্র জুটবে না।"

আট মাস হল সন্তোষ পাল চুপ করেছে। নিজে থেকে করেনি, সেরিব্রাল অ্যাটাক করিয়েছে। শরীরের বাঁ দিকটায় সাড় নেই। শুয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই। জিভ-জড়ানো গলায় কথা বলে।

বাবার অসুস্থ হওয়ার ক'টা দিন যেতে না-যেতে সুপর্ণার জীবনে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। কিংশুক নামে এক যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং সেই আলাপ অতি দ্রুত প্রেমের চেহারা নেয়। তাদের আলাপের গল্পটা ইন্টারেস্টিং। সে কথায় পরে আসা যাবে, আগে সুপর্ণার বাড়ির কথা আর একটু বলে নেওয়া যাক।

অসুস্থ হওয়ার পর বাবাকে মা-ই দেখাশোনা করত। কিন্তু টানা পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রেশার কমে যায়। এক দিন তো মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল। এর পরেই বাবার জন্য আয়া রাখে সুপর্ণা। মা আপত্তি করল।

"থাক, আমি পারব।"

"পারবে না মা। ক'দিনেই শরীরের এই অবস্থা!"

"সে আমি সামলে নেব। ওষুধেরই কত খরচ... সবটাই তো তোকে দেখতে হচ্ছে। প্রাইভেট ফার্ম থেকে রিটায়ার করে তোর বাবা ক'টা টাকা পেয়েছে? চিকিৎসায় জলের মতো সঞ্চয়ের টাকা চলে যাচ্ছে। তোর ওপর সব চাপ। এর ওপর আয়া রাখতে গেলে চাপ বাড়বে।"

সুপর্ণা এ সব শোনেনি। জোর করে আয়া রাখল। সে মন দিয়ে কাজ করতে চায়। খবর পড়া কঠিন কাজ। লাইভে একটু ভুল করে ফেললে সংশোধনের উপায় থাকে না। মেয়ের কাজের ব্যাপারে সন্তোষ পাল নিজের মত বদল করেছে। নিজের স্বার্থেই করেছে। যে-মানুষটা সুপর্ণার কাজ নিয়ে বিশ্রী কথা বলত, অপমান করত, সে এখন বেলা বাড়লে জড়ানো জিভে স্ত্রীকে ডাকে।

"সুপু অফিসে গেছে? হ্যাঁ গো, গেছে তো? অফিসে ঠিক সময় যাওয়া দরকার...ঠিক সময়..."

অফিস থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল সুপর্ণা, বাস পেয়ে গেলে ন'টা তিন ধরা যাবে। গত আট মাস অ্যাপ-বাইক নেওয়ার মতো অবস্থা নেই, প্রতিটা টাকা ভেবে খরচ করতে হচ্ছে। এই ভয়াবহ টানাটানি কত দিন চলবে ঠিক নেই। বেতন যেটুকু বেড়েছে, তা খরচের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। টিভির পর্দায় পরিপাটি হয়ে যখন দেখা দেয়, মুখে হাসি রেখে 'শুভ সন্ধ্যা' বলে, দুর্ঘটনার খবরে কপালে ভাঁজ ফেলে, মৃত্যুর খবরে নিষ্পলক তাকিয়ে গলা ভারী করে আনে, হালকা খবরে ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি যখন-তখন— কে বলবে মেয়েটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে? ফ্রিলান্স কাজ করার কথা ভেবেছিল। নানা অনুষ্ঠানে এখন পেশাদার সঞ্চালক লাগে। সেই কাজ। কিন্তু সবই তো চলে মাঝ রাত ছাড়িয়ে। রাত পার করেও। এখন বাড়িতে অত দেরিতে ফেরা অসম্ভব। তাই চাকরিটাই একমাত্র সম্বল। আজ সকালেই আয়ুষীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। আয়ুষী 'পিসিআর'-এ বসে। সে টাইপ করে। নিউজ় ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনও জরুরি খবর এলে, প্রোডিউসারের কথামতো টাইপ করে লিখে ফেলে। সেটাই পর্দায় 'ব্রেকিং নিউজ়' হিসেবে বড় করে দেখানো হয়। আয়ুষীর মাইনে বেশি নয়, কিন্তু দায়িত্ব বেশি। বরের ব্যাগের দোকান চলে না। এদিকে গাদাখানেক টাকা ঢেলে ফেলেছে।

সুপর্ণা বলল, "তুই আর-একটা কিছু কর না আয়ুষী। পার্ট টাইম কিছু।"

আয়ুষী বলল, "চেষ্টা করছি। কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশনায় কাজ পেয়েওছিলাম। সময়টা ম্যাচ করছে না। ভয় করে অফিসে ঠিক সময় যদি আসতে না পারি।"

সুপর্ণা বলল, "খবরদার! ও কাজ একদম করবি না। চাকরিতে যেন কোনও সমস্যা না হয়।"

আয়ুষী বলল, "জানি তো। বাজার ভাল নয়।"

স্টেশনে ঢোকার সিঁড়ির ঠিক মুখটায় দাঁড়িয়ে কিংশুক সিগারেট টানছে। এখানে আসার কথা ছিল না তার, জানায়ওনি। না-বলে হুট করে দেখা করতে আসা, কিংশুকের সারপ্রাইজ়। এক সময় চমকাত, এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল সুপর্ণা, বাস পেয়ে গেলে ন'টা তিন ধরা যাবে। গত আট মাস অ্যাপ-বাইক নেওয়ার মতো অবস্থা নেই, প্রতিটা টাকা ভেবে খরচ করতে হচ্ছে। এই ভয়াবহ টানাটানি কত দিন চলবে ঠিক নেই।

সাত মাসের আলাপ খুব কম সময়, কিন্তু ছুটছে জোরে, ঝড়ের বেগে খবর পড়ার মতো। আলাপটা হয়েছিল অদ্ভুত ভাবে।

সেটা ছিল কালবৈশাখীর দিন। দুপুর থেকে আকাশ কালো করে, তেড়ে বৃষ্টি নামল বিকেলে। সেই সঙ্গে ঝড়। লন্ডভন্ড অবস্থা। গাছ পড়ে, দোকানের চালা উড়ে, রাস্তায় জল জমে, ট্রেনের তার পড়ে একাকার কাণ্ড। সুপর্ণা অফিস থেকে বেরিয়ে চার পদ্ধতিতে স্টেশনে পৌঁছোল। কোয়ার্টার পথ সহকর্মীর গাড়িতে লিফট, কোয়ার্টার পথ গা ঘিনঘিনে জমা জলে হেঁটে, কোয়ার্টার পথ অটোতে এবং বাকি কোয়ার্টার পথ বাসে। বাড়ি ফেরার ট্রেন ছাড়ল দেড় ঘণ্টা লেট করে। কামরার ভিড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে, নিজের স্টেশনে নেমে সুপর্ণা জানতে পারল, ব্যাগে তার মোবাইল ফোনটি নেই। মোবাইল ফোন খোয়া মানে বিরাট বিপদ। নম্বর লক করা থেকে শুরু করে থানা-পুলিশ। তার পর ফোন কেনা। কম করে বারো-পনেরো হাজার টাকার ধাক্কা। অত টাকা কোথায়? স্টেশন থেকে পনেরো টাকার রিকশা নিয়ে বাড়ি ফেরাই বন্ধ করে দিয়েছে কত দিন।

বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ির গেট খুলল সুপর্ণা। সদর দরজা খুলল মা।

"ইস এ কী চেহারা! ভিজেছিস?"

সুপর্ণা ক্লান্ত গলায় বলল, "বাবা কেমন?"

ঘরে ঢুকে জুতো খোলার সময় মা বলল, "ফোন হারিয়েছিস?"

সুপর্ণা চমকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জানলে কী করে?"

"আমার মোবাইলে এক জন ফোন করেছিল, পুরুষের গলা।"

সুপর্ণা বিস্ফারিত চোখে বলল, "সে কী! কে?"

"বলল, অটোর সিটের নীচে ফোনটা ছিল। স্ক্রিনে পর পর কতগুলো মিসড কলের নম্বর দেখে আমাকে ফোন করেছে। তোর ফোনের লক তো খোলা যায়নি, নিজের ফোন থেকেই করেছে। ঝড়বৃষ্টির জন্য আমি তোকে বার বার ফোন করছিলাম, নিশ্চয়ই সেই নম্বর দেখেছে।"

সুপর্ণা হুড়োহুড়ি করে বলল, "তাড়াতাড়ি তোমার ফোনটা দাও মা। লোকটার নম্বর কী? লিখে রেখেছ? বেটা টাকা না চায়।"

লোক নয়, ছেলে। মেরেকেটে তিরিশ-একত্রিশ বছর বয়স। না-আঁচড়ানো চুল-দাড়িতে এলোমেলো চেহারা, তবে বাকিটা পরিপাটি, দামি। জিনসের ওপর কালো শার্ট, হালকা নীল ফ্রেমের চশমা পরা যুবকটিকে দেখতে যেমন আকর্ষক, সেরকম কথাবার্তাও। গম্ভীর হাবভাবের পিছনে রসবোধও রয়েছে। যদিও আলাপের প্রথম পর্যায়ে সুপর্ণার একেবারে পছন্দ হয়নি। অতি পাকা মনে হয়েছিল। ঠিক সকাল এগারোটা বেজে পনেরো মিনিটে অফিসের নীচে এসে সে সুপর্ণার হাতে মোবাইলটি তুলে দিল।

"আমি কিংশুক, কিংশুক সেনগুপ্ত। ফোনটা চেক করে নিন।"

সুপর্ণা বলল, "চেক করার কী আছে? ফোন তো লকড।"

কিংশুক বলল, "আপনার ইনকামিং বড্ড বিরক্ত করেছে।"

সুপর্ণার রাগ হল। এটা বলার কী আছে? এই বিরক্ত তো সে করেনি। ছেলেটিকে এক রকম তাড়ানোর ঢঙেই বলল, "অনেক ধন্যবাদ।"

কিংশুক, সুপর্ণার চোখে চোখ রেখে নির্লিপ্ত ভাবে বলল, "ধন্যবাদের একটু বাকি আছে। এখানে আসতে পঁচিশ টাকা অটো ভাড়া লেগেছে, যদি দিয়ে দেন ভাল হয়। অফিসে ফিরতেও পঁচিশ লাগবে, সেটা আমিই দেব।"

আচ্ছা পাজি ছেলে তো, গাড়ি ভাড়া চাইছে! নির্লজ্জ, তবে পঁচিশ টাকার ওপর দিয়ে যাচ্ছে এটা রক্ষে। সুপর্ণা হাতের ব্যাগ খুলতে খুলতে বলল, "আর কিছু?"

কিংশুক একই রকম নির্লিপ্ত মুখে বলল, "না, আর কিছু নয়।"

হারিয়ে যাওয়া ফোন ফেরত পাওয়ায় সুপর্ণার মেজাজ সে দিন ভাল থাকার কথা, তাই ছিলও, কিন্তু পরে বিগড়োতে লাগল। দুটো কারণ। চারটের বুলেটিন পড়তে যাওয়ার আগে রোজকার মতোই মাকে ফোন করে বাবার রিপোর্ট জানতে চায় সুপর্ণা। মা জানায়, সন্তোষ পাল নতুন ফ্যাকড়া শুরু করেছে। খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করেছে। একটু যেন বেশি ভায়োলেন্ট। আর দ্বিতীয় কারণ, বুলেটিনে গোলমাল হল। বলছিল, রাজনীতির মারপিটের খবর, মাঝখানে টেলিপ্রমটারে ভেসে উঠল কোন এক গ্রামে দুই ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতির কথা। এক লাইন পড়েও ফেলেছিল সুপর্ণা। কনসোল থেকে টক ব্যাকে চিৎকার করে ওঠে প্রোডিউসর।

"ওরে থামা, থামা!"

ভুলটা টেলিপ্রমটার অপারেটর বিশ্বজিতের তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে 'গ্রাম বাংলার সুখ দুঃখ' বুলেটিনের খবরের ক'টা লাইন পাঠিয়ে ফেলেছে। এই ভুলের জল গড়াবে।

সব মিলিয়ে মনটা তেতো হয়ে গেল সুপর্ণার। এর মাঝে ফোন বাজলে বিরক্ত গলায় সুপর্ণা বলল, "কে বলছেন?"

"আমি কিংশুক সেনগুপ্ত।"

বুঝতে না পেরে সুপর্ণা আরও বিরক্ত গলায় বলেছিল, "সেটা কে?"

ও-পাশ থেকে পুরুষকণ্ঠ বলেছিল, "সেটা একটা যুবক ম্যাডাম। সেটা একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়র। সেটা কাল অটোতে আপনার ফেলে যাওয়া মোবাইল ফোন খুঁজে পায় এবং সেটা আজ সকালে আপনার অফিসে গিয়ে ফেরত দিয়ে এসেছে। আমি সেই সেটা, আপনাকে ফোন করেছি।"

সুপর্ণা নিজেকে সামলে বলেছিল, "ওহ্ আপনি! আবার কী চান?"

কিংশুক বলল, "আপনার দেওয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা ছেঁড়া। অল্প ছেঁড়া নয়, হাফাহাফি ছেঁড়া। তার পর সেলোটেপ দিয়ে জোড়া হয়েছে। মনে হচ্ছে বড় কোনও আর্টিস্ট এই কাজ করেছে।"

আবার বেশি কথা। সুপর্ণা ফোঁস করে উঠে বলল, "এসে টাকাটা বদলে নেবেন। যদি বলেন গুগল পে তে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কিংশুক বলল, "টাকা ফেরতের দরকার নেই ম্যাডাম, আমি ওই আর্টিস্টের নামটা জানতে চাইছিলাম। এত বড় শিল্পীর সঙ্গে দেখা করা উচিত। অনলাইন ট্রানজ়াকশন যখন বাড়বে, এরা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

সুপর্ণা কড়া গলায় বলল, "আপনি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না কি? ফোন কুড়িয়ে পেয়েছেন বলে আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশার অধিকারও অর্জন করেছেন নাকি?"

ও-পাশ থেকে কিংশুক সামান্য হেসে বলল, "আপনার সঙ্গে তামাশা করার জন্য ফোন করিনি, সাবধান করার জন্য করেছি। ওই পঞ্চাশ টাকার নোটটা শুধু ছেঁড়া নয়, জালও। এরকম টাকা যদি আরও আপনার কাছে থেকে যায়, বিপদে পড়তে পারেন। অনেক সময় জাল নোটের কারবারিরা এক-এক জনকে তিন-চারটে নোট চালিয়ে দেয়। আমার পরিচিত এক জনকে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। খবর পড়তে পড়তে নিজেই খবর হয়ে যাবেন না। আচ্ছা, নমস্কার।"

মিথ্যে ভয় দেখানো নয়, সুপর্ণার ব্যাগ থেকে আরও দুটো জাল একশো টাকার নোট বেরোল। সহকর্মীরাই টাকার পিছনে আলো জ্বালিয়ে ধরে ফেলল। নিশ্চয়ই কেউ গছিয়েছে। সুপর্ণার মুখ

সেটা ছিল কালবৈশাখীর দিন। দুপুর থেকে আকাশ কালো করে, তেড়ে বৃষ্টি নামল বিকেলে। সেই সঙ্গে ঝড়। লন্ডভন্ড অবস্থা। গাছ পড়ে, দোকানের চালা উড়ে, রাস্তায় জল জমে, ট্রেনের তার পড়ে একাকার কাণ্ড।

শুকিয়ে আমশি। ইস, বড় বিপদ হতে পারত। এক জনের কাছে এতগুলো জাল নোট!

সে দিন কিংশুককে ধন্যবাদ জানানোর জন্য সাতবার ফোন করে নো রিপ্লাই শুনতে হয়েছিল সুপর্ণাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে রাতে মেসেজ করল।

"আপনি কি আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন? কাল বিকেল পাঁচটায় আপনার জন্য অফিসের সামনে অপেক্ষা করব।"

কিংশুক পর দিন বিকেলে আসেনি। তার পরের দিনও নয়। তিন দিন পর মেসেজ আসে।

"চা নয়, কাল কফি খেতে যাচ্ছি।"

এর পরে দু'জনের 'চা-কফির ফুরফুরে জীবন' হুড়মুড়িয়ে গড়াতে থাকে। সুপর্ণার অফিসের সামনের ঝুপড়ি চায়ের দোকান থেকে গড়িয়ে যায় কিংশুকের অফিসের পাশের ক্যাফেতে, রেস্তরাঁয়, ফুরফুরে জীবন ছোটে বাবুঘাটে, অ্যাকাডেমিতে, নন্দনে। তারা হাঁটে শহরের এলোমেলো ফুটপাতে, পৌঁছোয় বাড়ি ফেরার স্টেশনে, সওয়ারি হয় মোটরবাইকে, কখনও বজবজের গেস্ট হাউসে নদীকে সাক্ষী রেখে চুমু খায়, কখনও সুপর্ণার কলেজের বান্ধবী বৃতির ফ্ল্যাটে নগ্ন হয়ে মেতে ওঠে আদরে। সবটাই ঘটতে থাকে বড় দ্রুত। এই অল্প সময়েই কিংশুকের চাকরিতে উন্নতি হয়, সন্তোষ পালের কথা আরও জড়িয়ে যায়, মালার প্রেশার নামে, সুপর্ণা ওষুধের খরচ সামলাতে হাঁপিয়ে ওঠে। তবে যতই প্রেম হোক, সুপর্ণা মন দিয়ে কাজ করে চলে। অফিসে তাকে কেউ ফাঁকিবাজ বলতে পারে না। বাইরে একটু রাগী ভাব রাখলেও বসেরা, কলিগরা তাকে পছন্দই করে। সুন্দরী মেয়েদের বাইরে একটা রাগী ভাব রাখতে হয়। নইলে পুরুষরা গায়ে পড়ে।

সুপর্ণা তাদের চ্যানেলের সবচেয়ে আকর্ষক নিউজ় রিডার। দেখতে সুশ্রী তো বটেই, ক্যামেরার সামনে বসলে এক ধরনের অ্যাপিলও তৈরি হয়। টিআরপি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, সুপর্ণা স্ক্রিনে থাকলে নিউজ় থেকে দর্শক সরে যাওয়ার সংখ্যা কমে। পরশুই অদ্রিজা এই নিয়ে তাকে বলেছে।

"তুই এবার মাইনে বাড়িয়ে নে সুপর্ণা। তোর রিপোর্ট তো দারুণ! হেডকে বল।"

সুপর্ণা বলল, "বলতে ভয় করে, যদি রেগে যায়?"

অদ্রিজা বলল, "সব ব্যাপারে সাহসী, অথচ চাকরি নিয়ে তুই এত সাবধানী কেন? কেউ রেগে গেলে বয়ে গেল, অফিস চেঞ্জ করবি।"

সুপর্ণা বলল, "তুই নিজে নিউজ় রিডার হয়ে এ কথা বলছিস কী করে? চাকরি বদলানো অত সহজ? বাজার জানিস তো। তা ছাড়া... তা ছাড়া তুই তো আমার বাড়ির অবস্থা শুনেছিস। কোনও ঝুঁকি নিতে পারব না। সংসারটা আমার ওপর ডিপেন্ড করে আছে।"

অদ্রিজা কথা ঘোরানোর জন্য হেসে বলল, "আপনার পাকা ছেলে কী বলছে? সেবার তো নদীর ধারের গেস্ট হাউসে নিয়ে গেল, এবার কি জঙ্গলের ধারে যেতে চায়?"

সুপর্ণা হেসে বলল, "মার খাবি।"

"বিয়ে কবে করছিস?"

সুপর্ণা বলল, "দূর!"

অদ্রিজা বলল, "কিংশুক চাইছে?"

সুপর্ণা একটু ভারী গলায় বলল, "কেরিয়ার নিয়ে খুব ভাবে।"

অদ্রিজা বলল, "এবার তুই সারপ্রাইজ় দে। দুটো রজনীগন্ধার মালা নিয়ে দুম করে ওর কাছে চলে যা। সারপ্রাইজ় বিয়ে করে ফেল।"

দু'জনেই হেসে উঠল। সুপর্ণা উঠে পড়ল। তার ক্রোমা শুট আছে। পুজোর জন্য প্রিভিউ। অনেকটা রিহার্সালের মতো। নিউজ় রিডারকে সবুজ পর্দার সামনে বসিয়ে দেখা হবে কোন রঙের পোশাক আর মেকআপ হলে, পিছনের পর্দায় ফেলা উৎসবের ছবির সঙ্গে তাকে মানাবে। স্টুডিয়োয় ঢোকার সময় ফ্লোর ম্যানেজার নীতীশ বলল, "তোমারটা আজ হবে না।"

সুপর্ণা ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন?"

নীতীশ গম্ভীর গলায় বলল, "জানি না। প্রোডিউসর বলল, এখন থাক।"

সুপর্ণা রেগে গিয়ে বলল, "থাক মানে! আমি এতগুলো শাড়ি নিয়ে এলাম... এগুলো ঘাড়ে করে বাড়ি নিয়ে যাব?"

নীতীশ বলল, "আমাকে বলছ কেন? ওদের জিজ্ঞেস করো।"

খোঁজখবর নিয়েও গতকাল কিছু জানতে পারেনি সুপর্ণা। মনটা কেমন একটা খচখচ করছে। গত দু'বছরই সে দুর্গাপুজোর প্যাকেজে মূল অ্যাঙ্কর হয়ে কাজ করেছে। খবর পড়েছে, আবার প্যান্ডেলে ঘুরে লাইভও করেছে। এবার কী হল? কোনও খারাপ রিপোর্ট গেল নাকি? চ্যানেল হেডের সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়? বৈশালী সেন ভাল স্বভাবের মহিলা। কর্মীদের সঙ্গে হেসে কথা বলেন আবার ব্যক্তিত্ব দিয়ে দূরে রাখেন। তিনি হেড হয়ে এসে চ্যানেলের খরচে রাশ টেনেছেন, ফলে মালিক তাঁর কথা শোনে। আগে দু'-একবার তাঁর ঘরে গিয়েছে সুপর্ণা। আবার যেতে অসুবিধে নেই। তবে নিজের কথা বলতে হবে ভেবে অস্বস্তি লাগে। হোক অস্বস্তি, বলতে তো হবে। সেই ফাঁকে যদি টাকাপয়সার সমস্যাটা শান্ত ভাবে বলা যায়। উনি রাজিও তো হতে পারেন। সুপর্ণা মনে মনে ঠিক করল, কালই সময় চাইবে।

একটা মজার ঘটনা ঘটল। বৈশালী সেনের সময় চাওয়ার আগেই সুপর্ণাকে সময় দিলেন তিনি। নিধি চ্যানেল হেডের সেক্রেটারি। দুপুরে জানাল, ম্যাডাম আগামিকাল সন্ধে সাতটার বুলেটিন হয়ে গেলে দেখা করতে চান।

স্টেশনে কিংশুককে দেখে সুপর্ণার বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। এটা ভাল লাগার ধক। সাত দিন পর দেখা কিনা। অফিসের ট্যুরে বাইরে ছিল কিংশুক। একটু বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই খাটনি হয়েছে খুব। সিগারেট ফেলে এগিয়ে এল সে।

"সুপর্ণা, জরুরি কথা ছিল।"

সুপর্ণা বলল, "ফোনে বললেই তো পারতে। কবে ফিরেছ?"

কিংশুক অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "আজ দুপুরে। ভেবেছিলাম, ফোনেই বলব, তার পর ভাবলাম থাক, মুখেই বলি। তা ছাড়া এখন দেখছি ফোনটা কাজ করছে না। অন করাই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ব্যাটারির গোলমাল।"

সুপর্ণা হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, "হাঁটতে হাঁটতে বলো। ট্রেন মিস করব।"

স্টেশনের একটা আলাদা আওয়াজ থাকে। গমগম করে। মনে হয় অনন্তকাল ধরে এই আওয়াজ হয়ে চলেছে।

"সুপর্ণা, আমি বাইরে চলে যাচ্ছি। অফিস অফার দিয়েছে, অ্যাকসেপ্ট করেছি। ইটস আ বিগ জাম্প।"

সুপর্ণা থমকে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল চোখে বলল, "কনগ্রাচুলেশনস। কোথায় যাচ্ছ?"

কিংশুক বলল, "জাপান। কিওটো শহরে।"

ঝাঁপিয়ে পড়ে কিংশুককে চুমু খেতে ইচ্ছে

চার দশকের কেতাবি সফর

করল সুপর্ণার। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ধরতে এসে শিয়ালদা স্টেশনে একজন জাপানগামী যুবককে চুমু খাওয়াটা কতটা ঠিক হবে ভেবে, সামলে নিল। শুধু হাত চেপে ধরে বলল, "খুব আনন্দের খবর... খুব... খুব। মুখ গোমড়া করে আছ কেন?"

কিংশুক আমতা আমতা করে বলল, "না, মানে... কাগজপত্রের ঝামেলা সামলে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে।"

"যাবেই তো।"

কিংশুক দাড়ি চুলকে বলল, "আসলে..."

সুপর্ণা হাত ছেড়ে দিয়ে হেসে বলল, "ও সব আসলে নকলে ছাড়ো। ফোন ঠিক হলেই কল করবে, এখন ট্রেনটা ধরি। মিস হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি। লাভ ইউ।"

আজ ট্রেনের ভিড়ে কোনও কষ্ট হল না সুপর্ণার। বরং আনন্দে কান্না পেল। কী যে জ্বালা, স্টেশনে চুমু খাওয়া যাবে না, ট্রেনে আনন্দে কাঁদা যাবে না, বিচ্ছিরি নিয়ম যত।

সন্তোষ পালের শরীর বেশি খারাপ। কেমন একটা নিস্তেজ ভাব। ওষুধও খেতে চাইছেন না। সুপর্ণা ডাক্তারবাবুকে ফোন করল। তিনি বললেন, "বুঝতেই তো পারছেন এই রকম আপস অ্যান্ড ডাউন চলবে। তাও কাল প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে দেখা করুন।"

বাবাকে সামলে স্নান-খাওয়া সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। এর মধ্যে আয়ুষীর ফোন।

"সুপর্ণাদি, বৈশালী ম্যাডাম তোমাকে কাল ডেকেছে?"

সুপর্ণা বলল, "তোকে কে বলল?"

"অফিসে কানাঘুষো শুনলাম।"

সুপর্ণা বলল, "কী কানাঘুষো?"

আয়ুষী বলল, "বলছে, অফিসে কিছু একটা হবে। বড় কিছু।"

সুপর্ণা হালকা চমকে ওঠে। বড় কিছু মানে কী? সে কোনও বড় দায়িত্ব পাবে? মাইনে বাড়বে? মুখে বলল, "ধুস কিচ্ছু হবে না। ঘুমোতে যা।"

সুপর্ণা তিন বার চেষ্টাতেও কিংশুকের ফোন পেল না। তার মানে এখনও ফোন সারানো হয়নি। রাতে স্বপ্ন দেখল বড় মজার। ক্যামেরার সামনে খবর পড়ছে। জাপানি মেয়েদের মতো একটা কিমানো পরে আছে। মাথায় চুড়োর মতো করে বাঁধা খোঁপায় কাগজের ফুল। কিংশুক কোথা থেকে এসে ঝাপাস করে একটা চুমু খেল। সে বলল, "এই কী করছ! দেখছ না লাইভ হচ্ছে।"

দুই

বৈশালী সেন কথা বললেন শান্ত গলায় এবং গুছিয়ে।

"সুপর্ণা, খরচ আমাদের একটু বেশি হয়েছে, তবে অনেক বেশি নয়। আসল লেগেছে টেকনোলজি। এই যে আমরা কাজটা করে ফেললাম, এর পর থেকে পুরোটাই সুবিধে। যারা অ্যাফর্ড করতে পারবে, তাদের সকলকে শেষ পর্যন্ত এতেই যেতে হবে, যেতেই হবে। টেকনোলজিতে এটা একটা... এটা একটা বিস্ফোরণ। আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স, বাংলায় যাকে বলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তা দিয়ে আমরা কী না করতে পারি! আমাদের এই বিজনেসেও ভীষণ হেল্পফুল হবে, অলরেডি শুরুও হয়েছে। এই যে আমরা অবিকল তোমার মতো আর- একজন সুপর্ণাকে তৈরি করে ফেললাম, যে তোমার চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি কাজ করতে পারবে, দিনরাত পারবে, হাসি মুখে পারবে— এটা আগে ভাবতে পারতাম? এর জন্য আমাদের লেগেছে দক্ষ কম্পিউটিং সিস্টেম, সফটওয়্যার আর... আর তোমার ডেটা। তোমার লুক, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি। এ সব তো আমাদের আছে। ব্যাপারটা আমরা গোপন রেখেছিলাম। গোটা কাজটা হয়েছে বাইরে থেকে। এই সুপর্ণাকে যখন তুমি টিভি স্ক্রিনে দেখবে, অবাক হয়ে যাবে। ওই যে তোমার মাঝে মাঝে হালকা ভুরু কোঁচকানোর ব্যাপারটা আছে না? ওরা সেটাও কম্পিউট করেছে। ওয়ান্ডারফুল।"

বৈশালী সেন দম নিতে সামান্য থামলে কাঁপা গলায় সুপর্ণা বলল, "আর আমার, আমার কী হবে?"

বৈশালী একটু হাসলেন। বললেন, "তোমাকে কেন তৈরি করেছি, তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছ সুপর্ণা। তুমি এক জন এক্সসেলেন্ট নিউজ় রিডার। তোমার স্ক্রিন অ্যাপিয়ারেন্স যেমন ব্রাইট তেমন সোবার, উইথ আ লিটল বিট অফ সেক্স অ্যাপিল। তোমাকে আমরা সব সময় চাই, হারাতে চাই না। তুমি যদি অন্য কোথাও চলে যাও সে চিন্তা আমরা করতাম, এখন আর চিন্তা রইল না। বানানো সুপর্ণার জন্য আমরা লাইসেন্সও নিয়েছি। নাউ ইউ আর ফ্রি।"

শরীরে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল সুপর্ণার। সে বিড়বিড় করে বলল, "ফ্রি মানে?"

বৈশালী সেন বললেন, "মানে, তোমার ছুটি। তুমি চাইলে অন্য কোথাও যোগ দিতে পারো। আমার মনে হয়, এবার তোমার অন্য ধরনের কাজের কথা ভাবা উচিত।"

সুপর্ণা ঘোরের মধ্যে থেকে বলল, "এখানে আমার কাজ থাকবে না?"

বৈশালী সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সরি, আমাদের তো দু'জন সুপর্ণার দরকার নেই। তা ছাড়া এই সুপর্ণা প্রাইসলেস। খরচ নেই। চিন্তা কোরো না, তুমি এ মাসের পুরো স্যালারিটাই পাবে। হোপ ফর দ্য বেস্ট। তোমার আগামী কর্মজীবন নিশ্চয়ই ভাল হবে।"

চ্যানেল হেডের ঘর থেকে বেরোনোর সময় খানিকটা মাথা টলে গেল যেন, দরজা ধরে নিজেকে সামলাল সুপর্ণা। মেকআপ রুমে আয়ুষী ছুটে এসে বলল, "কী হল সুপর্ণাদি?"

সুপর্ণা কষ্ট করে হেসে বলল, "কিছু নয়। একটা ছোট প্রোমোশন পেয়েছি। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রোমোশন।"

সুপর্ণা অফিস থেকে বেরিয়ে অনেক দিন পর ক্যাব ডাকল। শরীরটা কেমন করছে। এই সময় কিংশুকের ফোনটা ঠিক থাকার দরকার ছিল। ও কেন যোগাযোগ করছে না? কেন?

কিংশুক যোগাযোগ করল। ট্রেনে ওঠার সামান্য আগে ছোট একটা মেসেজ পাঠাল।

"সুপর্ণা, মুখে বলতে পারব না, তাই লিখছি। অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। কবে আসব জানি না। তোমাকে বেঁধে রেখে যেতে চাই না, সেটা উচিতও নয়। আমাদের হঠাৎ তৈরি হওয়া সম্পর্ক, হঠাৎ শেষ হওয়াই ভাল। যেটুকু পথ একসঙ্গে চললাম, সেটুকুই সঙ্গে থাক। ভাল থেকো।"

সুপর্ণার এক বার মনে হল, মোবাইল ফোনটা ট্রেনের জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। ফোন হারিয়ে যাকে পেয়েছিল, ফোন হারিয়ে তাকে হারানো যাক।

আজ এই গভীর রাতে যদি কেউ সুপর্ণাদের বাড়িতে আসত, দেখতে পেত, ছাদের নোনাধরা পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে দুই সুপর্ণা নিচু গলায় ফিসফিস করে গল্প করছে। দুই বন্ধু যেন।

'ইস, তোমার কী মজা সুপর্ণা! তুমি আমার মতোই, কিন্তু আমার মতো কষ্ট, অপমান তোমাকে পেতে হয় না।'

'কে বলতে পারে সুপর্ণা, এক দিন হয়তো তা-ও হবে। তুমি কেঁদো না। আমি কি তোমার হাতটা একটু ধরতে পারি?'

অঙ্কন: সৌমেন দাস

ঝাঁপিয়ে পড়ে কিংশুককে চুমু খেতে ইচ্ছে করল সুপর্ণার। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ধরতে এসে শিয়ালদা স্টেশনে একজন জাপানগামী যুবককে চুমু খাওয়াটা কতটা ঠিক হবে ভেবে, সামলে নিল।

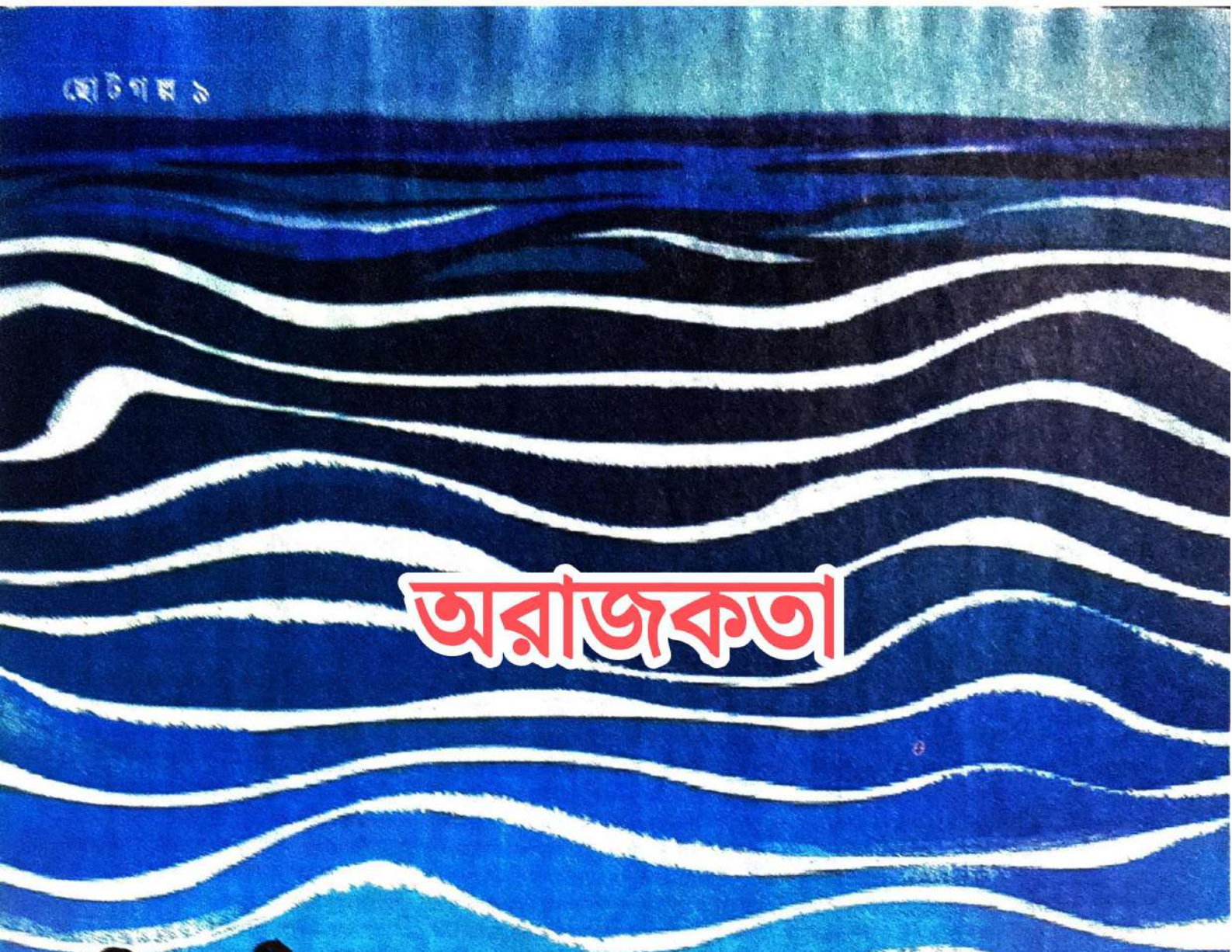

অরাজকতা

আশনাই

ঝিমলি নন্দী

বৃন্দা অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। সমুদ্র দেখেনি। তাদের গ্রাম থেকে সমুদ্র ঢের দূর। সমুদ্র সে কেবল টিভিতেই দেখেছে। বিন্তির ঠাকুরমা যখন নীলাচলে তীর্থ করে এল, বৃন্দার তখন দশ কি নয়। সে বিপুল আগ্রহে বিন্তিদের বাড়ি ছুটেছিল খালি পায়ে। ঠাকুরমা তাকে প্রসাদের চাঙারি খুলে একটা আস্ত জিবেগজা দিয়েছিল। রসে মুখ টইটম্বুর, তবু বৃন্দার মন ভরেনি। ঠাকরমা কথায় কথায় হাতজোড় করে কপালে ঠেকায় আর জগন্নাথের গল্প বলে, "জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তিন ভাইবোন মিলে রথে যেয়ে বসলে। স্বয়ং রাজা এসে সোনার ঝাঁটা দে পথ ঝাঁট দিলে! ত্যাকনকার ভাই-বোনে কত ভাব ছেল! ভগবান পয্যন্ত বোনকে মাথায় করে রাকত। একন আচে? হায় হায় ঘোর কলি!" ঠাকুরমা জগন্নাথের সংসারের সঙ্গে

নিজের সংসার মিশিয়ে ফেলে বিন্তির দিকে চেয়ে বলল, "তোর পিসিরা এলেই তো তোর মা-জেঠির মুক হাঁড়ি!"

বিন্তির জেঠিমা কথাটা শুনতে পেয়ে খড়খড় করে উঠল, "ও মা, তুমি ভগমানের কথা শোনাতে বসে খুকিদের কাছে মা-জেঠির নিন্দে করচ? বলি তিথ করে এলে যে! স্বভাব যায় না মলে! ঢেঁকি সগ্গে গিয়েও ধান ভানে!"

শুনে ঠাকুরমা থম মেরে বসে রইল। গল্প মাঝপথে থেমে যায় দেখে বিন্তি তাড়া দিল, "ও ঠাকুরমা, বলো না!"

বুড়ি একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল জগন্নাথের রথযাত্রা। তাঁর অভিষেক, রাজরাজেশ্বর বেশ, গুন্ডিচা মাসি...

বৃন্দা আকুল হয়ে বলে, "আর সমুদ্র?"

"আ মোলো যা ছুঁড়ি!" বুড়ি ভেংচে ওঠে, "সমুদ্দুর? টিভি-বায়োস্কোপে দেখিসনি ধিঙ্গিগুলো সেকেনে বেলেল্লাপনা করে! তিথ করতে যেয়ে সেকেনে ডুব দেয় কেউ? সে কি মা গঙ্গা যে, পান শেতল হবে, পুন্নি হবে! শুধু লোনা জল আর বালি। ওয়াক থুঃ। বাসন ধোয়া কাপড় কাচাও চলেনে। ওর চেয়ে আমাদের পুকুরঘাট ঢের ভাল," ঠাকুরমা আবার জগন্নাথের গল্পে ফিরে যায়, "নীলমাধব ছেল শবরদের দেবতা। একবার ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা স্বপ্ন পেলে..."

বৃন্দা হতাশ হয়ে উঠে আসে।

বৃন্দার যখন চোদ্দো, নাজনিনের দাদা সাদাত তাকে স্মার্টফোনে সমুদ্র দেখিয়েছিল। সাদাত আন্ধেরিতে সোনার দোকানে কাজ করত। সেখান থেকে হাঁটাপথে জুহু। জুহু বিচের ছবি সাদাত ভিডিয়ো করে এনেছিল। নীলচে সবুজ ফেনিল জলরাশি গর্জন করে এগিয়ে আসছে সমুদ্রতটের দিকে। শুধু ভেঙে পড়বে বলে। বৃন্দার বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করছিল। সে সাদাতের গা ঘেঁষে বসেছিল। সাদাত সমুদ্রে স্নান করেছে কত বার। সাদাতকে ছুঁলে কি সমুদ্রকে ছোঁয়া যায়? সাদাতের গা থেকে কি সমুদ্রের গন্ধ উঠে আসে! বৃন্দা বিভোর হয়ে গিয়েছিল জলজ গন্ধে। খেয়াল করেনি, কখন নাজনিন উঠে গেছে। বৃন্দা ভুলেই গিয়েছিল তার চোদ্দো আর সাদাতের সতেরো।

ভাইজানের কাছে এই ভিডিয়ো নাজনিন আগেও দেখেছে। তার সমুদ্রে তেমন আগ্রহ ছিল না। তা ছাড়া ভেতরের উঠোনে তখন আম্মুর সঙ্গে চাচির জোর কাজিয়া বেঁধেছে। নাজনিন ঝগড়া দেখতে ভালবাসে। কিন্তু মুশকিল হল, ঝগড়ার সময় সে একটাও জবাব দিতে পারে না। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসে। নাকের পাটা দ্রুত গতিতে সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হতে থাকে। অথচ মুখে কথা জোগায় না। তবুও ঝগড়া হলে সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। দরজা ধরে উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে অজান্তেই কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তার আম্মু জাহিরা তখন উদ্দাম! উন্মাদ! গালি দিতে দিতে বিপুল বেগে একবার এগোয় একবার পিছোয়। পিছোতে পিছোতে নাজনিনের পা মাড়িয়ে ফেলায় নাজনিন "উঁউঁউ" করা মাত্র সে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে "বেশ হয়েছে হাবা মেয়ে" বলতে বলতে তৎক্ষণাৎ ঘা কতক গমাগম বসিয়ে দিল। বৃন্দার চটকা ভাঙল জাহিরাচাচি আর নাজনিনের তীক্ষ্ণ চিৎকারে। বৃন্দা চমকে উঠে সাদাতের দিকে ভীরু চোখ তুলে চাইল। আর কী আশ্চর্য, সাদাতের সবজে নীল চোখের মণিতে উপচে উঠল সুনীল সাগর। বৃন্দা চোখ নামাতে ভুলে গেল। মানুষের চোখ বুঝি এমনও হয়! কাচের মতো উজ্জ্বল ঝকঝকে! সাদাতকে সে কোন শিশুকাল থেকে দেখছে। অথচ কখনও তো এমন করে দেখেনি। বৃন্দা কি কখনও দেখেছিল সাদাতের চোখের মণির রং কী? তার মনে পড়ল না। তবে নাজনিন ঘরে ঢোকার আগেই বৃন্দা শশব্যস্ত হয়ে পালাল। তার ভয় করল এই হঠাৎ পাওয়া সাগরছেঁচা মানিক যদি শব্দের ঝনঝনায় ভেঙে যায়, যদি নজর লাগে! সাদাত যেদিন নিচু হয়ে বৃন্দার কপালে আলগা চুমু খেয়েছিল, বালুকাবেলার মতো ভিজে উঠেছিল বৃন্দা। তার পর থেকে সমুদ্র আর সাদাত এক হয়ে গেল বৃন্দার কাছে। পরানপুকুরের ধারে বৈঁচিঝোপের আড়ালে যত বার সাদাত এসেছে, বৃন্দাও ঢেউ খেয়েছে। ঘুঘুডাকা দুপুরের সেই ভীষণ নিরিবিলিতে ভেজা মাটিতে পড়ে থাকত বৈঁচির টুকটুকে পাকা ফল। কাঠবিড়ালী ল্যাজের ওপর বসে দু'হাতে ধরে খেত। বাতাসে ভেসে আসত শুঁড়তোলা খিরিশফুল। প্রজাপতি, ফড়িংও আসত জোড়ায়।

সাদাতকে বৃন্দা কোন শিশুকাল থেকে দেখছে। সাদাত যেদিন নিচু হয়ে বৃন্দার কপালে আলগা চুমু খেয়েছিল, বালুকাবেলার মতো ভিজে উঠেছিল বৃন্দা। তার পর থেকে সমুদ্র আর সাদাত এক হয়ে গেল বৃন্দার কাছে।

হরিদেবপুর বা রসুলপুরে নদী নেই। দু'বিঘার পরানপুকুর দুটো গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে। তার এদিকে-ওদিকে আসশেওড়া, বাবলা, ঢোলকলমি, বৈঁচি ঘেঁটুফুলের ঝোপ-জঙ্গল। উত্তরদিকে চার-পাঁচটা তালগাছ জড়াজড়ি করে গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই বাঁশঝাড়। নিজের চারদিকে মোটা মোটা থামের মতো ঝুরি নামিয়ে পূর্বপাড়ে শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা ঝুপসি বটগাছ। তার একপাশে গাছের গুঁড়ি ফেলে ঘাট। সরু মাটির রাস্তাটা ঘাট থেকে উঠে এঁকেবেঁকে চলে গেছে হরিদেবপুরের হিন্দুপাড়ায়। পশ্চিমে রঙিন পতাকাগাঁথা পিরের মাজারের পাশে শানবাঁধানো ঘাট। মাজার শরিফের পিছন দিয়ে মোরাম রাস্তায় রসুলপুর। দু'দিকেই চাষাভুসো জেলে, মালো, ছোট ব্যবসায়ী গরিব মানুষ ধর্ম আঁকড়ে ছেলেপুলে নিয়ে ধারকর্জে কোনও রকমে জীবনটাকে ঠেলে পার করে। ধান রুইতে, ধান কাটতে এরা ওদের মাঠে দল বেঁধে মুনিশ খেটে আসে। পরানপুকুরে ঠিকাদারের হয়ে দু'দলই জাল টানে। জাভেদের কাঠকলে হরিদেবপুরের লোক করাত চালায়। এ দিকে পরাশর মণ্ডলের মুড়ির কারখানা ইদ্রিস, হাসানকে বাদ দিলে চলে না। রসুলপুরে মাদ্রাসা নেই। দুই গ্রামে একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। একটাই হাসপাতাল। দুই গ্রামের মধ্যে নল চালাতে জানে একমাত্র মনিরুল। কারও ঘরে চুরি হলেই তার ডাক পড়ে। সে কালীপদরও হতে পারে, আবার হার-উন কিংবা ইয়াসিনের। বিয়েশাদিতে নেমন্তন্নও চলে। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তবে ঝগড়ার সময় এ-সব কথা কারও মনে থাকে না।

ঘরের কোঁদল মিটলে এক দিন ফাতেমা নাজনিনকে নিয়ে পরানপুকুরে গেঁড়ি তুলতে এসেছিল। জল পাল্টে গেঁড়ি তোলা হলে নাজনিন দা-খানা কোমরে গুঁজে কাঠবিড়ালীর মতো তরতর করে বটগাছ বেয়ে ওপরে উঠে গেল ছাগলগুলোর জন্য পাতা পাড়তে। কাঁঠালপাতা সব সময় পাওয়া যায় না। সে ডাল কাটে আর নীচে ফাতেমাবিবি সেগুলো গোছ করে রাখে। বিশ-পঁচিশটা ছাগল তাদের দু'ঘরে। এক দিকটা খালি হলে নাজনিন আর-এক দিকে উঠল। আর তখনই সে দেখতে পেল বৈঁচিঝোপের আড়ালে মগ্ন দুটো মানুষ। নাজনিন থমকে গেল। নিষিদ্ধ কিছু দেখার আলাদা আনন্দ আছে। কাজ থামিয়ে চোখের ওপর হাত রেখে নাজনিন যত দূর সম্ভব দৃষ্টি প্রসারিত করল। ভাইয়ার শার্টটা সে কালই কেচেছে। ক্রমশ বৃন্দার ফুলছাপ গোলাপি কুর্তিটাও সে চিনতে পারল। নাজনিন তাজ্জব বনে গেল। তার পেটের ভেতর কেমন গুড়গুড় করতে লাগল। নীচে চাচি তাড়া মারছে। কোনও রকমে ঝপাঝপ কয়েকটা ডাল কেটে নাজনিন ঝুরি ধরে লাফিয়ে নেমে এল। কথাটা সে আম্মির আগে ফাতেমাচাচিকে বলতে চায়নি। কিন্তু তার অবস্থা দেখে ফাতেমা চেপে ধরল। "অমন হাঁ করে কী গিলছিলি বল!' ফাতেমা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ভয়ে তরাসে নাজনিনের কপালে ঘাম ফুটে উঠল। তাকে ফের

বোবায় ধরল। "ভা-আআ" বলতে বলতে তার দাঁতে দাঁত লেগে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে কোনও রকমে ভুলভাল কোনও একটা দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। ফাতেমাবিবির নজর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নাজনিনের ভর দেখে সে প্রথমে মনে করেছিল নাজনিন বুঝি জিন দেখেছে। বলা যায় না ভরদুপুরবেলা! বটগাছের কাছেই শিবমন্দির। শিব নাকি ভূতপ্রেতের দেবতা! ফাতেমা খুব ধার্মিক। সে জানে দেবতারা যখন-তখন খামোকা রেগে ওঠে। ফাতেমারও ভর লাগে। কিন্তু নাজনিন 'জিন' বলেনি। 'শিব'ও নয়। সে বলেছে, "ভা"। ফাতেমার কপালে ভাঁজ পড়ে। উদগ্র কৌতূহলে সে জিন তাড়ানোর একটা সুরা বিড়বিড় করতে করতে বটের একটা ডাল হাতে করে এ-ঝোপ ও-ঝোপ ঘুরে বৈঁচিঝোপের দিকে পা টিপে টিপে এগোয়। ঝোপের মাথায় দুটো হলদে প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে। খয়েরি-কালো-সাদা তিন রঙের পালকওয়ালা দুটো ল্যাজঝোলা পাখি ডানা ঝাপটে ঝাপটে ভালবাসছে, ফাতেমার আগমনে তারা ঝটপট উড়ে গিয়ে অন্য স্থান খুঁজে নেয়। সাদাত আর বৃন্দা হাতেনাতে ধরা পড়ে।

কঠিন অপরাধ! বাড়িতে চোরের মার খেল দু'জনেই। দু'তরফেই চেষ্টা ছিল অপরপক্ষকে দোষী সাজানোর। বৃন্দার বাবা নিত্যানন্দ ভাবল এক বার যদি প্রমাণ করা যায় ছোঁড়াটাই ফুসলেছিল, এখন সব আইন মেয়েদের পক্ষে। না-হোক বিশ-পঁচিশ হাজার হেসেখেলে আদায় করে নেওয়া যাবে। জাহিরাও ভেবেছিল সাদাত এক বার বললেই নাজনিন, ফাতেমা সাক্ষ্য দেবে—বৃন্দা মেয়েটাই গায়েপড়া। কিন্তু সাদাত কিছুতেই কবুল করল না। ওদিকে নিত্যানন্দ মেরে আধমরা করে ফেলল, তবু বৃন্দা মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করল না। বৃন্দা মনে মনে চাইছিল বাবা তাকে একেবারে মেরে ফেলুক, না হলে...। কিন্তু তেমনটা হল না। বরং বৃন্দার অন্য আশঙ্কাটাই সত্যি হল। স্কুল ছাড়িয়ে বাবা পনেরো বছরেই তার চেয়ে পনেরো বছরের বড় বল্লালের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলল। রসুলপুরেও বিচার বসেছিল। সাদাত সেখানে মার খেতে খেতেও প্রতিবাদ করে। তাতে মৌলবির মুখে মুখে তর্ক করবার জন্য তার অতিরিক্ত জরিমানা হয়। জাহিরা কপাল চাপড়ায়। মুম্বই যাওয়ার আগে সাদাত শেষ চেষ্টা করে। নাজনিনকে দিয়ে লুকিয়ে একটা চিঠি পাঠায় বৃন্দার কাছে। কারণ বৃন্দার ফোন ছিল না। নাজনিন বাড়ির চৌহদ্দি পেরোতে না-পেরোতে জাহিরার হাতে ধরা পড়ে, বেধড়ক ঠ্যাঙানি খায়।

সাদাত নির্দিষ্ট দিনে মুম্বই চলে গেল। আর ফিরল না। আন্ধেরিতে সোনার দোকানের কাজ তার আর তখন ভাল লাগছে না। বস্তুত কোনও কাজেই তার মন নেই। পার্কে বসে কাটিয়ে দেয় সারাটা দিন। কখনও মুম্বই-সেন্ট্রাল স্টেশনের কাঠের ব্রিজের ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেন আসে। ট্রেন চলে যায়। কখনও এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। দু'বার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে একটুর জন্য বেঁচে গিয়ে ড্রাইভার থেকে পথচারী সবার গালমন্দ হজম করেছে। মরাঠা মন্দির, সিনেমা হলের পিছনে যে-লম্বা বস্তিতে সে ভাড়া থাকত, সেখানে উপর-নীচে দুই তলাতেই থাকার ব্যবস্থা। নীচের তলার ইমতিয়াজ এক দিন তাকে বলল, "কী হয়েছে দোস্ত, মন খারাপ? চল, আজ সন্ধ্যায় এক জায়গায় নিয়ে যাব। দেখবি ভাল লাগবে।" আগুপিছু কিছু না ভেবেই সাদাত সন্ধ্যা নামলে ইমতিয়াজের সঙ্গে পা বাড়াল। জাভেরিবাজারে নিয়ে এল ইমতিয়াজ। হাতের আঙুলের মতো সরু সরু গলি। সব গলিতে অসংখ্য গয়নার দোকান। আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। নতুন কাজ? সাদাত বেজার হচ্ছিল। কাজ তার ভাল লাগছে না। কিন্তু ইমতিয়াজ কোথাও থামল না। দুটো দোকানের মধ্যিখান দিয়ে একটা কানাগলি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইমতিয়াজ ফস করে ঢুকে গেল। পিছনে সাদাত। গলিটা থেমেছে একটা মসজিদের গায়ে। এ গলি অন্ধকার। চড়া আলো থেকে হঠাৎ ঢুকলে আরও অন্ধকার লাগে। মসজিদের গায়ে একটা কমজোরি বাল্ব ঝোলানো। মাগরিবের আজান শুরু হবে। পরম করুণাময় আল্লাতালার দয়ায় সন্ধ্যা ও সকাল হয়। সেই সন্ধ্যায় তাঁর আরাধনার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। ইমতিয়াজ ঢুকল। পিছনে সম্মোহিত সাদাত। ভেতরে আলো ছিল। ঢুকে সাদাত দেখল তার বয়সি অনেকে। মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের হুঁশ হয়। সাদাত বুঝতে পারল কিছু কিছু। তবু তার স্থবির হৃদয়ে তেমন আলোড়ন উঠল না। সে যন্ত্রমানবের মতো ইমতিয়াজকে অনুসরণ করল। নমাজের পর বক্তৃতা শুরু হল চোস্ত উর্দুতে। সাদাত উর্দু বোঝে না। সাদাতের পরিচিত নানা ধর্মপ্রাণ লোক পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে রোজ। হজ করে এসেছে তিন বার। সেই হাজি গিয়াস-উদ-দিন তাকে শিখিয়েছিল, নাশকতাকে কোরান পাপ বলেছে। এতক্ষণে সাদাত মনে করল, পালাই। কিন্তু এখান থেকে পালানো যায় না, সে আগেই বুঝতে পেরেছিল। তবু সে এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। একবার পিছু ফিরল। দেখল সে ছাড়া বাকিরা যেন ধ্যানস্থ। নিবেদিত। সে আবার ভাবল। এবার তার মনে পড়ল নিত্যানন্দকে। বৃন্দার বাবা তার বৃন্দাকে মেরে মেরে আধমরা করে ফেলেছিল। সে মত বদলাল। হঠাৎ উপর্যুপরি তীব্র হুইসলের শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে সব আলো নিভে গেল। সাদাতের হাত ধরে ইমতিয়াজ একটা সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নামতে লাগল। একসঙ্গে অনেক পায়ের শব্দ। সিঁড়িটা শেষ হল একটা সুড়ঙ্গের মুখে। তার পর আবার অন্ধকার। দৌড়! দৌড়! দৌড়! দৌড়োতে দৌড়োতে পিছনে বিস্ফোরণের ভয়ানক শব্দে জ্ঞান হারাল সাদাত। তার কত দিন পর সে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল হরিশ আর সাবিত্রী বেনের জেলেনৌকায়। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছিল সমুদ্রসৈকতে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলে মানুষ শুধু বেঁচে থাকারই মূল্য নতুন করে বুঝতে পারে। সাদাত বার বার পরম করুণাময় খোদাতালাকে স্মরণ করল।

বৃন্দার বর বল্লাল টোটো চালাত। ঘরে লক্ষ্মীমন্ত বৌ আসার পর তার পয়ে বল্লালের আয় বাড়ল। বল্লাল ক্রমশ একটা মেশিনট্রলি, এমনকি ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে একটা পুরনো চারচাকা কিনে ভাড়া খাটাতে লাগল। তাতে লাভ হলে, সে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে একটা বাস কিনল। লাইনে চালাত। দু'-একটা হোটেলে যোগাযোগ করে বছরে একবার-দু'বার গাঁয়ের লোকেদের থেকে টাকা নিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেত। বেপাড়ার লোকেও টিকিট বুক করত। বল্লাল সাদামাটা মানুষ। বিশেষ চাহিদা নেই। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সময়ে ভাত, মুড়ি একটু যত্নআত্তি আর বিছানায় শরীর,

চার দশকের কেতাবি সফর
৪০ প্র
প্র তি ভা স

এইটুকু পেলেই নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। বউয়ের গাফিলতি ছিল না। সময়ে সময়ে বল্লাল বৃন্দার জন্য তেলেভাজা, মিষ্টি কিনে আনত। শাড়ি, গয়নাও কিনে দিত। বাপের বাড়ি যাওয়ায় নিষেধ ছিল না বৃন্দার। যাওয়ার সময় হাতখরচও পেত। মোটের ওপর বৌকে ভালবাসার যতগুলি কৌশল সে এ যাবৎ শিখেছিল, তার সব কটিই প্রয়োগ করে বল্লাল সাফল্য সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিন্তে ছিল। এর কোনওটাতে বৃন্দার প্রয়োজন আছে কি না অন্য কোনও অভাববোধ তার আছে কি না, এত তলিয়ে ভাবার ফুরসত তার ছিল না। কাজের কথা ছাড়া, সে বৌয়ের সঙ্গে কখনও গল্প করেনি। তবে নিজের বাসে সে বৌকেও বেড়াতে নিয়ে যেত। তারকেশ্বর, নবদ্বীপ, দিঘা এমনকি পুরী পর্যন্ত বৃন্দাকে ঘুরিয়ে এনেছিল বল্লাল। বল্লালের কোনও কাজে কখনও প্রতিবাদ করেনি বৃন্দা। কখনও উচ্ছ্বাসও দেখায়নি। বল্লালের কামনার প্রতিটি আগ্রাসনে সে নিঃশব্দে শান্ত ভঙ্গিমায় মেলে দিত নিরাবরণ দেহ। যেন পরানপুকুরের শীতল জল। বল্লাল নিশ্চিন্তে ঘুমোলে প্রতি রাতে সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমে আসত বৃন্দা। দীর্ঘ স্নানে নিজেকে মার্জনা করত। তার পর দেরাজের একটা খাপ খুলে বের করে আনত তার সেই ফুলছাপ কুর্তি আর সালোয়ার। মুখ ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিত সমুদ্রের। নবদ্বীপ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। দীঘায় গিয়ে প্রথম প্রতিবাদ করল বৃন্দা। হোটেল থেকে বের হল না। ব্যালকনিতে একা সমুদ্রের উল্টো দিকে ঝাউবনের দিকে চেয়ে রইল। বল্লাল, তার বন্ধুরা কত ডাকাডাকি করল, হাত ধরে টানল, তবু বৃন্দা সমুদ্রে নামল না। বল্লালের খটকা লাগল। পুরীতে বৃন্দা পিপলির কাচবসানো লাল বটুয়া কিনল শখ করে। কটকি শাড়ি, সম্বলপুরী। কাঠের রথ, পাথরের জগন্নাথ। খেজুরপাতার সেলাইয়ের ঝাঁপি। এমনই টুকিটাকি। জগন্নাথ মন্দিরে উপোস করে পুজো দিল। কিন্তু সমুদ্রের দিক মাড়ায়নি সে। অথচ শ্বশুরবাড়িতে কারও কাছে বল্লাল শুনেছিল সমুদ্র ভালবাসে বৃন্দা।

গোপন কথার ধর্ম হল, সে মোটেই গোপন থাকে না। বল্লাল আরও কিছু শুনেছিল। তবে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তার সঙ্গেও কমলার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু পিসির মেয়ে পছন্দ হয়নি। কমলার মুখটা তার আর মনেই পড়ে না। কিন্তু বৃন্দা! তারই জন্য না সে সমুদ্রে এসেছিল। না-হলে বল্লাল কাজ বোঝে। নদী, পুকুর, সমুদ্র সবই তার কাছে জল বই আর কিছু নয়। বৃন্দাকে সে কখনও সন্দেহ করেনি। বিশ্বাস করেছিল। নিজের মতো করে প্রাণপণ ভালবেসেছিল। কেবল মুখে বলতে পারেনি। বল্লাল যা ভাবে, কাজে করে দেখায়। তাতে কি বোঝানো যায় না! কে জানে! বল্লালের কপালটাই মন্দ। ছোট থেকেই তার বাবা নেই, মা নেই। একটা ভাইবোন পর্যন্ত নয়। থাকার মধ্যে ছিল মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আর এক বিধবা পিসি। বৃন্দার সঙ্গে বিয়ের পরে সেই পিসিও শান্তিতে চোখ বুজেছিল। শ্বশুরবাড়িতে তাই বৃন্দার ছিল অগাধ স্বাধীনতা। কোনও কাজে খুঁত ধরার বা কোনও বিষয়ে নিষেধ করার কেউ ছিল না। বল্লাল তাকে কখনও শাসন করত না। এমনকি, বিয়ের তিন বছর পার করেও সে মা হতে পারেনি বলে তাকে বাঁজা বলে অপবাদ দেয়নি কিংবা ডাক্তার, কোবরেজ নিয়ে জোরাজুরি পর্যন্ত করেনি। ভেবেছিল আগে আর-একটু মন বসুক, বৃন্দা ঠিকঠাক সংসারী হয়ে উঠুক, তখন না হয়...। প্রবাদ আছে অবহেলায় কানারও চোখ ফোটে। বল্লালেরও ফুটল। বুকটা চৌচির হয়ে গেল। বৃন্দা দেখতেই পেল না। বল্লাল ভাবল, আমি আগাগোড়াই ঠকে গেছি। কাউকে সে বলতে পারল না কিছু। কেবল ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে মরল। যন্ত্রণা থেকে জন্ম নিল একটা বুনো রাগ। সেটা শিরায় শিরায় দপদপ করতে লাগল। সে অহেতুক রেগে ওঠে। খিটখিট করে। জিনিসপত্র দুমদুম করে রাখে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে। বিছানায় প্রবল হয়ে ওঠে। পিষে ফেলে বৃন্দাকে। তবু বৃন্দা টুঁ শব্দটি করে না। নিস্পৃহ নিরুত্তাপ। বল্লালের ফরমাশ মতো এক কাজ দু'বার করে। বল্লালের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। হাত-পা নিশপিশ করে। যাই হোক, হেরে যাওয়ার আগে বল্লাল শেষ একটা চেষ্টা করল। মুম্বইয়ের দু'খানা টিকিট কেটে আনল। বাসের নয়, ট্রেনের। এখন তার সে রেস্ত হয়েছে। এসি কোচ। অঢেল খাওয়াদাওয়া। বৃন্দা কি খুশি হল? বোঝা গেল না। দ্রুতগামী ট্রেনের সবুজ রাত-আলোয় ঘুমন্ত বৃন্দাকে বল্লালের ভারী রহস্যময় লাগল। সুপারফাস্ট গাড়ি লোহার চাকায় অন্ধকার বিদীর্ণ করে মহা কলরোলে অনাগত এবং অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে লাগল। জানলার দু'পাশে হুহু করে উল্টোদিকে পিছিয়ে পড়তে লাগল চেনা-অচেনা মানুষ মাঠ নদী গাছপালা গ্রাম শহর—দূরগত অতীত এবং সাম্প্রতিক বর্তমান। ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসে নেমে ওরা ট্যাক্সি নিল। ট্রেনের ক্লান্তি ভুলে বৃন্দা গোটা রাস্তা জানলায় তার উপোসি চোখ পেতে রইল। বিশাল বিশাল বাড়ি, যানজট, ধুলো ধোঁওয়া কোনও কিছুই তার খারাপ লাগছিল না। মনে মনে বলে চলল, 'সাদাত, আমি এসেছি!' দু'দিনেই তারা দেখে ফেলল মেরিন ড্রাইভ, নরিম্যান পয়েন্ট। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে স্টিমারে করে ঘুরে এল এলিফ্যান্টা কেভ। আদিম গুহায় গুহায় শতাব্দপ্রাচীন ভাস্কর্য। মহাদেবের শীতল পাষাণমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বৃন্দার দু'চোখে উপছে পড়ল জল। এত বড় মুম্বই শহরে কোথাও যেন তার সাদাতের চিহ্নমাত্র নেই। দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তার পাঁজর ভেদ করে। সে বল্লালের পাশে এসে চুপটি করে দাঁড়াল। আলগা মুঠিতে ধরল বল্লালের খসখসে হাতখানা। কী যেন বলি বলি করেও কিছুতেই বলতে পারল না। কৃতজ্ঞতা? বল্লাল ম্লান হাসল। পর দিন তারা জুহুতে এল। খুব সেজেছিল বৃন্দা। চুড়ো করে বাঁধা খোঁপায় শঙ্খের মালা। কানে শঙ্খের দুল। কপালে টিপ। চোখে কাজল। সেই গোলাপি ছাপ কুর্তি, সালোয়ার, যেটা দেখে মুগ্ধ বিচের উতল হাওয়ায় ফসফরাসের মতো জ্বলে উঠল বল্লাল। ইদানীং তার ঘুম পাতলা। এক দিন রাতে সে দেখে ফেলেছিল বৃন্দার অভিসার। বৃন্দা বল্লালকে তেমন করে তাকিয়ে দেখল না। করেই বা দেখেছিল! তার সামনে তখন সাদাতের চোখের মণির মতো সবজে নীল আরব সাগরের জল উত্তাল! "ফোটো-ফোটো!" বলতে বলতে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়ে এল আপাদমস্তক বর্ষাতিমোড়া এক ফোটোওয়ালা। বল্লাল হাঁকিয়ে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। ফোটোওয়ালা নাছোড়বান্দা। দু'খানা ফোটো তুলেই ছাড়ল। সে দিন সাগরে জোয়ার। তার ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এক হাত দূরের মানুষকে ঝাপসা লাগে। তবু বৃন্দার হাত ধরে জলের ভেতর এগিয়ে গেল বল্লাল। থরথর করে কাঁপছিল বৃন্দা। অনবরত তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল আরব সাগরের ঢেউ। সে ভিজছিল, ভিজছিল তার গর্ভস্থ ভ্রূণ। সে ছুঁয়েছিল বল্লালের হাত। তবু তার অন্তরাত্মা আকুল হয়ে ডাকছিল, 'সা-দাত!' পরানপুকুরের ধারে সাদাত তাকে শিখিয়েছিল ঢেউ কাটাতে। ঢেউ তাকে তাই পর্যুদস্ত করতে পারছিল না। খেলায় মেতে উঠেছিল বৃন্দা। ঠিক এই সময়েই সে পিঠে অনুভব করল একটা ধাক্কা। না ঢেউয়ের নয়, মানুষের! ভিজে বালির ওপর ভারী পদচিহ্ন রেখে, ছাতায় মুখ ঢেকে, বল্লাল তীরের দিকে ফিরে চলল একা। হঠাৎ দৌড়ে এল সেই ফোটোওয়ালা, 'বাবু ফোটো!' বল্লালের রক্তশূন্য মুখের সামনে সে মেলে ধরল বৃন্দার রঙিন ছবি। বৃন্দা হাসছে! ছোঁ মেরে ফটোগুলো কেড়ে নিয়ে কোনও রকমে টাকা দিয়ে লোকটাকে বিদায় করল বল্লাল।

বৃন্দা, সেই মদালসা গর্ভিণী নারী ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঢেউয়ের চতুর্দোলায় দুলতে দুলতে নতুন কনের মতো ভেসে চলল অকূল দরিয়ায়। সুনীল সাগরে সে কি পেয়েছিল সাদাতের জলজ ঘ্রাণ? কে জানে! সমুদ্রগর্ভে সে দিনও জাল ফেলেছিল সাদাত। গরিব জেলের রোদ বৃষ্টির পরোয়া নেই। সফেন একটি সমুদ্রপাখি ডানা মেলে নেমে এল গলুইয়ের ওপর। মাছের গন্ধে ওরা অমন আসে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে কেন যে সে-দিন কেঁপে উঠল সাদাত আপাদনখশির। মৎস্যকন্যার শঙ্খমালাটি ছিল পাখির ঠোঁটে। সাদাত চিনতে পেরেছিল কি! কে জানে!

অঙ্কন: মহেশ্বর মণ্ডল

সুখলালের কিস্‌সা

শুভ্রদীপ চৌধুরী

খেঁকশিয়ালের ডাক ভেসে আসছে সুখলালের সারেঙ্গি থেকে। শ্রাবণ মাসের মেঘলা বিকেল। ঘড়ি না-দেখলে মনে হবে সন্ধে গড়িয়ে গেছে। সেই সকাল থেকে টানা দুপুর পর্যন্ত ঝিপঝিপ বৃষ্টি পড়েছে। সুখলালের ঘরের সামনের ডোবা থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। জল পড়ে বারান্দার মাটি বেশ কিছু জায়গায় ফুলে উঠেছে। সেখানেই চট পেতে সারেঙ্গি নিয়ে বসেছে সুখলাল। পাড়ার খান চারেক বাচ্চা এসে গুটিসুটি মেরে বসে আছে তার সামনে। এই বাচ্চারা মাঝেমধ্যেই আসে। খেঁকশিয়াল, কাক কিংবা রাজহাঁসের ডাক শুনতে চায়। এখন তাদের সেই বায়নাপর্ব চলছে।

বৃষ্টির জন্য আজ চদরবদর নিয়ে বেরোতে পারেনি সুখলাল। চদরবদর হল প্রাচীন পুতুলনাচ। সুখলাল এই পুতুলনাচ দেখিয়ে বেড়ায়। এটাই তার পেশা। সুখলালের এক হাতে থাকে সারেঙ্গি অন্য হাতে কাঠের বাজনদার, নাচুনিদের নাচায়। কাঠের পুতুল এই বাজনদাররা ধামসা আর মাদল বাজানোর ভান করে। বুধবার, মোহিনীগঞ্জে হাট বসে আত্রেয়ী নদীর পারে। মোহিনীগঞ্জের হাট এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় হাট ছিল একসময়। সবসময় লোকে লোকারণ্য। দোকানদার, পাইকার, খরিদ্দার আর দালালে ভরা। এই ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকত পকেটমার। ধান, পাটের গুছি, গরু, ছাগল, সব্জি কিংবা কবুতর বেচা টাকা পকেট থেকে হাপিস হয়ে যেত কত মানুষের।

হাটের এমাথা থেকে ওমাথা যেতে সময় লাগত আধঘন্টার বেশি। এখন হাটের সেই আগের অবস্থা নেই। আত্রেয়ী নদীর মতোই শুকিয়ে গেছে। সেই শুকিয়ে যাওয়া হাটের শেষপ্রান্তে মস্ত কড়ই গাছের নীচে এখনও চদরবদর নিয়ে দাঁড়ায় সুখলাল। গান গায়। চদরবদর দেখতে আজকাল তেমন লোকজন আসে না। ফলে আগের মতো আয় নেই। আয় বলতে সুখলাল চদরবদরের সামনে একটা লালসালু পেতে রাখে। দর্শকরা সেখানেই টাকাকড়ি ছুড়ে ফেলে।

বৃষ্টির জন্য একটা দিন বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা সুখলালের মতো মানুষের কাছে অসম্ভব ব্যাপার। বসে থাকলেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। এমনই অদ্ভুত সেই কাণ্ড যে, কেউ বিশ্বাস করবে না। উল্টে ভাববে বৌ মরে যাবার পর সুখলালের মাথা খারাপ হয়েছে। এমনিতেই তাকে আড়ালে আবডালে গাঁয়ের কিছু মানুষ 'তারছেঁড়া' নাম দিয়েছে তা সুখলাল জানে। বয়স যত বাড়ে মানুষ ততই একা হয়। সব কথা বলবার মতো মানুষ পাওয়া যায় না। কাকে বলবে অদ্ভুত কাণ্ডের কথা? কেউ নেই। সুখলালের চদরবদরের কাঠের পুতুলরা অদ্ভুত—তারা কথা বলতে পারে। একদিন তাদের নিয়ে না-বেরোলেই কানের কাছে কাঠের বাজনদার পুতুলের ফিসফাস শুনতে পায়, "হাড়ে যে দুব্বাঘাস গজায়ে ফেলবা দেখতিছি সুখলাল! এমন করলে গান বাজনা সব যে ভুলে যাবা দেখতিছি। তুমি করিৎকর্মা মানুষ, এমন বেহিসেবি কাজকাম তোমার মানায় না। এদিকে ঘরে চাউল যে বাড়ন্ত, এই কঠিন সাংসারিক বিষয়খানা নিশ্চয় ভুলে গেছ!"

নাচুনি পুতুলরাও কম যায় না। কাজে না-বেরোলে তারাও চুপ করে থাকে না, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে। ভাল করে কান পাতলে সুখলাল শুনতে পায় ওদের কথা।

"নাচের জামাকাপড় পরে চুপচাপ দাঁড়ায়ে থাকা যে কত কষ্টের, তা যদি বুড়োটা বুঝত!"

"আগে ভাবতাম আমাদের কষ্ট লোকটা বোঝে।"

"যত দিন যাচ্ছে অলসের ঢিঁকি হয়ে যাচ্ছে লোকটা। এমন করলে যেদিক চোখ যায় চলে যাব। নয়তো আর কখনও নাচব না।"

প্রতিদিন আটটার মধ্যে সাইকেলের ক্যারিয়ারে চদরবদরের সরঞ্জাম বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুখলাল। চল্লিশ বছর হতে চলল সুখলালের এই কাজ। যেদিন বেরোতে পারে না, সেই সব দিন এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কত কথা যে কানে আসে!

সুখলাল সারেঙ্গি হাতে উঠে দাঁড়াল। আর কিছুতেই বসে থাকা যাচ্ছে না। ঘরের ভিতর থেকে চাপা কান্না ভেসে আসছে। কে কাঁদছে?

বাচ্চার ছোট্ট দলটি জানে এই বুড়োর মাঝেমধ্যেই কী যেন হয়। কথা নেই বার্তা নেই দুম করে ঘরে চলে যায়। একবারও বলে না, এবার চলে যা তোরা।

বাচ্চারা বোঝে। কখন এই এবড়োখেবড়ো ভেজা বারান্দা থেকে উঠে যেতে হবে।

ঘর অন্ধকার। পা মেপে ঠিক চৌকির পাশে রাখা চদরবদরের কাছে গিয়ে বসল সুখলাল। সবচেয়ে ছোট্ট নাচুনি কাঁদছে। অন্য নাচুনিদের মুখ থমথমে। সুখলাল বুঝল, অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। যে-কোনও সময় বিরাট ঝগড়াঝাঁটি শুরু হবে। প্রত্যেকেই বড় মুখরা। একবার ঝগড়া শুরু হলে থামতে চায় না। এই মেয়েদের স্বভাব হল, বহু বছরের পুরনো কথাবার্তা টেনে নামিয়ে এনে বিচার চাওয়া। অবস্থা হাতের বাইরে যাতে না-চলে যায়, তার জন্য আগেভাগেই গলা নরম করে সুখলাল বলল, "আজ বেরুবার না পারে আমার মনটাও আকুপাকু করতিছে রে। সকাল থেকে বৃষ্টি না হলে ঘরে কী আর বসে থাকতাম! তোরা তো জানিস আমি ঘরে বসে থাকার মানুষ না!"

ছোট্ট নাচুনির নাম সুখলাল রেখেছে সোনামন। অন্যদের চেয়ে সে সব কিছুতেই এগিয়ে থাকে। শুধু নাচে নয় কান্নাতেও। পান থেকে চুন খসলেই চিল চিৎকার জুড়ে দেয়। সেই মেয়ে কাঁদছে। সাধারণ কান্না নয়, আজ সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সোনামনের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে সুখলাল বলল, "কী হয়েছে রে? নাচ হচ্ছে না বলে মন খারাপ?"

সোনামন কিছু বলার আগে বাজনদারদের একজন বলল, "এত হেলাফেলার মধ্যে আমাদের ফেলে রেখেছ কেন তুমি? তুমি কী চাও আমরা শেষ হয়ে যাই? পুবের আকাশে দুধ রঙ ধরলেই আমরা জেগে উঠি। ভোর থেকে বিকেল অবধি অপেক্ষার কষ্ট বোঝো? তা ছাড়া অন্য একটা ভয়ঙ্কর খবর আমাদের কানে এসেছে।"

সুখলাল চুপ করে থাকল। কী উত্তর দেবে তা মাথায় আসছে না। আসল কারণ না-জানলে উত্তর দেবেই বা কেমন করে। তবে এটুকু নিশ্চিত, সমস্যা বিরাট। অন্যদিনের মতো শুধু বাইরে না-যেতে পারার জন্য নয়। এর পিছনে থাকা ভয়ঙ্কর খবরটা জানতেই হবে। ঘরে ঢুকেই আজ তিনি বুঝেছিলেন, অন্য কোনও বড় কারণ আছে।

সুখলাল সেই ভয়ঙ্কর কারণ খুঁজতে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন পুতুল নাচের এক পুতুলের জন্য বুকের ভিতরে তার চিনচিনে ব্যথা হয়। এই পুতুলনাচ সুখলাল শিখেছিল ঠাকুরদা পাতা হাঁসদার কাছে। ঠাকুরদা তাকে আদর করে ডাকত সুখা। হাটেঘাটে অল্পবিস্তর লোক দেখলেই চদরবদরের খেলা আর গান শুরু করত। দেখতে-দেখতে ভিড় জমে যেত। তাঁর গানের গলা ছিল খাসা। ডান হাতখানা চদরের ঘেরা কাপড়ের নীচে আড়াল করে সমস্ত পুতুলের সুতো এমন ভাবে নাড়ত দেখে মনে হত পুতুলরা নিজেরাই গানের তালে তালে নাচছে। পায়ের ঘুঙুর মানুষকে টেনে আনত। ঠাকুরদা বলত, "আমাদের সমাজে অনাথ বলে কোনও শব্দ নাই। তুই আজ থেকে চারজন নাচুনি আর চারজন বাজনদারের ভার নে। তোর বাপ পরের জমি চাষ করার কাজে লাগিচে। এই চদরবদরে তার মন নাই। আমি জোর করিনি। জোর করে ভালবাসা হয় না। তুই পারবি। মনে রাখবি, পুতুল ভাল থাকলে তুই ভাল থাকবি। তাই তোকেই এই চদরবদরের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আমার সাথে ঘুরে ঘুরে যে-কয়েকটা গান মনে রাখিচিস, তাতেই হবে। কিছুদিন যাবার পর দেখবি, গান আপনা আপনি তোর কাছে আসবে। গানেই পুতুলের মন ভাল থাকবে। বন্দুক, কামান এসব পাত্তা না-দিয়ে একসময় সাঁওতালরা নেমেছিল নিজেদের মাটি রক্ষার জন্য। লুঠেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারকে উপড়ে ফেলার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে এই চদরবদর নিয়ে আমার বাপ ঘুরিচে। নিজেদের হকের কথা লিখত আমার ঠাকুরদা। শুধু লিখত না, প্রচার করত। আমার বিশ্বাস তুই পারবি আমাদের

সুখলাল সেই ভয়ঙ্কর কারণ খুঁজতে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন পুতুল নাচের এক পুতুলের জন্য বুকের ভিতরে তার চিনচিনে ব্যথা হয়। এই পুতুলনাচ সুখলাল শিখেছিল ঠাকুরদা পাতা হাঁসদার কাছে।

নিজেদের কথা হাটেবাজারে ছড়ায়ে দিতে। সেই ক্ষমতা তোর আছে।"

"পারব?"

"পারবি। আমি এই গান আর পুতুলের ভালবাসায় আটকে পরের জমিতে চাষবাস করার সায় পাইনি মন থেকে। বাড়িতেই কাঠ আর বাঁশ দিয়ে বানাবি পুতুল। গানের কথা-মতো সাজাবি। কথক ঠাকুরকে একটু বড় করে গড়বি। সেই নেচে নেচে আমাদের কথা গানের মাধ্যমে বলবে। মনে করবি তুই সেই কথক ঠাকুর। যার আঙুলের সাথে জুড়ে থাকবে আটজন পুতুল। এখন থেকে নিজেকে তুই ওই পুতুলদের একজন ভাববি। ওদের মতো হবার চেষ্টা করবি। এটা ভেবে নিলেই সব সহজ হয়ে যাবে।"

সেই থেকে একহাতে সারেঙ্গি অন্যহাত বাঁশের তেপায়া স্ট্যান্ডের চারদিকে ঘেরা কাপড়ের তলায় হাত লুকিয়ে রেখে শুরু হল সুখলালের আশ্চর্য পুতুল জীবন। প্রতিটা পুতুলের সুতো অদৃশ্য আঙুলের ডগায়। তাতেই গানের সঙ্গে পুতুলের নাচ। বাইরে থেকে বোঝা যায় না পুতুল নাচছে কেমন করে। মুখোমুখি আটখানা পুতুল। চারটি আদিবাসী মেয়ে। চারটি ধামসা আর মাদল নিয়ে বাজনদার ছেলে। শুধু তাই নয়, পাতা হাঁসদার কাছ থেকে পাওয়া সেই চৌকো মঞ্চের মাথায় অনবরত বারের খেলা দেখিয়ে চলে এক চদরবদর। যে শুধু অবাক করতে জানে। থামতে জানে না। শুধু লাফিয়ে চলে সময়ের মতো। যেন সে বলতে চায়, জীবনকে সহজ করে নাও। প্রতিভা আর পাগলামির সরু তারের উপরে লাফিয়ে পার করে দাও একটা জীবন।

কথক ঠাকুর সুখলালকে মনে করিয়ে দেয়, "সারাক্ষণ আমার মতো ছটফট করে যা সুখলাল। যা খুশি হোক থামবি না। গল্প বলে যা। তোর এভাবেই আমাদের মুখে গল্প বলা কাজ। থামলেই আমরা শেষ। আমাদের কাঠ করে রাখিস না। আমরা থামলেই তোর পেটে গামছা বেঁধে থাকার দিন এগিয়ে আসবে।" এসব কথা বলার সময় সুখলালের মনে হয় তার পিঠে পরম মমতায় হাত রেখেছে কথক ঠাকুর।

পুতুলদের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ এখনও কানে আসছে। একজন নয়, দু'জন কিংবা তিনজন কাঁদছে। কান্না ছোঁয়াচে রোগের মতো। থামাতে এলেও রক্ষে নেই। যেন বন্যার জলের মাঝে খড়কুটোর মতো কান্নার স্রোত টেনে নিয়ে যাবে।

আজকাল ফুলমণির সঙ্গে বিয়ের দিনগুলো খুব মনে পড়ে সুখলালের। বিদায়ের সময় ফুলমণির কান্না দেখে সুখলাল কান্না আটকাতে পারেনি। সে নিয়ে খুব একচোট হাসাহাসি হয়েছিল পাড়াতে। সুখলাল সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছিল যখন দেখল অন্যরা নয়, নতুন বৌ ফুলমণি কান্না থামিয়ে চোখ মুছে হো-হো করে হাসছে। তার চোখের কাজল ধেবড়ে গেছে।

খোঁপা খুলে হাওয়াই ভাসছে চুল। খোঁপা থেকে জবাফুল খসে পড়েছে। সেদিকে একদম খেয়াল নেই।

কথক ঠাকুর গম্ভীর গলায় জানতে চায়, "তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না সুখলাল?"

সুখলাল চুপ করে থাকে। কার্যকারণ না-জেনে অযথা কথা বলা ঠিক না। চুপ করে থাকাও একটা শিক্ষা। এর মানে আছে। সারাদিন এমন অনেক প্রশ্ন ভেসে ওঠে মনে, ইদানীং সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না।

কথক ঠাকুরকে টপকে মানুষের মতো পায়ের শব্দ তুলে মাদল রেখে এগিয়ে এল বাজনদার সোমরা। সে রাগী গলায় বলল, "শুনলাম তুমি আমাদের বিক্রি করে দিচ্ছ! খবরটা কি সত্য? এদিকে একটা ইঁদুর সোনামনের সমস্ত সুতো কেটে দিচ্ছে বারবার সেই খবর রাখো? রাখলে কিছু করতে পারছ না কেন? ঘরের খবর রাখতে হয় সুখলাল। ঘরের খবর পরের কাছ থেকে নেওয়া ঠিক না। আজ সোনামনের সঙ্গে যা হয়েছে, অন্যদিন আমাদের সঙ্গে হবে।"

সুখলাল চিৎকার করে উঠল, "না, হবে না। তার আগেই ইঁদুরটাকে আমি শেষ করে দেব।"

"পারবে?"

"পারবো। আমাকে পারতেই হবে।"

"আমরা তোমার ভরসায় আছি। তুমি যেমন করে নাচাও তেমন করে আমরা বাঁচি বলেই কি এই অবহেলা?"

সোনামনের মায়াবী মুখখানা যেন এক ঝলক দেখতে পেল সুখলাল। সোনালি জরি, নীল চুমকি বসানো আলতা রঙের শাড়ি কিনে এনেছিল দশকর্মা ভান্ডার থেকে। অন্য নাচুনিরা মুখ টিপে হেসে বাজনদারদের উদ্দেশ্যে তখন বলেছিল, "বৌ মরে গিয়ে লোকটার মাথা একেবারে আউলে গেছে রে! হাঁটুর বয়সি মেয়ের জন্য কেউ এমন বেহায়া কাম করে?"

ওদের কথা বুকের মাঝে শেলের মতো বিঁধছিল সুখলালের। তবু চুপ করে শুনছিল। সব মিথ্যে নয়, এইসব কথার অনেকটাই সত্যি। ফুলমণি এমন দুম করে চলে যাবে বুঝতে পারেনি সুখলাল। মাঝে-মাঝে বলত, বুকে ব্যথা। মোহিনীগঞ্জের হাটের কবিরাজ গোল্ড মেডালিস্ট বি সাহা আশি টাকার ধন্বন্তরি টনিক দিয়েছিল। আশি টাকার এক পয়সা কম নেয়নি। সকালে দুপুরে রাত্রিতে এক ছিপি করে খাবার নিয়ম।

সুখলাল জিজ্ঞেস করেছিল, "এতেই ফুলমণি সেরে উঠবে তো?"

ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত কবিরাজ সাহা বলেছিল, "দুনিয়ার সমস্ত ব্যথা এই টনিক দূর করতে পারে। মনে রাখবে এই টনিক আমার স্বপ্নে পাওয়া। ভোরের দিকে দেখা স্বপ্ন। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়, তা সবাই জানে। তাই সে কথা থাক। আমার এই ধন্বন্তরি টনিক না-খেয়ে ঘরের কোনায় রেখে দিলেও কাজ দেয়। আবার ধরো ব্যথা নাই তবু কিনে ঘরে রাখলে জানবে বাড়িতে ডাক্তারবাবু এসে চুপটি করে বসে আছে। চিন্তা নাই। বাড়ির সকলে সুস্থ থাকবে, অসুখ-বিসুখ আর হবে না।"

পুরনো সেই সব কঠিন দিনের কথা ভুলতে পারে না সুখলাল। বায়োস্কোপের মতো চোখের সামনে চলতে থাকে। চোখ বন্ধ করে থাকলেও দেখা যায়।

ফুলমণির প্রচণ্ড জ্বর। মাথায় জল দিয়েও কমছে না। হাতে তেমন টাকা ছিল না। কুড়িয়ে বাড়িয়ে তিনশো টাকা ভিজিট জোগাড় করে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর চেম্বারে

ফুলমণিকে নিয়ে গিয়েছিল সুখলাল। ওষুধ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নতুন সারেঙ্গিটা বেচে দিতে হল এক বাবুর কাছে। বাবুর নাম হরিশ আগরওয়াল। হরিশবাবুর বহুদিনের শখ ছিল সারেঙ্গিটা কেনার। কেনা নয়, হরিশবাবু বলেছিল, "এটাকে বিক্রি বলে না সুখলাল, বলে সংগ্রহ। তোমার হাতে গড়া মেয়েমানুষের মতো দেখতে এই সারেঙ্গিটা আমার খুব পছন্দের ছিল। ঘরে ঝুলিয়ে রাখব, মানুষজন দেখে চমকে যাবে। এসব জিনিস এখন ঘর সাজানোর কাজে খুব ভাল মানায়। বসার ঘরে একটা একতারা, সারেঙ্গি, ডুগডুগি থাকলে মান বাড়ে।"

শুধু তাই নয় সেই থেকে হরিশবাবু আজও মাঝেমাঝে আসেন। আসার কারণ, চদরবদর। তিনি পুরো চদরবদর কিনতে চান।

সব শুনে সুখলাল অবাক হয়েছিল, "আপনি চদরবদর কিনে কী করবেন?"

হরিশবাবু সামান্য হেসে বলেছিলেন, "আমি একজন সংগ্রাহক। ইংরেজ সাহেবদের সিগারেটের টিন, জাহাজের মাস্তুল, সাদাকালো সিনেমার টিকিট, বড় বড় মানুষের বিয়ে কিংবা শ্রাদ্ধের কার্ড, বাউলের ঝোলা, একতারা, খোল, ঢাক, অকেজো বোমা, বাতিল লণ্ঠন, কেরোসিনের ইস্ত্রি, দুশো বছরের পুরাতন কম্পাস, এমন হরেক রেয়ার জিনিস আমার সংগ্রহে আছে। একবার রাজস্থান ছুটে গেলাম একটা অদ্ভুত বালিঘড়ির খোঁজ পেয়ে। কত টাকা খরচ হয়েছিল শুনলে অবাক হবে। তাই বলছি না। টাকা বিষয় নয়। আসল বিষয় হল, জিনিসটা কেমন। তোমার চদরবদর আমার পছন্দ হয়েছে।"

তখন টাকার খুব প্রয়োজন। ফুলমণিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। খরচ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। মাথায় বারবার ঘুরত সেই বাবুর কথা, "পুতুল বিক্রি করতে চাইলে সবার আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অন্যরা যা দাম বলবে তার বেশি দেব।"

রাতের ঘুমের মধ্যে একে একে পুতুলরা আসত। ছলছল চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত। যেন বিদায়ের আগে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়ে দিতে এসেছে। রাগ নেই। অভিমান নেই। শুধু সামান্য একটি বিদায় স্মৃতি দিতে এসেছে।

এমন দোলাচলের দিন কোনওমতে কাটে তো রাত কাটে না। ফুলমণি এই টানাপোড়ন থেকে বাঁচিয়ে দিল সকলকে। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। দশটায় ভিজিটিং আওয়ারে ভাত, ডাল সজনে পাতা ভাজা নিয়ে গিয়েছিল সুখলাল। ফুলমণি বলেছিল, "চালতার টক খাওয়াবা? খুব ইচ্ছা করতিছে। দেরি কোরো না। মণ্ডলদের পুকুরপাড়ের গাছে এবার ঝুমকুটিয়ে চালতা ধরিচে। একটা চাইলে ওরা না করবে না।"

সুখলাল মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "হুম। আজ বিকেলেই তোমার জন্য চালতা আনতে যাব।"

ফিরে আসার সময় ফুলমণি শান্ত গলায় বলেছিল, "থাকো, আজ কোথাও যেয়ো না। আমার ভাল লাগতিছে না।"

চদরবদর নিয়ে পার্বতীপুরের বাজারে গিয়েছিল। ছোট বাজার তবুও বেশ ভিড় হয়েছিল অনেক। সে তুলনায় টাকা ওঠেনি। সন্ধের ভিজিটিং আওয়ারে এসে সুখলাল দেখেছিল, ফিমেল ওয়ার্ডের আঠাশ নম্বর বেডে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা দেহ। মন মানতে চাইছিল না। এখনও বারবার মনে হয়, ফুলমণি বলেছিল, আজ কোথাও যেয়ো না। আমার কাছেই থাকো।

আজকাল চালতা গাছের দিকে তাকালে সুখলালের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। চালতা পাতার মতো খসখসে ঢেউ তোলা একটা কষ্টের করাত বুকের ভিতর সব ছিন্নভিন্ন করতে থাকে।

দুই

বিশু ঘোষ মোহিনীগঞ্জের হাটে ইঁদুর মারা বিষ বিক্রি করে।

নৌকার পালের মতো একখানা ছোট সাদা কাপড়ে ইঁদুরের মারা বিষ নিয়ে হরেক রকম কথা। শুধু তাই নয়, এই পালের গায়ে চার পাঁচখানা মরা নেংটি, ধেড়ে, মেঠো ইঁদুরের চামড়ার ভিতরে তুলো গুঁজে টাঙানো। বিশুর মুখে সব সময় খই ফুটছে, "চারদিকে শুধু ভেজাল আর ভেজাল—খাবারে ভেজাল, কাপড়ে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল! হবে না কেন? নকলে ভরে গেছে চারিদিক। থইথই করছে নকল ডাক্তার, নকল অফিসার, নকল মাস্টার, নকল ইঞ্জিনিয়ার, নকল প্রেমিক, নকল প্রেমিকা, নকল সাধু। এই নকল আর ভেজালের যুগে আসল কি কিছুই নাই। আমার কথা শুনতে-শুনতে এই প্রশ্ন যখন আপনাদের মনে উদয় হচ্ছে তখন জবাবটাও শুনে নিন। এই ভেজাল সময়ের যুগে আসল জিনিস হল, আমার এই ইঁদুর মারা বিষ। চোদ্দ-পনেরো নয়, ষোলো আনাই খাঁটি। দশ টাকায় এক প্যাকেট। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে দিন ঘরের কোনায়। দেখবেন, ইঁদুরের বংশ হয়ে যাবে ধ্বংস। মনে রাখবেন, আমার এই বিষের নাম বিশু ঘোষের ইঁদুর মারা বিষ। আরও মনে রাখবেন, যে-ইঁদুর জাঁতিকলে পড়ে না, বাক্স কলের কাছে আসে না, শুধু তিড়িংবিড়িং করে আপনার চোখের সামনে লাফায়। আপনার বই, খাতাপত্র, জামাকাপড় কেটে সাফ করে দেয়, চিন্তা ভাবনা না-করে আমার কাছে এগিয়ে আসুন। বিশু ঘোষের ইঁদুর মারা বিষ একাই একশো। কোনও খাদ্য খাবার লাগবে না, ঘরের কোনে একটা ট্যাবলেট রেখে দিন। ইঁদুর ছুটে এসে খাবে। খাবার পর ছুটে বাইরে যাবে এবং মরবে।"

সুখলাল সাইকেলটা স্ট্যান্ড করিয়ে বিশুর কথা মন দিয়ে শুনছিল। বিশু ঘোষের বিষের সুনাম শুনেছে বহুবার। দিনকে দিন ইঁদুরের অত্যাচার বাড়ছে। আজ দু'জন নাচুনির সুতো, জামা কেটেছে। বাজনদাররা ক্ষিপ্ত। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হাটে এসেছে সুখলাল। ধীরেসুস্থে বিশুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বিশু বকবক করেই চলেছে। কে শুনল কে শুনল না, এসব নিয়ে ভাবলে দিনের শেষে তার সাতশো-আটশো টাকা পকেটে ঢুকবে না। বিশু বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে দেখেছে মাধবীর চোখে জল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কলপাড়ের দিকে যাচ্ছে। এগারো বছর হল মাধবীর সঙ্গে সংসার। এমন দৃশ্য মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে। "কেন কাঁদো? কারণ কী?"—বহুবার জিজ্ঞেস করেও মাধবীর কাছ থেকে উত্তর পায়নি বিশু। এই তো দিনসাতেক আগেও রাতে খাবার পর বিষের গুড়ো প্যাকেটে ভরতে-ভরতে মাধবীর চোখে জল ভরে এসেছিল। ল্যাম্পোর খড়ধোয়া আলোয় চোখের জল মুক্তো সেজে চকচক করছিল।

বিশু জানতে চেয়েছিল, "কী হইচে মাধবী?"

"কিছু না। এমনি। আমার এমনিতেই এমনটা হয়।"

বিয়ের আগেও হত। ক্লাস এইটের পড়ার সময় থেকে শুরু। স্কুলে আমায় এই হঠাৎ কান্নাকাটি নিয়ে খুব হাসাহাসি করত সকলে।

বিশু অবাক গলায় বলল, "কান্নার কারণ থাকবে না। এ কেমন ধারা কথা? কান্না কী এতটাই সস্তা জিনিস!"

"আমি নিজেও তাই ভাবি। অনেক ভাবেও যখন কুলকিনারা পাই না তখন খুব কান্না পায়। এটা কী অসুখ?" কথা শেষ করে চোখ মোছে মাধবী।

সন্ধের ভিজিটিং আওয়ারে সুখলাল দেখেছিল, ফিমেল ওয়ার্ডের আঠাশ নম্বর বেডে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা দেহ। মন মানতে চাইছিল না। এখনও বারবার মনে হয়, ফুলমণি বলেছিল, আজ কোথাও যেয়ো না।

বিশু চেঁচিয়ে ওঠে, "খবরদার! হাতে বিষ আছে ওই হাতে চোখ মুছবা না।"

মাধবী হাসে। জলভরা চোখে শরীর দুলিয়ে হাসে, "আমায় নিয়ে এত ভয় তোমার?"

"তা আমার বাদে কার ভয় থাকবে শুনি?"

মাধবী ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, "জানি না।" তারপর গুনগুন করে, "বসন্ত বাতাসে সইগো বসন্ত বাতাসে/ বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে..."

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে পাল্টে নেওয়ার ক্ষমতা আছে মাধবীর। যেন একজন নয় দু'জন মানুষ। এত বছরেও মাধবীকে বুঝে উঠতে পারেনি বিশু। সে নিশ্চিত, মেয়েমানুষকে বুঝবার ক্ষমতা নেই একজন পুরুষের। অথচ বিশুকে ঠিক বুঝে নিয়েছে মাধবী।

বিশু সজাগ হল। একজন মানুষ এগিয়ে আসছে। লোকটাকে সে চেনে। নাম সুখলাল হাঁসদা। চদরবদর পুতুলনাচ নিয়ে ঘোরে। গানের গলা দারুণ। এখনই গান শুরু করলে ভিড় করে চারপাশে দাঁড়িয়ে যাবে হাটুরে মানুষ। সে মাধবীকে বলেছে, "একদিন তোমায় সুখলাল হাঁসদার গান শোনাব। লোকটার গান শুনলে মনে হয় বিষের ব্যবসা ছেড়ে দিই।"

বিশুর সামনে এসে সুখলাল বলল, "একপ্যাকেট বিষের কত দাম, ভাই?"

বিশু ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ধেড়ে না নেংটি?"

সুখলাল দু'হাতের তালু ছয় ইঞ্চি মতো ফাঁক রেখে ইঁদুরের আকার বোঝায়।

"কিচমিচ-খিচমিচ শব্দ করে? ইঁদুরের স্বভাব হল কাটাকুটি করা। একেক ইঁদুর একেক জিনিস কাটাকুটি করে। সে-সব শুনে বলে দিতে পারি কোন ইঁদুর।"

"শব্দ তেমন কানে আসেনি। বাজনদার আর সোনামন নালিশ করেছে। পুতুলের নালিশে ঘরে টেকা দায়! তাদের দড়ি নাকি কাটে দিচে। ঘটনা সত্য। নিজে পরখ করে দেখিচি। তাদের দড়ি পাল্টায়ে তবে আজ ঘরের হাটে আসচি।"

বিশু ঘোষ হাসল, "বুঝিচি, আপনার পুতুলেরা বড়ই সমস্যায় পড়িচে। ডবল ডোজের শক্তিমান বিষ দিয়ে দিচ্ছি। সমস্যার মধ্যেও যে আপনি মজা করেন, তা আমার বড়ই ভাল লাগে। আপনি মানুষটা ভাল। নয়তো এক ডোজেই খেল খতম। রাতে কাগজের টুকরার উপরে গম নয়তো চালের সাথে এই বিষ মিশিয়ে ঘরের কোনায় রাখবেন। বাবা-সোনা করার দরকার পড়বে না এমনিতেই ইঁদুর ছুটে গিয়ে খাবে আর ঘরের বাইরে গিয়ে মরবে। গন্ধ-টন্ধ নিয়ে নো চিন্তা। তবে এই বিষ মারাত্মক। বিষের এই কাজ করার সময় ধূমপান করবেন না। কাজের শেষে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত কচলে নেবেন। ডেঞ্জারাস বিষ। দাম তাই সামান্য বেশি। এক প্যাকেট পঁচিশ টাকা।"

সুখলাল মিনমিন করে বলল, "দাও। ভাল জিনিসের তো দাম হবেই। দামের কথা ভাবলে হবে। পকেটে তিনটে দশের নোটই ছিল সম্বল। সেসব চলে গিয়ে পকেটে এল এক প্যাকেট বিষ আর ফেরত পাওয়া একটা পাঁচটাকার কয়েন।"

গ্রামে ঢোকার আগে পীরপালের ঢিবির বাঁকে সাইকেল থামাল সুখলাল। না-থামিয়ে উপায় নেই। চঞ্চলের বাঁশির সুর কানে আসছে। সাইকেল স্ট্যান্ড করে একটু এগিয়ে গেল। এখান থেকে থেকে হাত কুড়ি এগিয়ে গেলেই ইছামতী নদী। কয়েকদিনের টিপটিপ বৃষ্টি থেমেছে। এখন গনগনে রোদে যেন সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। ইছামতী নদীর পাড়ে কুলেখাড়ার ঝোপ। পাতার আড়ালে তাদের তীক্ষ্ণ কাঁটা। ঝিপঝিপ বৃষ্টি ছাড়া এবার তেমন বৃষ্টি হয়নি। ফলে এই বর্ষা কালেও নদী শুকনো। গরু চুরি গেলে যেমন খাঁ-খাঁ করে গোয়াল, ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে নদীটা চুরি গেছে। ফেলে গেছে এই খাদ। একটা লিকলিকে ভেমটা সাপ পাড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চলে গেল আরও গভীর জঙ্গলে। বর্ষার জল পেয়ে আগাছাগুলোর এখন দেমাক দেখানোর সময়। তিন-চার হাত উঁচু কিছু ওলট কম্বলের গাছ জঙ্গলের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছের আছে বিরাট দুঃখ, তার গুণের কথা সহজে জানতে পারে না মানুষ। গুণের কথা জানত কিছু বনবাসী মানুষ। জঙ্গলে মাথা তুলেছে কিছু আছড়গোটা গাছ। তার কোঁকড়ানো পাতা হলদে ফুলের চারপাশে কিছু ফড়িং উড়ছে। তিনটে ছাগল খসমস করে ঘাস চিবুচ্ছে। আর কেউ নেই। তবু ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ ছোট করে চারদিক দেখল সুখলাল। না, তবু চোখে পড়ছে না।

সুখলাল বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "চঞ্চল, কোথায় রে তুই?"

বারতিনেক ডাকার পর সুখলাল দেখতে পেল, পুবের ইউক্যালিপটাস গাছটার পাশ দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা ঢালু রাস্তা বেয়ে জলের মতো নেমে আসছে চঞ্চল। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, গলায় গামছা। হাতে বাঁশি।

সুখলালের সামনে এসে দাঁড়াল চঞ্চল, "আজ চদরবদর নিয়ে যাননি?"

"না।"

"ক্যান?"

"ইঁদুরের অত্যাচার! পুতুলগুলোকে অতিষ্ঠ করে তুলিচে। তাই আজ হাট থেকে বিষ নিয়ে আসিচি।"

চঞ্চল মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইঁদুরটাকে মেরে দিবেন? আবার আমার গানও শুনবেন? পারবেন?" একটু থেমে চঞ্চল যোগ করল, "আজ আমি যাই।"

কথাটুকু বুকের ভিতরে তিরের ফলার মতো বিঁধল সুখলালের। চঞ্চলের কাঁধে হাত রেখে মাথা নামিয়ে নিল সুখলাল।

"তুমি পারবে না সুখলাল কাকা! আমি তোমায় চিনি। তুমি পারবা না। আজ গান থাক তুমি যাও। অন্যদিন গান শুনবে খন।" কথা শেষ করে চঞ্চল আবার আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকার পর সুখলাল চলল তার ঘরের দিকে।

তিন

পুতুলরা আজ রাতে ঠিক করেছে ঘুমোবে না। সারারাত জেগে থাকবে। তাদের চায়, সুখলাল যেন আজ রাতেই ইঁদুরটাকে শেষ করে দেয়।

সুখলাল ঘরের মেঝেয় থেবড়ে বসে আছে। তার ডান হাতের মুঠোয় চাল, বাঁ হাতে বিষের প্যাকেট। দুটো মিশিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঘরে সামান্যই চাল পড়ে ছিল।

পুতুলরা চাপা ফিসফাস শুরু করেছে। কিছু কথা বড়ই কানে এসে ধাক্কা দিচ্ছে, "এত দেরি করছে কেন লোকটা!"

সুখলালের মনে পড়ছে চঞ্চলের কথা। ছেলেটা সারাদিন নদীর পাড়ে বসে থাকে। সে নাকি এই নদী থেকেই সুর পায়। গানের কথা ভেসে আসে নদীতে। চঞ্চলের কাজ করে যাত্রাদলে। বিবেক সাজে।

সুখলাল চাল মেঝেতে রেখে বিষের প্যাকেট খুলবার সময় শুনতে পায় এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। অবাক চোখে তাকায় সামনে। লণ্ঠনের নিবুনিবু আলোয় দেখতে পায়, একটা ইঁদুর এসে বসেছে তার সামনে। সেই ইঁদুরটা ফিসফিস করে বলছে, "মাঠ ফাঁকা বলেই তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। ধানে সোনা রঙ ধরলেই আমি চলে যাব মাঠে। নবান্ন অবধি বাঁচিয়ে রাখো আমায়। আমি তোমার অতিথি।"

পুতুলরা চিৎকার করে ওঠে, "ইঁদুরটার কথা শুনবে না। আমাদের শেষ করে দেবে। শুধু চদরবদর নয়, একদিন তোমার সারেঙ্গিটা খেয়ে নেবে। ভুলে যেও না তুমি নিজেও একজন পুতুল।"

সুখলাল চুপ করে থাকে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে। কাঞ্চন ফুলের জোড়া পাতা মেলার সময় এখন। দুধ সাদা কাঞ্চন ফুলে ভরে উঠেছে উঠোনের গাছটা। এ সময় পৃথিবীতে পাপধোয়া আলো আসে। সে আলোতে জীবনকে স্নান করাতে হয়। শুরু হয় দিন। জন্মাবে অজস্র কিস্‌সা।

ইঁদুরটা একমনে মেঝে থেকে একটা একটা করে চাল খুঁটে খাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুখলাল। তার হাতে থাকা বিষের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় দূরের এক ঝোপে। ঠিক তখনই সুখলালের কানে ভেসে আসে বনটিয়ার কিচিরমিচির।

অঙ্কন: অসীম হালদার

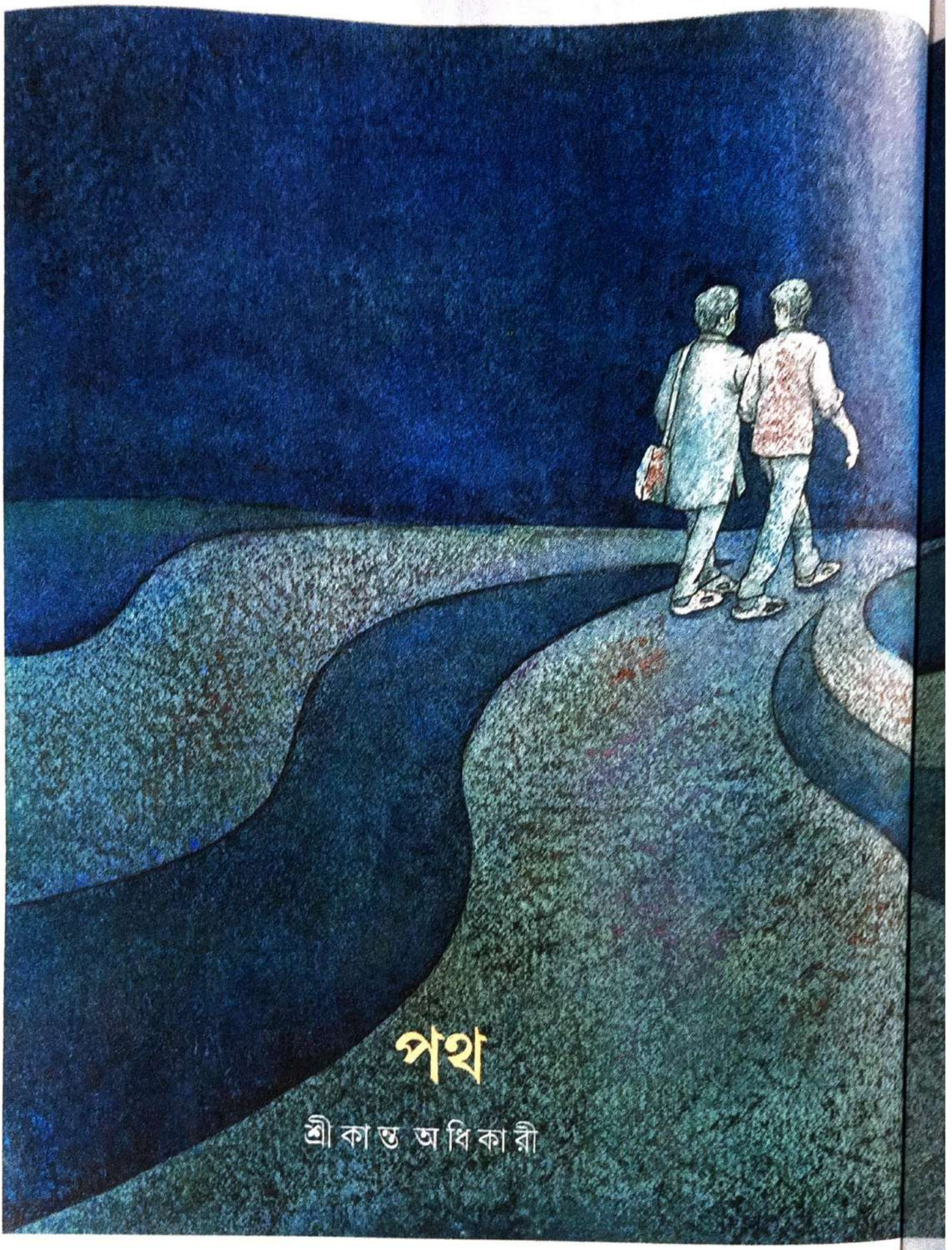

পথ

শ্রীকান্ত অধিকারী

বেঁটে, কালো এবং মোটা। অদ্ভুত দর্শনের লোকটা এখনও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। দিনের আলো প্রায় নিভুনিভু। সেই নিভন্ত আবছা আলোয় লোকটার নড়াচড়া আন্দাজ করা গেলেও, চোখ দুটো ভাল ভাবে নজর হয় না। তাঁর দৃষ্টির সঞ্চালনও আমার দৃষ্টির বাইরে। লোকটা কি বদ মতলবের ঘুটি সাজাচ্ছে? অনুমান করাও কঠিন। অথচ লোকটা আর আমি ছাড়া কেউ নেই এখানে।

থাকার মধ্যে তেখোচা মার্কা পথ। মাঝে ফাঁকা কিছুটা জায়গা। যেখানে যত শুচ্ছের আবর্জনা গাদ হয়ে ছোটখাটো দুর্গন্ধময় পাহাড় তৈরি হয়েছে। সেই পাহাড়ের চুড়োয় রহস্যজনক ভাবে একটা লাইট পোস্ট আছে বটে, তাতে কোনও বাতির ব্যবস্থা নেই। আর সেখানেই লোকটা দাঁড়িয়ে উসখুস করছে। পেছনে কাঁটাঝোপের জঙ্গল। তার আড়ালে জলহীন বালুহীন খদে ভরা নদী। নদীর মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে ব্রিটিশ আমলের রেললাইন। ওপারে নন্দীকেশ্বরী মহাসতীপীঠ। শান্ত জনপদ। যে জনপদ প্রাচীন কাল থেকে কত মহা ঘটনার সাক্ষী হয়ে এখনও বিদ্যমান। দুই হাত জড়ো করে এক বার কপালে ঠেকিয়ে আড় চোখে কিম্ভূত লোকটাকে দেখে নিলাম।

অনাদিন বাড়ি ফেরার জন্য শেষ বাসটা পেয়েই যাই। আজ পিচকুরিঢালে সিগনাল না পাওয়ায় ট্রেন অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই যা হওয়ার হয়ে গেল। সাঁইথিয়া থেকে দুমকা যাওয়ার শেষ বাস পগারপার। কলকাতা বর্ধমান থেকে কাজ সেরে মানুষ বাড়ি ফেরে এই বাসের ভরসাতেই। স্টেশন থেকে নেমে একটু জোরে পা চালিয়ে ময়ূরাক্ষীর ব্রিজ পেরোলে আমাদের পথ। তখন যা-হোক কোনও বাস লরি কিংবা বাইক-টাইক পেলেও হুড়োহুড়ি কমে। কিন্তু আজ শুধু আমি আর ওই লোকটা।

ঝুপ করে চারপাশের আলো হারিয়ে যায়। বদলে অদূরে বিস্তৃত ধেনো মাঠ থেকে উড়ে আসা শিশিরভেজা ধানগাছের গন্ধ, আর দেহাতিদের ভৈষা-খাটাল থেকে আসা গোমূত্র মিশ্রিত গোবরের ঝাঁঝালো গন্ধ ঘোর নেশাখুরি আবেশ তৈরি করে। সেই অবসরে পথের ওপরে অদ্ভুত আঁধার লুটোপুটি খায়। কোনও স্থায়ী দোকান-পাটও নেই যে তারা আলো জ্বালিয়ে রাখবে। অন্তত কুপি-লম্ফ-হারিকেন-হ্যাজাক কিংবা হাল আমলের অন্য কিছু। ময়ূরাক্ষীর মরা গহ্বর থেকে হা-হা করে শীতের শিরশিরে হাওয়া শরীরের ভেতর পর্যন্ত ফুঁড়ে দেয়। মাফলারটা ভাল করে কানে মাথায় জড়িয়ে আড় চোখে আরও এক বার দেখে নিই লোকটাকে। ও কি এখনও আমার দিকে তাক করে আছে!

ওই দ্যাখো, কাজ নেই কম্ম নেই পাতলুন পাঞ্জাবি পরা লোকটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে! ব্যাপারখানা ভাল ঠেকছে না। সেই সন্ধের আগে থেকেই দেখছি। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়েই ছিল। এখন আবার আমার দিকে কেন! পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগটা চেপে ধরি। বেশি কিছু নেই, শ'দুয়েক টাকা হবে। তবে কোমরে মায়ের দেওয়া শ্যামচাঁদের সোনার মূর্তি রুপোর চেনে বাঁধা আছে। কিন্তু তাও তো আমার কাছে কম নয়। হাতের কাছে কোনও লাঠি বা ইট পাথর পেলাম না যে আত্মরক্ষা করব।

এমন অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়নি। গ্রামে থাকি বটে। মা ঠাকুমাদের কাছে ভূত দেখার বা ভূতের স্পর্শ পাওয়ার নানা রোমহর্ষক গল্প শুনেছি, কিন্তু স্ব-চোখে দেখিনি। ভূত না হয়ে ডাকাত লুটেরা, খুনি অথবা আরও কিছু হতেই পারে। নিজেকে কী ভাবে সামলাব, ভাবতে ভাবতে দেখি লোকটা আমার মুখের কাছে এসে হাজির। কে যেন খপ করে বুকের ভেতরটা খামচে ধরল। আর কিছু না পেয়ে নিজের ব্যাগটাকে চেপে ধরি। হঠাৎ মোলায়েম স্বরে বেঁটে-কালো লোকটা বলে, "কতি যাবা বড় ভা-ই?"

সাদা কাপড়ে কান-মাথা ঢাকা লোকটা হাসিমুখে আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। চোখে কোনও হিংসা বা ক্রূরতা নেই। শুধুই জিজ্ঞাসা। সাহস পেলাম। বললাম, "কী?"

ময়ূরাক্ষীর মরা গহ্বর থেকে হা-হা করে শীতের শিরশিরে হাওয়া শরীরের ভেতর পর্যন্ত ফুঁড়ে দেয়। মাফলারটা ভাল করে কানে-মাথায় জড়িয়ে আড় চোখে আরও এক বার দেখে নিই লোকটাকে।

লোকটা আবারও বলল, "কতি যাবা বড় ভাই? এখুন কি মহম্মদবাজার যাবার জন্যি বাস পাবা?"

"না। তুমি? তুমি কি মহম্মদবাজার যাবে?"

"যামু তো নাকপুর। তাপ্পর আল ধরে কোরোশ খানিক পার হলিই আল্লাদিচক। আমাদের গেরাম।"

"তবে ট্রেন থেকে নামলে কেন? ট্রেনেই তো সুবিধে হত। সোজা রামপুরহাট কিংবা লোহাপুর। তারপর অটো-টোটো কিছু একটা ধরলেই হত।"

"এই ঠিয়ে একখান কাজ পড়িছিল। সারতে সারতে ট্রেনটাও ফসকে যাবা, বুঝতেই পারি নাই। তা হোক-গা, বাসে করে মহম্মদবাজার, তা বাদে লরি-ফরি ধরে সোজা নাকপুর চেকপোস্ট। রাত হবে। হোক-গা। ঘর তো যেতে পারবু।"

"এখন তাহলে কী করবা? ঠুঁটো আঙুল চুষবা।"

আমার কথা শুনে গা ঝাঁকিয়ে খিক খিক করে হেসে ওঠে লোকটা। "তাই তো! যামু কুন বাগে?"

"কুন বাগে আবার মামুদবাজার বাগে। আমার বাড়ি। আমার বাড়িতেই রাতটুকুন পার করে দেবে। তাপ্পর না-হয় ভোর ভোর বাস ধরবে। কী নাম যেন তোমার?"

"রবি। যাবা কিসে?"

"হেঁটো।"

সেই শুরু। কথা বলতে বলতে কখন যে রাত আরও গভীর হয়, খেয়াল নেই। খেয়াল নেই অদূরে খেতের মাঝে মাঝে পাম্পসেটের ম্যাড়মেড়ে বাতিগুলো একটা দুটো করে কার্তিকের আকাশে সাঁঝবাতির মতো জ্বলে উঠছে। সামনে ছোট ছোট ঝোপঝাড়গুলো এখন এক-একটা জমাট বিভীষিকা। না কোনও ঝিঁঝি পোকার কিরিকিটি ডাক, না খসখস ঘুৎকার মকমক হিস-স-স, কোনও আওয়াজ নেই। নেই কোনও অন্য পশুর পাশবিক কাণ্ডকলাপ। এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য ছেয়ে আছে চারদিকে। কিছু দূর চলার পর হঠাৎ নৈশিক ঘোর ভেঙে কর্ণকুহর ভেদ করে ডেঙো শিয়ালের কোরাস চিৎকার—হু-ই-হুক-হু-ই-ই-ই!

রবি ভয় পায়। "কিসের ডাক ভাই?"

"শেয়ালের।"

"আমাদের মাঠেও তো শেয়াল আছে, কই এমন করে তো ডাকে না।"

"এরা নদীর শেয়াল। গর্ত থেকে খাবারের জন্য বেরিয়ে পড়ে। কনকনে শীতে ঠান্ডায় আরও জোরে জোরে চেল্লায়।"

অজানতে আমাদেরও পায়ের গতি বাড়ে। আসলে ওই ভূতুড়ে নির্জনতায় আমরা দু'জন কেউ আর বাসের বা অন্য কোনও যানের জন্য অপেক্ষা করার সাহস দেখাতে পারি না। জোরে পা চালালে বাড়ি পৌঁছোতে ঘণ্টা খানেক লাগবে। আমার সঙ্গীটির অবশ্য অচেনা-অজানা পথে চলতে অসুবিধা হচ্ছে, তবু প্রাণের মায়ায় আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটে। এত ক্ষণে রবি আর কিছু না-হোক, এটা বুঝে ফেলেছে যে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কিচ্ছু হবে না। অন্তত কোনও রকমে একটা আশ্রয়ে পৌঁছে গেলে কাল সকালে বাড়ি ফেরার জন্য একটা-না-একটা কিছু পেয়ে যাবে।

পথের দু'দিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। এমনিতে এই আশা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে ছিলাম যে, যেতে যেতে যে কোনও সময় একটা-না-একটা কিছু পেয়ে যাব। হাত তুলে দাঁড় করিয়ে আমাদের অবস্থা বলে লিফট চেয়ে নেব। কিন্তু যত পথ চলতে থাকি আর রাত যত গভীর হয়, এ-পর্যন্ত লরি বা প্রাইভেট ছোট গাড়ি তো ছাড়, ফিরতি পথের কোনও সাইকেল আরোহীর সঙ্গেও দেখা হল ন। অথচ শনি-মঙ্গল বার হলে, এত ক্ষণ পাল পাল যুতিবাঁধা গরু-মোষ নিয়ে মুখে টকটক করতে করতে পশ্চিমের পাইকাররা এই পথ ধরেই চলত।

সবে বাঘডোলা পেরিয়েছি, অকস্মাৎ দূর থেকে ভেসে আসে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটা নয় দুটো নয়, বেশ কয়েকটা। খট-খট খট-খট খট-খট! নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান। এদিকটায় ভারী ভারী পাথর বাঁধানো পথ। এই পথ যে কে তৈরি করেছিল, ইতিহাসই বলতে পারে। রাজা শশাঙ্ক কিংবা হুসেন শাহ। হয়তো পাল বা সেন রাজাদের কেউ। এখনও যে পাথর সেই পাথরই আছে। পথের কাঠামোর কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এত রাতে ঘোড়ার খুরের শব্দ কেন! চমকে দু'জনেই দু'জনার দিকে এগিয়ে আসি।

"ভাই!" পাশের জন হিসহিস করে।

যদিও এই মুহূর্তে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দে আমিও ভয় পেয়েছি, তবু ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বলি, "এখানে কেউ ঘোড়া কিনেছে বোধ হয়! রাতে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেরিয়েছে। আর যদি এদিক হয়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই। ভালই হবে। লিফট চেয়ে নেব। ঘোড়ায় চাপতে পারো তো হে রবি?"

আমরা খানিক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়াগুলো আসার অপেক্ষা করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর গোটা কয়েক উল্লুর ঘুৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। হয়তো ঘোড়াগুলো আর এদিকে আসবে না। আমরা আবার এগিয়ে চললাম। তবু মনের মধ্যে খটকা গেল না।

এই পথ আমার চেনা। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ধরে ধরে এগিয়ে গেলে শুধুই ইট ভাটার সারি। ছোট বড় বাংলা ভাটা, পাগ মিল কিংবা চিমনি ভাটার উঁচু উঁচু চিমনিগুলো মধ্যযুগের ভগ্ন খাদার মতো অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারই দু'একটার তলায় ক্ষীণ আলো কেঁপে কেঁপে আশপাশকে রহস্যময় করে তুলেছে। হঠাৎ দেখলে বুক কাঁপে। গলা দিয়ে অদ্ভুত স্বর বের করে রবি জানতে চাইল, "ও গুলো কী ভাই?"

"চিমনি।"

"অ্যাত্ত!"

দিনের বেলায় দেখলে বুঝতে পারতে কত ইটের ভাটা। আর কত লোক কাজ করে। ওই যে আলো জ্বলছে ওখানে, সব কাঁচা ইট সাজিয়ে ছোট ছোট ঘর বেঁধে ইটভাটার লেবাররা ছেলেপুলে নিয়ে থাকে।

আমাদের কথাবার্তার মাঝেই হঠাৎ খুব কাছ থেকেই আজান ভেসে আসে। বেশ অবাক হই।

বহুদিন থেকেই এ-দিকে আমার যাওয়া আসা, কিন্তু কোথাও তো মসজিদ দেখিনি। থাকবেই বা কী করে! এ-দিকে সে-রকম কোনও মুসলিম গ্রামই নেই। আছে ওই ভাঁড়কাটা সোঁৎসাল উসকা রাওতাড়া সেকেন্ডার দিকে। ওদিকের গোটা এলাকাটা এক কালে জৈন কিরাতগোষ্ঠীর বাস ছিল। এখন সবাই মুসলমান। কিন্তু সে-সব মুসলিম মানুষজন এই পথ থেকে অনেক দূরে থাকে। এপাশে ওপাশে মাইল দশেক তো হবেই। অন্তত এই পথের কাছাকাছি কোথাও কোনও মসজিদ নেই। তা হলে কি ইটভাটার মুসলিমরা টেম্পোরারি মসজিদ বানিয়ে ওদের মতো করে আল্লার গুণগান করে!

হঠাৎ পথের মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রবি। কিছু বুঝতে পারি না। পেচ্ছাপ করবে নাকি! খুব বিরক্ত হয়ে বললাম, "এই রাত বিরেতে খানিক চেপে রাখতে পারো না! ডাইবেটিস আছে! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে যতক্ষণ না পারছি মনে শান্তি নেই, বোঝো না!"

আমাকে কোনও উত্তর না দিয়ে রবি ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে হাত-পা-মুখ ধুয়ে পিচ ঢালা পথেই নামাজ পড়তে শুরু করে। আমি দেখেছি আমার স্কুলের মৌলবি সাহেবকে, তিনিও এমন ভাবেই স্কুলের বারান্দায় নামাজ পড়েন।

বুকটা ধক করে ওঠে। কে যেন ছিটকে ফেলে দিল ওর কাছ থেকে। রবি মুসলমান! কী বোকা আমি! এতক্ষণ পদবিটাই জিজ্ঞাসা করিনি। কপালে রসকলি আঁকা বাবার মুখ ভেসে ওঠে। একজন সৎ ব্রাহ্মণ। তাতে আবার বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী। সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। একশো আট বার করে তুলসীর মালা জপেন। হয়তো এখনও ঠাকুরঘরেই আছেন। সর্বনাশ! তখনই মনে পড়ে

এদিকটায় ভারী ভারী পাথর বাঁধানো পথ। এই পথ যে কে তৈরি করেছিল, ইতিহাসই বলতে পারে। রাজা শশাঙ্ক কিংবা হুসেন শাহ। হয়তো পাল বা সেন রাজাদের কেউ। এখনও যে পাথর সেই পাথরই আছে।

গেল, ঠাকুর ঘরে আমাদের সবাইকে বসিয়ে বাবা শ্লোক আওড়াচ্ছেন, "শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।/ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

ভয়ে গ্লানিতে মানসিক উচাটনে আমি তখন কাহিল। এই মুসলিম লোকটাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব! তারপর! মনের মধ্যে গভীর পাপবোধ তখন আমাকে ময়ালের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে। ঠায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয়, এক্ষুনি বিপথে জোলো ধানমাঠের আল ধরে দিই ছুট। কী করব খুঁজে পাচ্ছি না। এমন সময় লোকটা অতি শান্ত ভীতু স্বরে বলে, "বড় ভাই বড্ড দেরি করি দিইলাম। এইবার যাবা তো নাকি!"

হঠাৎ খুব কাছেই মরা হরতুকি গাছ থেকে একটা খটাস তীব্র বেগে নেমে, পথের ও-প্রান্তে ধান খেতের ভেতর ঢুকে পড়ে। রবি ভয়ে আমার দিকে এগোতেই ধমকে উঠি।

"দাঁড়াও! আগে দুটো হক কথা হোক," আমার গলার স্বর ভারী। "তুমি মোছলমান আগে বলোনি কেন? আর মোছলমান তো দাড়ি কই?"

আমার ধমকে রবি প্রথমে মাথা নুইয়ে দেয়। পরে খুব ঠান্ডা গলায় বলে, "সব মুসলমানকেই কি দাড়ি রাখতে হবে!"

"তবে তোমার আসল নাম কী?"

"বলেছি তো, রবি।"

"আহ! পুরো নাম?"

"রবিউল মল্লিক। বিড়ির ব্যবসা করি। আপনার?"

"আমার জেনে কী হবে?"

"তাই তো! আমি তো আপনার বাড়িই যাবু।"

"হা কালাচাঁদ! এইবার আমি কী করি! তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই কী করে রবিউল! বাড়িতে কালাচাঁদ ঠাকুর আছে। হিঁদু ধর্মের আচার আছে। নিয়ে গেলে তোমাকে তো বার করে দেবেই, আমাকেও ঘরে রাখবে না।"

"থাইলে এক কাজ করেন। আপনি চল্যে যান। আমি ওই ইটভাটায় যাই। ছিদিম খানিক রাইত ঠিক পার করে দিবু।"

"ইটভাটায় ওদের নিজেদেরই থাকার ঠাঁই নেই। হাঁসের হুদরোর মতো সব খোপ। তুমি মানুষ না অন্য কিছু। এতটা পথ এক সঙ্গে এলাম, এখন তোমাকে ছেড়ে দিই মাঝ পথে! আমাকে কী ভাবো তুমি!"

ততক্ষণে আমার মাথার মধ্যে এক আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। আবার জিজ্ঞাসা করি, "কী নাম বললে?"

"রবিউল। রবিউল মল্লিক।"

"উঁ! আবার রবিউল? রবিই ঠিক আছে। রবীন্দ্র মল্লিক। ভুলেও মুখে আনবে না তোমার আসল নাম।"

"ইয়ে, মানে বাপেই নাম রেখেছে। সেটা কি ফেল্যে দাবা?"

"আমার বাপের কথাটাও চিন্তা করতে হবে তো। চল জলদি জলদি পা চালাও।"

হাঁটলে পথ শেষ হয়। আমাদেরও এক সময় শেষ হয়। সপ্তাহান্তে বাড়ি ফেরার আনন্দে মনেই থাকে না যে, কত পথ হাঁটলাম। কত ঝোপ জঙ্গল ক্যানেল পোড়ো দোকানের কঙ্কাল, শুনলাম কত শেয়াল বনবিড়াল আর খটাসের ভয়ার্ত ডাক! কিংবা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ! কত বুক দুরুদুরু মুহূর্ত আর কত ফেলাঝোলা কথামালা!

কিন্তু হঠাৎ অনুভব করি, পথ ফুরোনোর আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বুকে একটা দলা এসে চেপে ধরতে শুরু করেছে। যদি ধরা পড়ে যাই। বাবার চোখে ফাঁকি!

দরজা খুলতেই মায়ের এক রাশ খুশি আমাদের চোখে মুখে উছলে এল। "এত দেরি! বাস ছিল না বুঝি। এলি কিসে?"

"হেঁটে।"

"এ কে, তোর বন্ধু?"

"আমার বন্ধু, রবি।"

"এসো বাবা, তোমরা হাত পা ধুয়ে ঘরে বোসো।"

অদ্ভুত এক অস্থিরতার মধ্যে থাকলে বোধ হয় হাত পা ঠিকঠাক চলে না। গতি থেমে যায়। মনে হয় কারও দ্বারা চালিত হয়ে প্রতিটি কাজ সারছি। বাথরুম করা, হাত-পা ধোয়া, গামছাতে মুখ মোছা এ-সবই যেন অনেক সময়ের ব্যাপার। কোনও দিন শেষ হবে না।

এখনও বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি। অর্থাৎ বাবা হয় ঠাকুর ঘরে না-হয় মহাভারত কিংবা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিয়ে বসে আছেন। মনে পড়ল শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু তো জাতপাত মানতেন না। যবন ম্লেচ্ছ অহিন্দু চণ্ডাল সবাই তাঁর চোখে সমান।

"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥"

আমার ঘরে ঢুকে যখন এই সব চিন্তা করছি, তখনই বাবা এসে হাসি মুখে শোধালেন, "তোমরা ওই পনেরো কিলোমিটার পথ শুধুমাত্র দু'জনেই হেঁটে এসেছ, না সঙ্গে আরও কেউ ছিল?"

আমাদের কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাবা বলে, "অবশ্য অন্য কোনও উপায়ও নেই। আমাদের পথ একটাই। বহু প্রাচীন এই পথ। পশ্চিমে গেলে দুমকা, পুবে সোজা কাটোয়া নবদ্বীপ। তার আগে পাচুণ্ডির কাছে উত্তর বাঁকে একটু এগোলেই উদ্ধারণপুর। সাধক অবধূতের উদ্ধারণপুর। শুনেছি আমার দাদু ঠাকুমারা তখন হেঁটে হেঁটে এই পথ দিয়ে উদ্ধারণপুরের ঘাটে যেতেন গঙ্গাস্নান করতে। আবার এই পথ দিয়েই মহাপ্রভু গিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডে। মহাবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

'সুপ্রশস্ত পথ ছাড়ি উপপথে যায়।
ঝারিখণ্ডের পথে চলে লোকের বিস্ময়।'

বাবা দুই হাত তুলে ধ্বনি তোলে, "জয় শ্রীশ্রী মহাপ্রভু! নিতাই নিতাই! এই পথের অনেক মাহাত্ম্য আছে বাবা। বীরভূমের পেট চেরা এই পথেই নাকি নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর সহচর শ্রী নিত্যানন্দ গৃহে ফিরেছিলেন। আর তাতেই গৌর ভাবে ডুব দিয়েছিলেন গাঙ্গেয় সমভূমির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-পশ্চিমবঙ্গের সারা পার্বত্যভূমি।

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাও গৌড়দেশে
অনর্গল প্রেমভক্তি করহ প্রকাশে।"

পাঁচশো বছর আগে, এক দিকে নদিয়ার পথ-ঘাট ধন্য হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদরজে আর বীরভূমের জনপদ কৃতার্থ হয়েছিল শ্রীনিত্যানন্দের দীর্ঘ পরিক্রমায়।

বাবা যেন সেই আবহমান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চড়ে বসেছে। ছুটে চলেছে কোনও অতীতের দিকে।

"এই পথেই দ্বাদশ জৈন তীর্থঙ্কর শ্রী বাসুপুজ্য এবং পরে মহাবীর বিহার থেকে জঙ্গলে ঢাকা বঙ্গের প্রাচীন কামকোটির চতুর্দিকে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা এই পথ তার সাক্ষী। বুঝলে বাবা অনেক পরে বখতিয়ার খলজি ঘোড়ায় চড়ে সেই বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে নদিয়া জয় করতে আসে এই পথ ধরেই। তারপর এই এলাকার চারপাশ থেকে নদিয়ায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা, সে এক অন্য গল্প। মহম্মদবাজার নামই তো হয়েছে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নামে। বাংলার ইতিহাস ঘাঁটলে সব পাবে। বর্গিরাও বীরভূম বর্ধমানের সর্বনাশ করতে এই পথই বেছে নিয়েছিল। আরও কত মহাজনের পদধূলি পড়েছিল, কে জানে। আজ তোমাদেরও পড়েছে। আসলে এই পথ তো সবার। চলমান পথিকের।

বাবা চুপ। আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। যেন আমরাই ইতিহাসের পাতা। বাবা পড়ছে।

"পা তুলে বোসো। আরাম পাবে," বাবা রবিউলকে বলে, "নাম কী তোমার বাবা? বাড়ি?"

এই ভয়টায় করছিলাম। বাবা কথার মাঝে ঠিক কথা খুঁজে নেয়। রবিউল শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আমি দ্রুত বলি, "ও রবি। রবীন্দ্র মল্লিক।"

"রবীন্দ্র নাথ না শেখর?"

"শুধু রবীন্দ্র। ওর বাড়ি ..."

রবিউল উত্তর দেয়, "আল্লাদিচক। নাকপুরের কাছে।"

"বাবা কী করেন?"

এই রে! ওদের যে বিড়ির ব্যবসা। আর রবিউল সেই ব্যবসাই করে। আমার বারবারই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ফাঁস করে দেয় ওর ঠিকুজি-কোষ্ঠী।

কিন্তু বিপদতারিণী হয়ে মা এসে দাঁড়ায়। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলে, "এসো বাবা রবি, চাট্টি খেয়ে নাও।" আমি নিঃশব্দে বাবাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলে রবিউলও আমাকে অনুসরণ করে।

রান্নাঘরের শান বাঁধানো মেঝেতে চারটে আসন পাতা। তার মানে বাবাও খায়নি। কিন্তু বাবা মা রবিউলের পাশে বসে খাবে! না-জেনে হয়তো খেয়ে নেবে। কিন্তু যদি কোনও দিন জানতে পারে! তখন! অনেকগুলো 'কিন্তু' যখন আমার ঘাড়ে চেপে বসে, দেখি বাবা রান্নাঘর থেকে একটা একটা করে সাজানো থালাগুলো আমাদের সামনে এনে রাখে। তারপর শুরু করে রবিউলের সঙ্গে গল্প। বাড়ি-ঘর পথ-ঘাট, চাষ-বাস, কলাই-ডাল, মুলো-আলু, বিখ্যাত গরুর হাটের কথা, রেল লাইন, কলেজ এই সব। রবিউলের টেনেটেনে বলার প্রসঙ্গ। কিন্তু আমি ভয়ে মরি, এই বুঝি বাপের কথা বাড়ির কথা ব্যবসার কথা তুলে রবিউল কোনও ফাঁকে আল্লা না বলে ফেলে। চরম উৎকণ্ঠায় দু'মুঠো খেয়ে নিয়ে মাকে বলি, "খুব ঘুম পেয়েছে মা, কাল কথা হবে।"

কিন্তু যেখানে ভূতের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। দেখি বাবা মশারির দড়ি বাঁধছে। আমাকে দেখে বলে, "দু'জনের বিছানা তো তাই বিছানা পেতে মশারিটা খাটিয়ে দিলাম। এ বার তোরা নিশ্চিন্তে ঘুমো।

বাবা চলে গেল। পরম স্বস্তিতে চোখ দুটো ঝুলে পড়ছে।

ঘুমের একটা জাদুশক্তি আছে। এক বার যদি সব দুশ্চিন্তাগুলোকে আচ্ছন্ন করে নিজের গহ্বরে শুষে নেয়, তখন আমাদের ভাবনা থাকে না। কিন্তু কাজটা হয়ে ওঠা খুব সোজা নয়! তবু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, উঠলাম একটা আওয়াজ শুনে। রবিউল নামাজ পড়ছে।

শীতল বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ছে। সঙ্গে পাতলা হয়ে আসা অন্ধকার। এবার আলো ফুটবে। আর কিছুক্ষণ! তারপরে বাসস্ট্যান্ডে ওকে বাস ধরিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তখন আমাকে ধরে কে! দ্রুত রেডি হয়ে রবিউলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, দেখি মা-বাবা দু'জনেই দাঁড়িয়ে।

মা রবিউলকে বলে, "ঘুম হয়েছিল বাবা? কাল তো তেমন কিছু করে দিতে পারি নাই, আজ একটু বসে খেয়ে যাও।"

মা কেন বোঝে না, এই মুসলমানটার এ-ঘর থেকে দ্রুত চলে যাওয়াতেই আমাদের সবার মঙ্গল। বলতেই হল, "আবার এ-সব কেন? এখান থেকে বাসস্ট্যান্ড যেতে হবে। দেরি হয়ে যাবে।"

"তুই চিন্তা করিস না, বাবা বংশীকাকাকে বলে দিয়েছে। টোটো নিয়ে এলো বলি।"

রবিউল দেখে ওর সামনে নামানো গরম গরম লুচি, আলুর দম আর এক জামবাটি সেমাইয়ের পায়েস! অদ্ভুত এক আবেশ ওর চোখে মুখে।

খেতে বসে রবিউলের হাত কিছুতেই মুখে ওঠে না। বারবার সামনে বসে থাকা দুই বৃদ্ধ

রান্নাঘরের শান বাঁধানো মেঝেতে চারটে আসন পাতা। তার মানে বাবাও খায়নি। কিন্তু বাবা মা রবিউলের পাশে বসে খাবে! না-জেনে হয়তো খেয়ে নেবে। কিন্তু যদি কোনও দিন জানতে পারে! তখন!

মানুষকে দেখে চোখ স্থির হয়ে যায়। অপরিসীম ভালবাসা না থাকলে, রাত থেকে উঠে এক অপরিচিতের জন্য এত কিছুর ব্যবস্থা কেউ করে দিতে পারে! অথচ সেই কাল থেকে এদের সঙ্গে কী মিথ্যাচারটাই করে যাচ্ছে। আল্লাতালা সব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু মিথ্যাচার! মিথ্যাচার তো গুনাহ! সে তো জাহান্নামের পথে নামায় ! রবিউলের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

মা এমনিতেই দুর্বল চিত্তের। কারও কান্না দেখতে পারে না। এই বুঝি মা কেঁদে ফেলল! তারপর একটা কেয়স। ব্যস! সেই আবেগের স্রোতে রবিউল চুপ থাকার শপথ ভেঙে ফেলবে। আর এতক্ষণের প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভেস্তে যাবে। খুব ভয় পেয়ে রবিউল এবার মাকে কিছু বলতে না দিয়ে আর-একটা মিথ্যা কথা বলে ফেললাম, "ওর মা নেই তো, তাই তোমাকে দেখে ওর মায়ের কথা মনে পড়ছে।"

রবিউল উঠে যেতেই বাবা জলের ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, "পা টিপে টিপে এসো বাবা, কাঁকুরে মাটি তো হোঁচট খেতে পার।" অন্য দিন যে বাবা হাতে জল দেয় না, কিংবা মা খেতে দেয় না তা নয়, আজ যেন আমার সব কিছুই অতিরিক্ত লাগছে। কেন যে এরা এত আদিখ্যেতা করছে। কেবলই মনে হয়, কেন তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি না।

প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে বলি, "এবার তো চল রবি।"

রবিউল আমার দিকে একবার তাকাল। তার পর, কাছে এসে ধীরে ধীরে বলল, "চলুন।"

এতক্ষণে ক্ষণিকের জন্য হলেও ওর চোখ দুটো দেখলাম, কী সুন্দর! কৃষ্ণ কালো। পুরুষ মানুষের এমন চোখ আগে দেখিনি। সেই চোখ ভিজে।

হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে রবিউল মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। মা ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে, "আমাকে নয় বাবা, ওই যে উনি ওই কালাচাঁদ, যে তোমাকে এখানে এনেছেন, ওঁকে প্রণাম করো। তোমার মঙ্গল হবে।"

এইবার একটা গোলমাল হবেই। ও কি আমাদের কালাচাঁদকে প্রণাম করবে? মাকেও কিছু বলার নেই। কেন যে নিজের মতো সবাইকে ভাবে। যাকে চেনে না জানে না তাকে কী হিসেবে ঠাকুর ঘরে যেতে বলে!

আমি যখন অজানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত, অবিশ্বাস্য হলেও দেখলাম আমার মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদছে রবিউল। গোটা শরীর নরম হয়ে গলে যাচ্ছে।

বাইরে বাবা ডাকে, "হল রে।"

মাঝে মাঝে বংশীকাকা, "কই গো এসো বাবুরা।"

আমি মাঝ উঠোনে। তখনও দু'-একটা তারা পশ্চিম আকাশে অস্তাচলের পথে।

রবিউলের গলে যাওয়া শরীরটাকে শিশুর মতো বুকে জড়িয়ে ধরে মা বলে, "এই টিফিন কোটোটা রাখো। বাড়ি যেতে দেরি হবে। সময় করে পথে খেয়ে নিয়ো। আর এই নাও, তোমার টুপি। শোওয়ার ঘরে পড়ে ছিল। বড় পবিত্র জিনিস। ভাল করে গুছিয়ে রেখো। আমাদের পথ আলাদা হতে পারে বাবা, কিন্তু পৌঁছোব সেই এক জায়গায়। আবার এসো। জয়গুরু জয়গুরু!"

অঙ্কন: সুমন পাল

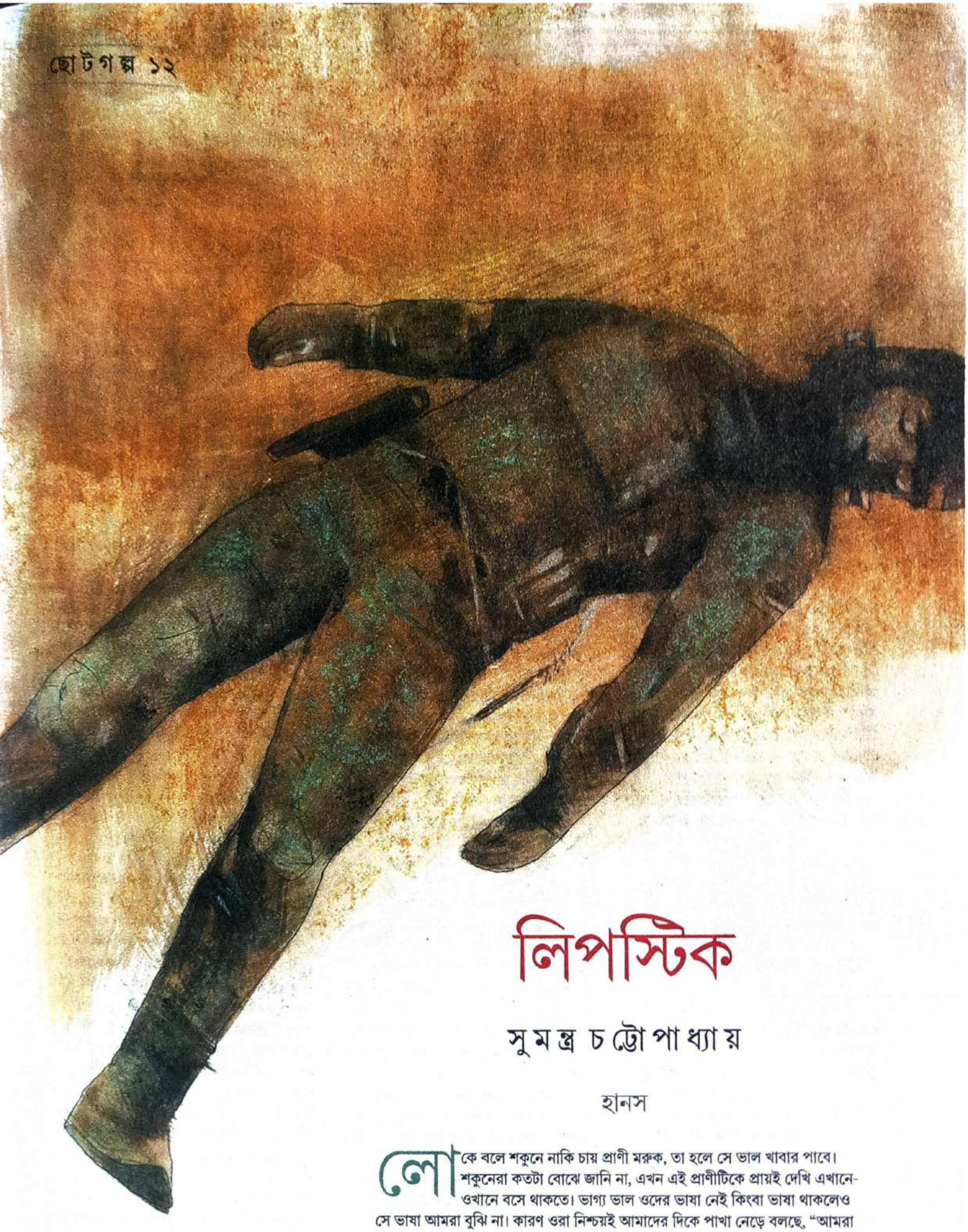

লিপস্টিক

সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়

হানস

লোকে বলে শকুনে নাকি চায় প্রাণী মরুক, তা হলে সে ভাল খাবার পাবে। শকুনেরা কতটা বোঝে জানি না, এখন এই প্রাণীটিকে প্রায়ই দেখি এখানে-ওখানে বসে থাকতে। ভাগ্য ভাল ওদের ভাষা নেই কিংবা ভাষা থাকলেও সে ভাষা আমরা বুঝি না। কারণ ওরা নিশ্চয়ই আমাদের দিকে পাখা নেড়ে বলছে, "আমরা আর কোন ছাড়, মানুষকে দেখ, অনেক শেখার আছে ওদের থেকে।" কাল বিকেলে আমার

বাড়ির সামনেই একজন সৈন্যের দেহ পড়েছিল। কিছু লোক হাতড়াচ্ছিল তার পকেট, তার সঙ্গে থাকা রাকস্যাক। এ দৃশ্য যে একেবারে অদেখা তা নয়, তবে একটা বড় তফাত হয়ে গিয়েছে। আগে লোকে খাবারদাবারের সঙ্গে নিয়ে যেত পাশে পড়ে থাকা ভাল বন্দুক ও কার্তুজ। এখন সেসব কেউ ছুঁয়েও দেখে না। শুধু পাগলের মতো খাবার খোঁজে।

বন্দুকের ব্যবহার তা বলে ফুরিয়ে যায়নি। এই তো কালকের ঘটনাটাই বলি যেটা বলছিলাম। ভাল করে খুঁজেও তো ছেলে দুটো কোনও খাবার পেল না। পেল একটা সিগারেটের প্যাকেট, তাতে গোটাকয়েক সিগারেট রয়েছে, আর একটা লাইটার। এ বস্তুটিও এখন মহার্ঘ। দু'টি ছেলে দু'টি সিগারেট ধরিয়ে চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার আগে অবশ্য কোনও খাবার না পাওয়ার আক্রোশে মৃত সেনার দেহে দু'জন দুটো বেদম লাথি মেরেছে। তাতে দেহটা এমন একটা বিচিত্র ভঙ্গি নিয়েছে যেন মনে হচ্ছে কোনও ব্যালেরিনা নাচছে মাটিতে শুয়ে। তা এই দু'জন কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর একজনের চোখে পড়ল একটা টিফিন বাক্স। চোখে না পড়লেই অবশ্য তার পক্ষে ভাল ছিল। সেটা তুলে দেখা গেল খানিকটা চিজ্ জাতীয় কিছু আছে। আসলে সেনার খোলা ব্যাগ থেকে ছিটকে পড়েছিল কৌটোটা। সেটা খুলে দেখামাত্র দু'জনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। তারপরে হাতাহাতি। যে কৌটোটা পেয়েছে সে বেশি বলবান। কাজেই কৌটোর দখল সে ছাড়বে না। তার থেকে কৌটো কাড়তে পারল না তার বন্ধু। সে কৌটোটা নিয়ে দৌড় দিল। তবে বেশি দূর যেতে পারল না। মাথায় গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। সেনার বন্দুকটা তুলে নিয়ে কাজটা করেছে তার 'বন্ধু'। তখনও সে চিজ্ঞের কৌটোটা আঁকড়ে ধরে আছে। সেই বন্ধু বন্দুক ফেলে দিয়ে মৃতর হাত থেকে কৌটো ছাড়িয়ে নিল। তারপর ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগল নিজের বাড়ির দিকে। আর আমার ছাত থেকে নেমে এল চারটে শকুন। তাদের মধ্য কোনও বিবাদের ব্যাপার নেই, দুটো বসল সেনার দেহের পাশে আর দুটো সঙ্গ দিল এক কৌটো চিজ্ঞের জন্য 'শহিদ' হওয়া ছেলেটির দেহে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মরা সৈন্যের পকেট হাতড়ে খাবারের স্ট্যাম্প পাওয়া যেত। তাতে অনেক কিছু পাওয়া যায়। সাধারণ লোক যা পায় তার অনেক বেশি। এই যেমন সাধারণ নাগরিকের বরাদ্দ সপ্তাহে আড়াইশো গ্রাম মাংস আর সেনার স্ট্যাম্প থাকলে সেটা এক কেজির কাছাকাছি। দুধ অবশ্য বহুকাল চোখেই দেখেনি কেউ।

একদিন আমার কাজের জায়গায় সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ কয়েকটি খাবারের স্ট্যাম্প এনে আমার হাতে দিল আমার ঊর্ধ্বতন। বলল, "অনেক কাজ করেছ, এবার বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভাল করে খাওয়াদাওয়া করো।"

বললাম, "আমার কাজ পছন্দ হচ্ছে না, তাই তো? সোজাসুজি বলে দিন। কাল থেকে আর কাজে আসব না। এভাবে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন কেন?"

"মৃত্যুদণ্ড!" বস তো অবাক।

"তা ছাড়া কী! এই স্ট্যাম্প নিয়ে আমি খাবারের দোকানে গেলে আমার পরিচয়পত্র চাইবে, আর যখন দেখবে আমি সেনাবাহিনীর কেউ নই, ব্যাঙ্কের কেরানি, তখন সোজা ফায়ারিং স্কোয়াড।"

বস আমার দিকে সে কথা শুনে এমন চোখে তাকালেন যেন অফিসে একটা ঘেয়ো কুকুর ঢুকে পড়েছে। তাঁর আর কথা বলতেও ইচ্ছে করল না। এমিলের দিকে হাতের একটা ইশারা করে দরজা ঠেলে নিজের চেম্বারে ঢুকে গেলেন। এমিল হল বসের অলিখিত পার্সোনাল সেক্রেটারি। সে আমাকে নিয়ে বাইরে এল।

চাপা গলায় ভর্ৎসনা করে বলল, "তুই কি আর কোনওদিন মানুষ হবি না!"

যুদ্ধের সময়ে যা সামরিক আইন তার কথা বলেছি, এতে অমানুষের কী হল কী করে জানব? জানি যা বলার ও-ই বলবে, তাই চুপ থাকলাম।

"স্প্যান্ডাউতে চলে যাস। ওখানে কয়েকটা ঠেক আছে, তোকে বলে দেব। সেখানে সেনার স্ট্যাম্প দেখলে তোকে রাজার মতো আদর করে খাওয়াবে। এমন একটা বেআক্কেলে বান্ধবী বানিয়েছিস, তোর আর কিছু হল না!"

'বেআক্কেলে বান্ধবী' মানে আমার বান্ধবী এমা। যুদ্ধের আগে সে এক স্কুলে পড়াত যার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন জন কাপলান নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ইহুদি। যুদ্ধ শুরুর আগেই সে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। এমা তখন স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে কাগজে একটা চিঠি লিখেছিল। খুবই ছোট অকিঞ্চিৎকর একটা কাগজে। সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য, বড় কাগজে সে চিঠি ছাপত না। কিন্তু তাতেই যা হওয়ার হয়ে গেল। এমার বাবার সরকারি ভাতা বন্ধ হয়ে গেল, প্লুরিসি হয়ে মা মারা গেলেন কারণ হাসপাতাল জানিয়ে দিল কোনও সিট খালি নেই, আর হঠাৎ বার্লিন পুরসভা আবিষ্কার করে বসল যে তাদের বাড়ির এত ট্যাক্স বাকি যে বাড়িটা বিক্রি করে দিলেও তা দেওয়া হয়ে উঠবে না। আর অবশ্যই অনেকের কাছে সে হয়ে দাঁড়াল বেআক্কেলে, ইহুদিপ্রেমী, চরিত্রহীন ইত্যাদি ইত্যাদি। জনৈক ব্যক্তি তো উঠে পড়ে লেগেছিলেন প্রমাণ করতে এমা তার বাবা-মায়ের মেয়েই নয়, তাকে বিশেষ জায়গা থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিল, সে আসলে ইহুদিদের নামগোত্রহীন সন্তান। কিছু প্রমাণ অবশ্যই করতে পারেননি তিনি কিন্তু সরকারের ধামাধরা কাগজগুলো বেশ জ্বালিয়েছিল সেটা মনে আছে, আর আমি আমার বিশেষ কিছু যোগাযোগ ব্যবহার করে খানিক প্রভাব খাটাতে না পারলে নিঃসন্দেহে এমাকে ইহুদি প্রমাণ করে জামাকাপড় খুলে স্নানাগারে দাঁড় করিয়ে দিত, যে-স্নানাগারের শাওয়ার থেকে জল বেরোয় না, বেরোয় জুক্লোন-বি।

এমা

আজ সাত দিন হল হানসের সঙ্গে দেখা হয়নি। ওর জন্য খুব চিন্তা হয়। আগে হলে ফোন করা যেত। এখন বাড়ির ফোন কাজ করার প্রশ্নই আসে না। ফোনের পোস্টগুলোই নেই তো ফোন আর কী কাজ করবে? সরকারি দপ্তর অবশ্য কোনও ভাবে পরিষেবা চালু রেখেছে। হানসের ব্যাঙ্কেও ফোন আছে কিন্তু করব কোথা থেকে? আর আরও মুশকিল হল এখন সবাই জানে সব ফোনেই আড়ি পাতা হয়। আর এরা কোন কথার যে কী মানে করবে তা কেউ জানে না। আমার এক বান্ধবী হেলগা তার বয়ফ্রেন্ডকে বলেছিল, 'আর বেশিদিন লাগবে না, এবার যুদ্ধ থেমে যাবে'। তারিখটা ছিল ১৬ এপ্রিল। বেচারার কপাল পোড়া। তার আগে বেশ কয়েকদিন রুশ সেনারা বার্লিন থেকে অনেক দূরে ঘাঁটি গেড়ে থাকলেও আক্রমণ থামিয়ে বসে ছিল। আর সেই দিনই দু' দিক থেকে তারা আক্রমণ শুরু করল। ব্যস আর যায় কোথায়! দুই আর দুই বাইশ করে ফেলল সমর অফিস, রাতেই হেলগাকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হল, বলা হল সে রুশ গুপ্তচর তাই জানত যে সেদিনই আক্রমণ শুরু হবে আর যুদ্ধের বেশিদিন বাকি নেই কথাটা তাই বলেছিল। হায় রে! যুদ্ধের যে

ভাল করে খুঁজেও ছেলে দুটো কোনও খাবার পেল না। তারা দু'টি সিগারেট ধরিয়ে চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার আগে অবশ্য কোনও খাবার না পাওয়ার আক্রোশে মৃত সেনার দেহে দু'জন দুটো বেদম লাথি মেরেছে।

বেশিদিন আর বাকি নেই সেটা আমার বুড়ি বেড়াল মিয়া-ও জানে আর সেটা বলতে গেলে নাকি শত্রুর গুপ্তচর হতে হয়।

আজ ক'দিন হল এয়ার রেড-এর বিরাম নেই। আর এয়ার রেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রেডিয়োর প্রচার। ঠিক রেডিয়ো নয় অবশ্য, এর নাম 'পিপলস রিসিভার'। সরকারের বানানো বিশেষ রেডিয়ো সেট যাতে শুধু দেশের চ্যানেল ধরা যাবে। সব চ্যানেলই সরকারি আর তাতে ক্রমাগত প্রচার। আমার বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। নড়তে চড়তে পারেন না, চোখের কারণে বইও পড়তে পারেন না। রেডিয়োই ছিল সম্বল। এখন সেটাও নেই। আসলে ম্যাক্স কাকার বাড়ির ঘটনাটার পর আমাদের কারও বাড়িতেই আর স্বাভাবিক রেডিয়ো সেট নেই।

ম্যাক্স কাকা পড়াতেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওর ছেলে ফ্রাঙ্ক ছিল আমার বিশেষ বন্ধু। হানসকে আমি পছন্দ করতাম ঠিকই কিন্তু ভালবাসতাম ফ্রাঙ্ককে। '৪২-এর সেই রাতটা আমি কোনওদিন ভুলব না। সেদিন প্রথম বার্লিনের ওপরে বোমা পড়ে। বাবা তখনও চলতে ফিরতে পারতেন। আমার কেমন ভয় করতে লাগল ওই বারবার এয়ার রেডের আওয়াজ শুনে। আমাদের বাড়িটা খুব পুরনো, ঠাকুরদাদার বাবা নাকি তৈরি করেছিলেন। মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে বাড়িটা ভেঙে পড়বে। ফ্রাঙ্ককে ফোন করলাম, ম্যাক্স কাকা তৎক্ষণাৎ বাবাকে নিয়ে ওখানে চলে যেতে বললেন।

তাই গেলাম। ফ্রাঙ্কেরও মা নেই, আমারই মতো। সেদিন মনে আছে রাতে খাবার পরে বসার ঘরে বসে ম্যাক্স কাকা বাবাকে বোঝাচ্ছিলেন ফিউরার কী ভুল করছে। বাবা সাদামাটা মানুষ। মুদির দোকান চালান। ফিউরারের অনেক সভায় গিয়েছেন, বেশ উত্তেজিতই ছিলেন দেশের গৌরব নিয়ে। বাবা অবাক হয়ে ম্যাক্স কাকার কথা শুনছিলেন। সেদিনই প্রথম ম্যাক্স কাকার কাছে বুখেনভাল্ড কয়েদি শিবিরের কথা জানতে পারি। জানতে পারি বলা একটু ভুল হল, আসলে শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। তারপরে শুতে চলে গেলাম। ঘুম আসছিল না। উঠে চলে এলাম বসার ঘরে। দেখি অন্ধকারে বসে আছে ফ্রাঙ্ক। আলো জ্বালার উপায় ছিল না, এয়ার রেড চলছে, তাই পুরো ব্ল্যাক-আউট। ও যেন জানতই আমি আসব। আমি আসতে আমাকে নিয়ে ওর ঘরে গেল।

জানলা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকার বার্লিন শহরটাকে কেমন অচেনা ভূতের শহর মনে হচ্ছিল। মাঝেমাঝেই উড়ে যাচ্ছে বোমারু বিমান বিকট কানফাটা শব্দ করে। আর আলোর ঝলকানি হলেই বুঝতে পারছি বোমা পড়ল। সেই অন্ধকারের মধ্যে এখানে ওখানে আগুন

জ্বলছিল দূরে, বোমা পড়ার আওয়াজ, মৃত্যুভয়, যে-কোনও মুহূর্তে একটা বোমা এই বাড়ির ওপরে পড়লে সবাই শেষ হয়ে যেতে পারি— এসবের মধ্যে ও আমাকে ভালবাসল, নিজেকে উজাড় করে দিলাম ওর কাছে। ও-ও দিল তাই। এর আগে এরকম পরিস্থিতিতে যে ভালবাসা যায় সেকথা কেউ বললে বিশ্বাসই করতাম না, হয়তো তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগত মনে।

ছ'মাস আগে ম্যাক্স কাকা আর ফ্রাঙ্ককে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ফায়ারিং স্কোয়াডে শেষ হয়ে গিয়েছে তারা। তারাও একরকম গুপ্তচরবৃত্তি করেছিল বইকি। তাদের একটা ভাল রেডিয়ো সেট ছিল। সেই সেটে তারা জার্মান বেতার না শুনে নিয়মিত বিবিসি শুনত। এসএস-এর লোকজন তারপরে এসে পুরো মহল্লা খানাতল্লাশি করে যত রেডিয়ো সেট ছিল সব নিয়ে গিয়ে মহল্লার মাঝখানে ডাঁই করে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের রেডিয়োটা যে আমার মায়ের বিয়ের সময় কেনা আর তাঁর বড় প্রিয় ছিল এসব কথা বলব ভেবেছিলাম কিন্তু ভয়ে বলতে পারিনি। বাবা এখন বলেন আমরা দু'রকম বোমার আতঙ্কে বাস করছি। দুটোই প্রাণঘাতী। এক মিত্রবাহিনীর, আর-এক ফিউরারের, যা আসে ওই 'পিপলস রিসিভার' দিয়ে। ওটা যে বাড়িতে রাখব না তারও উপায় নেই। খাবার পয়সা থাক বা না-থাক 'পিপলস রিসিভার' কিনতে তুমি বাধ্য। এখন বিজলি নেই, ব্যাটারিও ফুরিয়েছে তাই একদিকে শান্তি।

ফ্রাঙ্ক চলে যাবার পর থেকে হানস আমার জীবনে অনেক কাছাকাছি চলে এল। বলা যায় ওকে আমি একরকম মেনেই নিলাম। সাধারণ সময় হলে এটা নিশ্চয়ই হত না। আমার পরিচিত কোনও মেয়ে এরকমটা করলে তাকে আমিও খুব খারাপ ভাবতাম, কিন্তু এখন সময়টাই এরকম। চারদিকে এত ভাঙাচোরা বাড়ি, এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে লাশ, বিজলি নেই, জলও আসে খুব অনিয়মিত, খাবারদাবারের অসম্ভব আকাল। ঘরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা। এসব সময়ে ঠিক একা বাঁচা যায় না।

আমি জানতাম হানস ব্যাঙ্কে কাজ করে। কিন্তু অবাক লাগত যখন দেখতাম যে ওর ব্যাঙ্কে কিছুতেই বা কোনও কারণেই ও আমাকে যেতে দিতে চায় না। সেদিন, মানে গত মঙ্গলবার ও এসেছিল। ওর আসা মানেই আমি জানি আমাকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আদিম ব্যাপার। একদিনও অন্যরকম হওয়ার জো নেই, সে আমি যেমনই থাকি না কেন। ফ্রাঙ্কও আমাকে ভালবাসত কিন্তু হানসের ব্যাপারটা অন্যরকম। সে ভাল কতটা বাসে জানি না কিন্তু অধিকার ফলায় ভীষণ। তবে ওর দৌলতেই এ বাজারে বাবার ওষুধ, কিছু খাবারদাবার পাই। মাঝেমাঝে আবার কিছু শৌখিন জিনিসও দেয়, যেমন পারফিউম। তাই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি ওর 'ভালবাসা'।

কিন্তু সে দিন সব অন্যরকম হয়ে গেল। আমি বুঝেছিলাম ও ব্যাঙ্কে কাজ করলেও অন্য কিছুও করে। নইলে এসব পায় কী করে? কোনও দিন প্রশ্ন করিনি। যে-কোনও যুদ্ধের প্রথম শহিদ হল মানুষের মনের স্বাভাবিক কৌতূহল। যুদ্ধ মানেই প্রশ্ন করা বারণ। সেদিন কিন্তু আমি এই অলিখিত আইন মানতে পারলাম না। আসলে সে দিন ও এত বন্য হয়ে উঠেছিল যে, সহ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। মনে হল কেন এই সমঝোতা করছি? শ্যেনবার্গের পতিতারাও এতটা করবে না। ওকে প্রশ্ন করলাম, কী কাজ করে ও? আসলে কী কাজ করে? ও এত

ফিউরারের ভক্ত অথচ ওকে যে অনেকটা ফিউরারের মতো দেখতে তা শুনলে কেন এত খেপে যায়? করে সামান্য ব্যাঙ্কের কাজ, কিন্তু মাঝেমাঝে ওর বাড়িতে গাড়ি এসে দাঁড়ায় কেন? আর সেই গাড়ি চড়ে ও কোথায় যায়? এখন সারা বার্লিনে ক'টা মোটরগাড়ি আছে তা হাতে গোনা যাবে, আর আর-একটা জিনিস আমি এর আগে একদিন দেখে ফেলেছিলাম যেটা ও জানত না। আগে প্রশ্ন করিনি। সেদিন আর পারলাম না। প্রশ্নটা করেই বসলাম।

গুন্টার বলে একটা ছেলে আমাকে খুব ভালবাসত। বছর ষোলো-সতেরো বয়স। তাকেও সেনাবাহিনীতে নিয়ে গিয়েছিল। সেও নাকি যুদ্ধ করবে। ১২ নম্বর প্যানজ়ার বাহিনীর সদস্য হয়েছিল সে। কাল তার ডায়েরি, এটা-ওটা ওরা দিয়ে গিয়েছে। দেহটা পাওয়া যায়নি। এসব কারণে মাথাটা আরও অস্থির ছিল।

আমার সেই শেষ প্রশ্নটা শুনে হানস কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল আর তারপরে আমাকে মারল একটা প্রচণ্ড চড়। দুটো দাঁত ছিটকে বেরিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম মুখের নোনা স্বাদটা রক্তের। জ্ঞান হারাতে হারাতেও দেখলাম টেবিলের ওপরে একটা কাঁচি পড়ে আছে, নিজের সব শক্তি একত্র করে সেই কাঁচিটা তুলে নিয়ে ছুড়লাম ওর দিকে। ওর গালে লেগে ছিটকে চলে গেল কাঁচি। গালটা কেটে গিয়েছে। একটা কুৎসিত গালাগাল করে রুমাল দিয়ে গালটা চেপে ধরে ও চলে গেল। আমার আর কিছু মনে নেই তারপর।

হানস

এমার সঙ্গে ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেল। এর পরে ওকে বাগে আনা কঠিন হবে। কিন্তু কী-ই বা করার ছিল? মেয়েরা বড্ড অবুঝ হয়। আরে বাবা যা পাচ্ছিস দু' হাত ভরে নে না, এত প্রশ্ন করার কী দরকার? আসলে ফিউরারের শরীর ভাল নেই। অনেকদিন অনেক নার্ভের ওষুধ খেতে-খেতে ওঁর এখন এমন অবস্থা যে বাঁ হাতখানা কেবল কাঁপে। ডান হাত দিয়ে সে হাত চেপে ধরে রাখতে হয়। আর মুশকিল হল সেটা অনেকেই জেনে গিয়েছে। কাজেই আমাকেও আমার বাঁ হাত কাঁপানো অভ্যাস করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি ফিউরারের একজন ডাবল।

আমি যে-ব্যাঙ্কে মানে তথাকথিত ব্যাঙ্কে তথাকথিত চাকরি করি সেটা পুরোটাই চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যবস্থা। সেখানে ব্যাঙ্কের কাজ হয় বটে কিন্তু তা হল পুরো কর্মকাণ্ডের চার আনা। বাকি সবটাই সেনাবাহিনীর চর বৃত্তি সংক্রান্ত কাজ। তার মধ্যে আমার কাজটা একটু বিশেষ ধরনের। আর এই বিশেষ ধরনের বলেই আমার কাজের খবর এক আমার বস ছাড়া কেউই জানে না, এমনকি ওই ভুয়ো ব্যাঙ্কেও।

বুঝতেই পারছি লাল ফৌজ এসে গিয়েছে। যুদ্ধ এবার শেষ। ফিউরার কী করবে কে জানে। অন্য কোথাও পালাবে নিশ্চয়ই। যাক গে, তা নিয়ে আমার চিন্তা করার কী আছে? কেউ না কেউ তো দেশ শাসন করবে আর আমি আবার অন্য একটা চাকরি খুঁজে নেব। পৃথিবীর সব থেকে বড় গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেও প্রমাণ করতে পারবে না আমি এসবের মধ্যে ছিলাম। কোথাও আমার আসল নাম নেই। বাপের নাম ঠিকানা সব ভুয়ো।

ফিউরারের মতো হাঁটা কথা বলা এসব তো কবেই রপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখছি এই হাত কাঁপানোটা বড্ড কঠিন। সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, এমা ছিল স্নানে। আমি ওদের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ওই হাত কাঁপানোর ব্যাপারটা অভ্যাস করছিলাম। বাজারি মেয়েটা যে কখন স্নানঘর থেকে উঁকি মেরে সেটা দেখে ফেলেছে কী করে জানব?

মাথা গরম হওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। সেদিন নাকি ওই ওর প্রাক্তন-এর জন্মদিন। রেগে বললাম, সে দেশদ্রোহী, গুপ্তচর তুমি তার জন্মদিন পালন করছ?

ও কোনও উত্তর না দিয়ে ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার মনে হল ও সবটা দেখে ফেলেছে, সবটা জেনে ফেলেছে। ও জেনে ফেলেছে ম্যাক্স কাকা আর তার ছেলে ফ্রাঙ্ক যে বিবিসি শুনত এরকম একটা খবর 'জায়গা মতো' আমিই পৌঁছে দিয়েছি। আসলে ফ্রাঙ্ককে না সরালে আমি তো এমাকে পেতাম না। সে তো আমার প্রতিপক্ষ। আর আমি জানতাম সেই 'বিশেষ' জায়গার কল্যাণে ওদের রেডিয়োর কোনও পরীক্ষা হবে না, দেখা হবে না সেই রেডিয়োতে কখনও বিবিসি ধরা হয়েছে, না হয়নি। আর ফ্রাঙ্ক যে এক বর্ণও ইংরেজি জানে না, তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামাবে না।

আমি ওর ওই দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলাম না। তার ওপর ও এবার শুরু করল অসুবিধাজনক সব প্রশ্ন করতে। আর শেষে যখন ওই হাত কাঁপাবার ব্যাপারে প্রশ্ন করল আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না।

কাল একটা বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট। আমাকে যেতে হবে। রাত থাকতেই গাড়ি আসবে। আমাদের ওপর নির্দেশ খুব পরিষ্কার। আমাদের কাজটা কাউকে জানানো তো যাবেই না, কেউ জেনে ফেলেছে বুঝলে তাকে হত্যা করতে হবে, সে নিজের বাবা-মা হলেও। আমার সন্দেহ হচ্ছে এমা বুঝে গিয়েছে। কী আর করা যাবে? কাল কাজটা সেরে আসি, ওর সঙ্গে আরও অনেকটা সময় কাটাই মজা করে তারপর নির্দেশ পালন করব যদি বুঝি যে আমার সন্দেহ ঠিক। কাল এত ভোরে নিয়ে যাবে কেন কে জানে!

একটা কানাঘুষো শুনছি। ফিউরারকে যে-মাদক দেওয়া হত সেই মাদকের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সেই অবস্থায় তাঁকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। আর এই মাদকের মাত্রা বাড়াতেই নাকি কেলেঙ্কারি হয়েছে, তাঁর মাথার স্থায়ী বিকৃতি দেখা গিয়েছে। তার মানে আমার কাজের সময় বাড়বে, টাকাও বাড়বে। যুদ্ধের জয় হোক।

এমা

ক'দিন আগে বাবা চলে গিয়েছেন। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। ওদিকে ফিউরার আত্মহত্যা করেছেন। আজকালের মধ্যেই বোধ হয় এরা আত্মসমর্পণ করবে। ফিউরারের দেহের ছবিও দেখেছি। চিনেছি। গালের কাটা দাগটা ছবিতেও স্পষ্ট। আর আমি যে চিনেছি সেটাও কেউ কেউ জেনে গিয়েছেন। তাই এখন আমার বাইরের ঘরে তিনজন অফিসার বসে আছেন। একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন হানসের গালে কাটা দাগটা কীভাবে হল? আমি সেটা বলতে সেই কাঁচিটা চেয়ে নিলেন। এঁরা ভদ্রলোক, আমাকে কী করতে হবে বলে দিয়েছেন। কিন্তু কষ্ট পাই তা এঁরা চান না। হাজার হলেও আমি হানসের বান্ধবী। আমাকে একটা জিনিস দিয়েছেন যা এই যুদ্ধের বাজারে ভাবাই যায় না। একটা লিপস্টিক। ভারী সুন্দর দেখতে।

আমার কাজ খুব সহজ। বসে বা শুয়ে লিপস্টিক ঘষে নেব, তারপর যা করার সায়ানাইড করবে। এবার যাই। ওঁরাও তাড়া দিচ্ছেন। হানস সব সময় চাইত তার বেশ নাম ডাক হোক। তা হবে না আর। কিন্তু অন্য এক চরিত্রের ভূমিকায় তার মৃতদেহের ছবি অমর হয়ে থাকবে।

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী

আমাদের ওপর নির্দেশ খুব পরিষ্কার। আমাদের কাজটা কাউকে জানানো তো যাবেই না, কেউ জেনে ফেলেছে বুঝলে তাকে হত্যা করতে হবে, সে নিজের বাবা-মা হলেও। আমার সন্দেহ হচ্ছে এমা বুঝে গিয়েছে।

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

কুমারী রানির ডাক্তার

মৈ ত্রী রা য় মৌ লি ক

[১২]

পূর্বানুবৃত্তি: আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে— এই নিয়ে রবার্ট আর সিসিলের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়। এই ঘটনার দশ দিন পর মারা যান সিসিল। মৃত্যুর আগে তাঁর তিরিশ বছরের পুত্র রবার্ট সিসিলকে রানির কাছে পাঠান। তাঁকে কাজে যোগ দিতে বলেন রানি। টুয়েলফথ নাইট উৎসবের দিন, হঠাৎ রানির শয্যাকক্ষে ঢুকে পড়ে ডেভেরো দেখেন রানির আসল রূপ—বিরলকেশী, ফোলাচর্ম বিশিষ্ট এক নারী। দেখেন, রানি পরচুলা পরে, চড়া প্রসাধনে থাকেন। ডেভেরোর পরামর্শে আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ সেনা পাঠালেন রানি। কমান্ডার ইন চিফ ডেভেরো কিছু দিন পরেই সৈন্য আর খাদ্য পাঠানোর জন্য চিঠি পাঠালেন। রানি জানালেন, এরকম সাধারণ যুদ্ধরীতি না-জানা সেনাপতির জন্য তিনি সেনা পাঠাবেন কোন দরকারে?

আর্ল সিসিল বললেন, "যদি অভয় দেন মহামান্যা, তা হলে বলি, আর্ল এসেক্স প্রথম থেকেই প্রতারণা করে আসছেন। কাউন্টেস লেটিসের বর্তমান স্বামী ক্রিস্টোফারের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক যথেষ্ট, অথচ তিনি বলে বেড়ান, আর্ল ডাডলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন। অপর দিকে নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলেও তিনি বিবাহিত।"

"বিবাহিত! কাকে বিয়ে করেছে রব? আয়ারল্যান্ডের কাউকে?"

"নাহ্ মহামান্যা। তিনি বিয়ে করেছেন তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের বড় এক ডাচ বিধবাকে। ভদ্রমহিলার আগের স্বামী ছিলেন কবি ফিলিপ সিডনি। আট বছর আগে কবি মারা যাওয়ার পরে আর্ল এসেক্স তাঁকে বিয়ে করেছেন।"

"এত বড় মিথ্যাচার! প্রমাণ দিতে পারবেন আর্ল সিসিল?"

"নিশ্চয়ই। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি নেদারল্যান্ডস-এ চর পাঠান।"

"এই ছেলে চায় কী?"

"অর্থ আর প্রতিপত্তি। অর্থের লোভ আর্ল এসেক্সের চরিত্রকে দূষিত করে তুলেছে।"

চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন মহারানি। খানিকক্ষণ পরে একা একা হেসে উঠলেন। তার পর স্বভাবসিদ্ধ মহিমায় বললেন, "আমার সিলমোহর লাগিয়ে আয়ারল্যান্ডে চিঠি পাঠিয়ে দাও। লিখবে, আর্ল এসেক্সকে ইংল্যান্ডে ফেরার অনুমতি দেওয়া যাবে না। প্রাণ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"

"তাই হবে মহামান্যা," আর্ল সিসিলের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল যেন।

আর ভাবতে পারছেন না রানি এলিজাবেথ। ক্লান্ত লাগে আজকাল। নতুন প্রজন্মকে ঠিকঠাক চিনতে পারছেন না তিনি। এরা ঠিক কী চায়?

মহারানি বললেন, "প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে কথা শেষ, এ বার আমি বিশ্রাম নেব।"

রানির চিঠি আয়ারল্যান্ড পৌঁছোনোর দু'মাসের মধ্যে আর্ল এসেক্স লন্ডনে ফিরে এলেন। রানির বারণ সত্ত্বেও দেশে ফিরে আসার জন্য তাঁকে গৃহবন্দি করা হল। রবার্ট ডেভেরার কাছে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। অবশ্য আত্মীয়-বন্ধুরা সাক্ষাৎ করতে চাইলে আসতে পারে।

বত্রিশ

ধর্ম অবমাননার দায়ে কারাবাস করছেন জিওর্দানো ব্রুনো। গত সাত বছর ধরে মামলার তদন্ত চলছে। ধর্ম অবমাননার তদন্ত এত বছর ধরে চলার কথা নয়। কিন্তু ব্রুনোর ক্ষেত্রে তা হচ্ছে। এর কারণ, ব্রুনো পণ্ডিত, গণিতজ্ঞ, দেশ-বিদেশে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। বহু পণ্ডিত, প্রভাবশালী এবং রাজন্যবর্গ ব্রুনোকে সমর্থন করেন। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া ব্রুনোর মতো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। ব্রুনোকে জেলে ভরা হল ১৫৯৩ সালে। প্রথম দু'বছর চলে গেল ব্রুনো যা লিখেছেন তার মর্মোদ্ধার করতে। অর্থাৎ লেখার কোন কোন জায়গায় তিনি ধর্মকে অপমান এবং হেনস্থা করেছেন, সেটা খুঁটিয়ে দেখা হল। এর পর ব্রুনোর যাবতীয় লেখা বাজেয়াপ্ত করে, পুড়িয়ে দেওয়া হল। গোটা ইটালিতে জিওর্দানো ব্রুনোর লেখা নতুন করে না-ছাপানোর আদেশ জারি করা হল। ব্রুনোকে নির্দোষ প্রমাণের আবেদন করতে বলা হল। ব্রুনো তাই করলেন। পরবর্তী ছ'মাস ব্রুনোকে সময় দেওয়া হল, অসীম ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের পক্ষে আবেদন করতে। অসীম ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের পক্ষে ব্রুনো যা লিখলেন, তার ওপর ভিত্তি করে জেরা চলল আরও ছ'মাস। সাংঘাতিক জেরার চাপে মানসিক স্থিতি হারালেন ব্রুনো। তিনি কখনও বললেন ব্রহ্মাণ্ড অসীম কখনও বললেন এটি অসীম নয়।

বিচারক লিখলেন, ব্রুনো উন্মাদ, মানসিক ভারসাম্যহীন। এক জন তুখোড় বাগ্মী, পণ্ডিত, গণিতজ্ঞকে চট করে উন্মাদ আখ্যা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া উন্মাদ সাব্যস্ত হলে ব্রুনোকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তাই নতুন করে বিচার শুরু হল।

কয়েক বছর ধরে ব্রুনোর যাবতীয় লেখা তন্ন-তন্ন করে ঘেঁটে তাঁর বক্তৃতার সারাংশগুলো থেকে মতবাদের একটি তালিকা তৈরি করা হল। ব্রুনোকে বলা হল, এই সব মতামত যে ভুল, তা স্বীকার করতে হবে। সময় দেওয়া হল আরও ছ'মাস। ১৫৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্রুনো জানালেন, চার্চের তালিকাভুক্ত আটটি মতবাদ তাঁর নিজের এবং এগুলো যে ভুল, তা তিনি স্বীকার করবেন না। সেই আটটি মতবাদ হল—

১) আত্মাশক্তি এবং বস্তুকণা ভিন্ন। পরমাণু থেকে বস্তুর জন্ম হয়েছে।

২) ব্রহ্মাণ্ড অসীম। এই অসীমত্বকে অবিশ্বাস করে যে, সে ঐশ্বরিক অসীমতাও অবিশ্বাস করে।

৩) সমস্ত বাস্তবতার সঙ্গে আত্মা এবং বুদ্ধি যুক্ত। এ দু'টি ছাড়া বাস্তবতার অস্তিত্ব নেই।

৪) পদার্থ চিরন্তন। এর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। এটি রূপান্তরিত হয় মাত্র।

৫) বাইবেলের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার কোনও সংঘাত নেই। কারণ, বাইবেল হল ধর্মতত্ত্ব, আর জ্যোতির্বিদ্যা হল বিশেষ জ্ঞান।

৬) তারার গতিবিধি পৃথিবীর রহস্য উন্মোচন করে এবং ঈশ্বরের বার্তা বহন করে।

৭) পৃথিবীকে চেনার মাত্র দু'টি উপায়—বুদ্ধি এবং অনুভব।

৮) সাধু থমাস আত্মা সম্পর্কে যা বলেছেন তা সত্য নয়। অর্থাৎ, আত্মা শুধু শরীরের মধ্যে বন্দি থাকে না, এটি মানবদেহের অংশ হিসাবে বিবেচ্য।

বারংবার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও ব্রুনো বললেন, "এই আটটি কথা আমি ফেরাতে পারব না। সাত বছর ধরে কারাগারে রেখেছেন, এবার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন। আমি ক্লান্ত। স্বপক্ষে যুক্তি যা দিয়েছি, তার বাইরে আর কিছু বলার নেই।"

চূড়ান্ত বিচার বসল। জিজ্ঞেস করা হল, "পবিত্র মেরিকে আপনি অপাপবিদ্ধা কুমারী হিসাবে স্বীকার করেন না, এ কথা কি ঠিক ব্রুনো?"

"অপাপবিদ্ধা এবং কুমারী শব্দ দু'টি পৃথক। মা মেরি কুমারী ছিলেন না, তা বাইবেল পড়লেই জানা যায়। এতে সংশয়ের কিছু নেই।"

"তার মানে গোটা ধর্ম যে-বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা ভুল?"

"খ্রিস্টধর্ম শুধু মা মেরির কুমারী থাকা বা না থাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ তো হাস্যকর কথা। খ্রিস্টধর্ম দাঁড়িয়ে আছে সত্যের ওপর। মা মেরির কুমারী থাকা বা না থাকাটা কোনও বড় ব্যাপার নয়।"

"বেশ। এ বার বলুন পৃথিবী স্থির, সূর্য একে কেন্দ্র করে ঘুরছে এ কথাও ভুল?"

"একেবারে ভুল। বরং পৃথিবী, সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আরও বলি, সূর্যও স্থির নয়। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি সূর্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে স্থির মনে হলেও তারা স্থির নয়, তাদের চলন আছে।"

"এই অবিশ্বাস্য কথাগুলো হারমিট এবং পাগানদের কাছে থেকে

শুনেছেন। আপনি জানেন, ইটালিতে হারমিটিজ়ম এবং পাগানিজ়ম দুই-ই নিষিদ্ধ।"

"জ্ঞান যা বলে তাই একমাত্র বিশুদ্ধ।"

"এর মানে বাইবেল আপনি স্বীকার করেন না?"

"কেন নয়। কিন্তু বাইবেল দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা শেখা যায় না।"

"অদ্ভুত আপনার যুক্তি। মা মেরি কুমারী নন, পৃথিবী স্থির নয়, বাইবেল ভ্রান্ত দর্শন। এর পরও বলছেন, আপনি ধর্ম অবমাননা করেননি?"

"আপনাদের যা মনে হয় ভেবে নিন। গত সাত বছর ধরে যা বলার আমি বলেছি। নতুন করে বলার কিছু নেই।"

পোপ ক্লেমেন্ট (সপ্তম) সাব্যস্ত করলেন ব্রুনো বিধর্মী, জেদি, একগুঁয়ে। যা পাপ সে করেছে তা মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, সে অনুতপ্ত পর্যন্ত নয়। সুবিচারের মাধ্যমে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হোক।

"সুবিচার আর শাস্তি, হাঃ হাঃ হাঃ!" হোলি অফিসের বিচারসভাকে স্তম্ভিত করে ব্রুনো হাসতে শুরু করলেন।

বিচারকের নাম মাক্রুজ্জি। চূড়ান্ত রায়দানের আগে তিনি ঘামতে শুরু করেছেন।

ব্রুনো বললেন, "মরণে ভয় পাওয়ার কথা আমার। মৃত্যুদণ্ড দিতে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ধর্মাবতার। যা রায় শোনানোর শুনিয়ে ফেলুন। আমি তৈরি।"

জিওর্দানো ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড ধার্য হল।

ক্যাম্পো দ্য ফিয়োরি অর্থাৎ ফুলের খেত আদপে একটি আয়তাকার স্থান, যা রোমে অবস্থিত। পুরনো রোমের পম্পেই থিয়েটার এবং টাইবার নদীর প্লাবনভূমির মাঝখানে এই জায়গা। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৬০০ সাল। দিনটি সারা ইউরোপে অ্যাশ ওয়েনেসডে হিসাবে পালিত হয়। প্রভু জিশু ওই দিন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত উপবাসে কাটিয়েছিলেন মরুভূমিতে। পাপমোচনের প্রার্থনায় উপবাস ছিল তাঁর, পাপীদের নাশের কামনায় নয়। ঠিক বিয়াল্লিশ দিন পরে শুরু হবে ইস্টার। ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রার্থনা করে, পাপ স্বীকার করে। অনুশোচনা চলে উপবাস এবং ক্ষমাভিক্ষার মধ্য দিয়ে। 'অ্যাশ ওয়েনেসডে' নামে একটি বই ব্রুনো লিখেছিলেন।

দণ্ডিত ব্রুনোকে গাধার পিঠে চাপিয়ে আনা হল। তিন জন ধর্মীয় প্রতিনিধি সঙ্গে এসেছেন। আর জুটেছে শতশত মানুষ। 'পাপী, শয়তান, অধার্মিক, নরাধম' রব তুলতে তুলতে উত্তেজিত জনতা ব্রুনোর পিছু নিয়েছে। ব্রুনো অরক্ষিত। নিষ্ঠুর উন্মত্ততার হাত থেকে তাঁকে বাঁচানোর কোনও প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। জনতা আঁচড়ে, খামচে দিচ্ছে ব্রুনোকে। পথে আসতে আসতে তাঁর গায়ের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ব্রুনোকে দাঁড় করানো হল ফুলের খেত ক্যাম্প দ্য ফিয়োরির

দণ্ডিত ব্রুনোকে গাধার পিঠে চাপিয়ে আনা হল। তিন জন ধর্মীয় প্রতিনিধি সঙ্গে এসেছেন। আর জুটেছে শতশত মানুষ। পাপী, শয়তান, অধার্মিক, রব তুলতে তুলতে জনতা ব্রুনোর পিছু নিয়েছে।

সামনে। তাঁর হাত বাঁধা হল। জনতা চাইছে ব্রুনোর জিভ হয় বেঁধে ফেলা হোক, নয়তো ছিঁড়ে নেওয়া হোক। মৃত্যুকালে ওই পাপী যেন ঈশ্বরের নাম নিতে না পারে। মুখের ভেতর কাঠ আর কয়লা ঢুকিয়ে ব্রুনোর মুখ বেঁধে দেওয়া হল। তাঁর হাত-পা কাঠের দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হল। আগুন জ্বালানো হয়েছে। ব্রুনোর শরীর জ্বলছে। জনতা গান ধরেছে। সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত— 'পাপীর বিনাশ ঘটিয়ে হবে ঈশ্বরের অভ্যুদয়।' এক মাসের মধ্যে ব্রুনোর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা ইউরোপে।

টেবিলে মাথা নামিয়ে বসে আছেন ডক্টর গিলবার্ট। তাঁর ডান হাতে একটি চিঠি। পল এল হইহই করতে করতে, "সুসংবাদ বন্ধু। উফ! ভাবতেই পারছি না এত বড় একটা খবর! কই চিঠিটা দেখাও।"

ডক্টর গিলবার্ট বিনা বাক্যব্যয়ে হাতের চিঠিটা পলকে দেন। চিঠিতে চোখ বুলিয়ে পল বলল, "চিঠিটা বাবা একবার দেখতে চাইছেন। বাবাকে বললাম আমাদের উইলিয়ম, রয়াল কলেজ অফ ফিজিশিয়নস-এর প্রেসিডেন্ট হয়েছে। তিনি বিশ্বাসই করতে চান না। কী হে, বাবাকে দেখাব চিঠিটা?"

"নিয়ে যাও। তবে প্রেসিডেন্ট পদ আমি গ্রহণ করব না।"

"মানে! তুমি কি খেপে গেলে?"

"যে-দেশে পণ্ডিত জ্ঞানীকে নগ্ন করে পোড়ানো হয়, সেই দেশে জ্ঞান ফলানোর প্রয়োজন নেই।"

"কী বলছ বলো তো! ব্রুনোকে শাস্তি দিল ইটালি। রাগ দেখিয়ে তুমি পদ অস্বীকার করছ ইংল্যান্ডে! একটা গোঁড়া ক্যাথলিক দেশে..."

"ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট সব এক। না না, আর নয়। আহাম্মকের দুনিয়ায় সত্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।"

"শান্ত হও বন্ধু। আমার একটা কথা অন্তত শোনো। পদটি অগ্রাহ্য করার আগে একবার ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে অধ্যাপক জন ডি-র সঙ্গে কথা বলে এসো। আমি না হয় মূর্খ। তিনি তো পণ্ডিত। তাঁর ওপর তিনি তোমার গুরু। যাও ভাই, ঘুরে এসো।"

তেত্রিশ

টেমস নদীর দক্ষিণ তীরে গম্বুজের মতো বিশাল তিন তলা বাড়িটার নাম গ্লোব থিয়েটার। গ্লোব থিয়েটার থেকে হেঁটে প্রায় পৌনে এক মাইল পূর্বে গেলে লন্ডন ব্রিজের কাছে পৌঁছোনো যায়। সাতসকালে ভদ্রলোক হয়তো লন্ডন ব্রিজ ধরে হেঁটে এসেছেন। পোশাক এবং ব্যক্তিত্ব বলে দিচ্ছে, ভদ্রলোক অভিজাত শ্রেণির। এই ধরনের লোক সাধারণত ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আসেন।

চেম্বারলেইন'স মেন থিয়েটার দলের প্রযোজনাগুলো আজকাল গ্লোব থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল মাত্র ন'টা। বেলা এগারোটা থেকে রিহার্সাল শুরু হবে। কুশীলবদের কেউই প্রায় গ্লোব থিয়েটারে পৌঁছোননি। হলঘর ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। অফিস ঘরে বসে আছে অল্পবয়সি একটি ছেলে। সে যে স্থির হয়ে বসে আছে, এমনটা নয়। তার হাতে এক দিস্তে কাগজ। কাগজে সম্ভবত সংলাপ লেখা। ছেলেটি মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছে, পায়চারি করছে, আবার বসছে সংলাপ বলতে বলতে।

আগন্তুক ভদ্রলোক দরজায় টোকা দিলেন, "ভেতরে আসতে পারি মহাশয়?"

ছেলেটি সংলাপ বলা থামিয়ে দরজার দিকে তাকাল। আগন্তুক ভদ্রলোককে সে চিনতে পারছে না। বলল, "আমায় কিছু বলছেন?"

"আর কেউ যখন সামনে নেই, তখন ধরে নেওয়া যাক আপনাকেই বলছি। ভেতরে আসার অনুমতি দেবেন কি?"

"ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসুন।"

ভদ্রলোক ঢুকলেন। টুপি খুলে হ্যাঙ্গারে ঝোলালেন। গায়ের ভারী কোট খুলে ফেললেন, "এটা কোথায় রাখব?"

ছেলেটি বলল, "আমায় দিন।"

টুপি, কোট খুলে ফেলার অর্থ ভদ্রলোক কিছুক্ষণ থাকবেন।

"কফি খাওয়াতে পারবেন? ঠান্ডা হাওয়ায় জমে যাচ্ছি একেবারে।"

(ক্রমশ)

অঙ্কন: বৈশালী সরকার

মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনায়

নিখিল সুর

[৭]

যুদ্ধাতঙ্ক

আধুনিক যুদ্ধের ভয়ঙ্কর চেহারাটা এ দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি কখনও। সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির খবরাখবর তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আধুনিক যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে। তাই ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, এবং বিশেষ করে সেই যুদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে এ দেশের মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে পারেনি। বাদ যায়নি খোদ ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসককুল।

আতঙ্ক শুরু হয়েছিল ১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে, অর্থাৎ যে দিন জাপান আক্রমণ করে মালয়, হংকং ও ফিলিপিনসকে। জাপানকে রুখতে পারেনি ব্রিটিশ বাহিনী এবং মিত্রশক্তি মার্কিন বিমান ও সাবমেরিন। এই সংবাদেই কলকাতা থেকে পালানোর হিড়িক এমনভাবে শুরু হয় যে, মানুষের পদপিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।[১]

কলকাতা সহ সমস্ত বাংলার মানুষকে গ্রাস করেছিল দুটো আতঙ্ক— জাপানি বিমান হানার ভয়, আর মিলিটারিদের প্রয়োজনে যে-কোনও মুহূর্তে ঘরবাড়ি, জমিজায়গা থেকে উৎখাত হওয়ার আশঙ্কা।

কেবল সাধারণ মানুষই নয়, জাপানি আক্রমণের ভয়ে সামরিক কর্তারা পর্যন্ত কী ভাবে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ জেনারেল Bill Slim-এর স্মৃতিকথা। তিনি লিখেছেন, 'We passed full days and some anxious nights when scares of invasion called us from our beds.'[২] আমেরিকান কনসুলেট মার্কিন নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছিল, কলকাতা ছেড়ে পশ্চিমে চলে যেতে। আতঙ্কিত লোকজনদের কলকাতা থেকে পালানোর প্রবণতা দেখে স্পেশাল অফিসার L.G. Pinnell-ও ভয় পেয়ে দার্জিলিংয়ে চলে যান তাঁর পরিবার নিয়ে।[৩] কলকাতার এআরপি প্রশিক্ষক, George Smith, Forest Assistant Officer পদে আবেদন করে লিখেছিলেন, কলকাতায় যে-কোনও সময় জাপানিরা এসে হাজির হতে পারে। তিনি অবিলম্বে নতুন পদে যোগ দিতে চান।[৪]

কলকাতা থেকে ১৯৪২-এর ৬ জুন Accounts Officer Association-এর সচিব ভারতের অডিটর জেনারেলকে লেখেন, 'বর্মা জাপানের আক্রমণের শিকার হয়েছে। অসমও আক্রান্ত। বিমান হানার একটা বড় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে আমরা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন আমাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের নিরাপত্তা নিয়ে। তা ছাড়া, শহরের দৈনন্দিন

জীবনযাপন হয়ে উঠেছে সমস্যাসঙ্কুল। ভৃত্য ও রাঁধুনিরা পালিয়ে গেছে ভয়ে। এখনও কোনও বিমান হানা হয়নি, তাতেই এই অবস্থা। সত্যি সত্যি বিমান আক্রমণ হলে কী হবে! আমরা আমাদের কার্যক্ষেত্রে মন দিতে পারছি না আতঙ্কে। সেজন্য আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আর্জি পেশ করছে, অফিসটা যেন শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়।'[৫]

বস্তুত, ইতিমধ্যে অনেক অফিস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতা থেকে। ভাবনা চলছিল আরও অনেক অফিস সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের অনেক অফিস তুলে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি ও কাটিহারে। জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রার চলে গিয়েছিলেন বীরভূমের সুরিতে (সিউড়ি)। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তার অফিস চলে যায় বেনারসে। আলিপুরের নতুন টাঁকশালকে নিয়ে যাওয়া হয় লাহোরে, Board of Scientific and Industrial Research দিল্লিতে।[৬]

কিন্তু এই ভাবে সরকারি অফিস অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে দেখা দেয় অন্য সমস্যা। কঠিন হয়ে ওঠে স্থানান্তরিত কর্মী ও তাদের পরিবারের থাকার জন্য বাসভবন জোগাড় করা। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের ১০ নং ব্যারাকের হস্টেলে সরকার বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের থাকার ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিলে আপত্তি জানায় কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষ মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে জানান, কলকাতার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য বহু ছাত্র এই কলেজে ভর্তি হয়েছে কলকাতা ছেড়ে দিয়ে। তাদের জন্য হস্টেলের প্রয়োজন। সরকার থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল হস্টেলের ছাত্রদের বেগমকুঠিতে থাকার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাতে ছিল যথেষ্ট অসুবিধে। অধ্যক্ষ জানান, এর পরেও যদি সরকার চাপ দেয়, তা হলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।[৭] অ্যাকাউন্টেট জেনারেলের অফিস মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিলে অ্যাকাউন্টেট জেনারেল, এইচ কে বোস মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে লেখেন, তাঁর অফিসে কর্মীর সংখ্যা ৭০০। মুর্শিদাবাদে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা গুরুতর সমস্যার বিষয়। এমনকি আস্তাবল সহ মুর্শিদাবাদের প্রাসাদেও তাদের স্থানসঙ্কুলান সম্ভব নয়।[৮]

রেঙ্গুনের পতনের পর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কী রকম আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, তার পরিচয় মেলে জনৈক আইপিএস অফিসারের স্ত্রীর লেখা একটা বর্ণনা থেকে। তিনি লিখেছেন, ব্রিটিশ পরিবারগুলি জাপানি আক্রমণের ভয়ে হন্যে হয়ে এমনও পরিকল্পনার কথা ভাবতে শুরু করেছিল যে, তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে তাদের সন্তানদের আয়াদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে তাদের গ্রামে।[৯] আতঙ্ক জমাট বেঁধেছিল ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দফতর থেকে শত্রু সেনা প্যারাসুটে করে আকাশ থেকে নেমে এলে কী করণীয়, সে সম্পর্কে ঘন ঘন পরামর্শ ঘোষণা করলে, বরিষ্ঠ অফিসারদের প্রদেশ সরকার নির্দেশ দিয়েছিল তাদের পরিবারগুলিকে সরিয়ে দিতে। সরকার তাদের আশ্বাস দিয়েছিল, কোনও অফিসার তার কর্মস্থল থেকে পরিবারকে সরিয়ে নেওয়ার যে ব্যবস্থা নেবে, তাতে বাধা দেওয়া হবে না। সরকারি প্রশাসনের কর্মচারীদের পরিবারকে স্থানান্তরিত করার জন্য মঞ্জুর করা হল exodus allowance—তাদের সুবিধের জন্য।[৯ক] আইপিএস John Eadie তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছেন ১৯৪১-৪২-এ জাপানি আক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব ভারতের সমস্ত অফিসারের মধ্যে, পদমর্যদা নির্বিশেষে।[১০]

১৯৪১-এর ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় ঘোষণা করা হল জরুরি অবস্থা। সরকার সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিল। তবে স্কুল কেবল কলকাতায় বন্ধ হয়নি। বাংলার বাইরে অন্যান্য শহরেও বহু স্কুল বন্ধ ছিল যুদ্ধের সময়। ১৯৪৩-এ আমি, বর্তমান লেখক, ছিলাম জামশেদপুরে। বয়স তখন ছয়। প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম। দেখেছিলাম একমাত্র প্রাইমারি স্কুলগুলি ছাড়া টাটা কোম্পানির সমস্ত আপার প্রাইমারি, হাই স্কুল বন্ধ। সে সব স্কুল-ভবন মিলিটারির দখলে। জে আর ডি টাটা হাই স্কুলের বিশাল বাড়িটায় তখন মিলিটারি হাসপাতাল। বহু স্কুল পরিণত হয়েছিল মিলিটারি

ব্যারাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও সরকার সতর্কতা জারি করে বলেছিল, কলকাতা যদি ব্যাপক বিমান হানার মুখে পড়ে, কলকাতা ত্যাগ করা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।[১১]

এই পরিস্থিতিতে বাংলার গভর্নর হারবার্ট একটা ভুল পদক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন। ১৯৪২-এর নভেম্বরে ভাইসরয় লিনলিথগো ভারত সচিব লিও এমেরির কাছে অভিযোগ করে জানালেন, গভর্নর হারবার্ট চাপ দিচ্ছেন একটা সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে যাতে কলকাতাবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হবে, শ্রীলঙ্কায় জাপানি বোমা পড়ার পর কলকাতায় বোমা পড়ার সম্ভবনার কথা। তাই তাদের যে-কোনও সময় কলকাতা ছাড়তে হতে পারে। ভাইসরয় জানালেন, তিনি এবং প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল সম্পূর্ণ ভাবে এমন পরিকল্পনার বিরোধী। এতে কেবল আতঙ্ক ছড়াবে অনর্থক। হারবার্টকে নির্দেশ দেওয়া হোক এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা থেকে বিরত থাকতে।[১২]

যুদ্ধের খবর নিশ্চিত ভাবে প্রভাব ফেলেছিল জনমনে ও গণ আচরণে। সেজন্য যুদ্ধের আবহকে লঘু করার উদ্দেশ্যে সরকার চেষ্টা করেছিল সাধ্যমতো। তাই অনুমোদন করা হয় সাধারণ বিনোদনের প্রক্রিয়াগুলিকে। যুদ্ধ-সাংবাদিক Burchett লিখেছিলেন, বর্মায় যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ব্রিটিশ সেনা সেখান থেকে ফিরে এসেছে পরাজিত হয়ে। ১৯৪২-এ যে-কোনও মুহূর্তে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা। এই রকম একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কলকাতায় চলেছিল ককটেল পার্টি। ডিনার পার্টি, হোটেলে অর্কেস্ট্রা, আলোচনায় ইউরোপীয় সমাজে বৈষম্য এবং হুইস্কি ও জিন-এর অভাবের কথা। এতে বাদ সাধেননি ভাইসরয় লিনলিথগো। তিনি বলেন, 'এরকম গুরুতর পরিস্থিতিতে এ সবের একটা গুরুত্ব আছে। মানুষকে বোঝানো দরকার। আমরা খোলের মধ্যে গুটিয়ে যাইনি, ডুবে যাইনি হতাশার গভীরে।'[১৩]

১৯৪২-এর অগস্টে Royal Calcutta Turf Club সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে চাইল, শীতকালীন রেসের অনুষ্ঠান করা

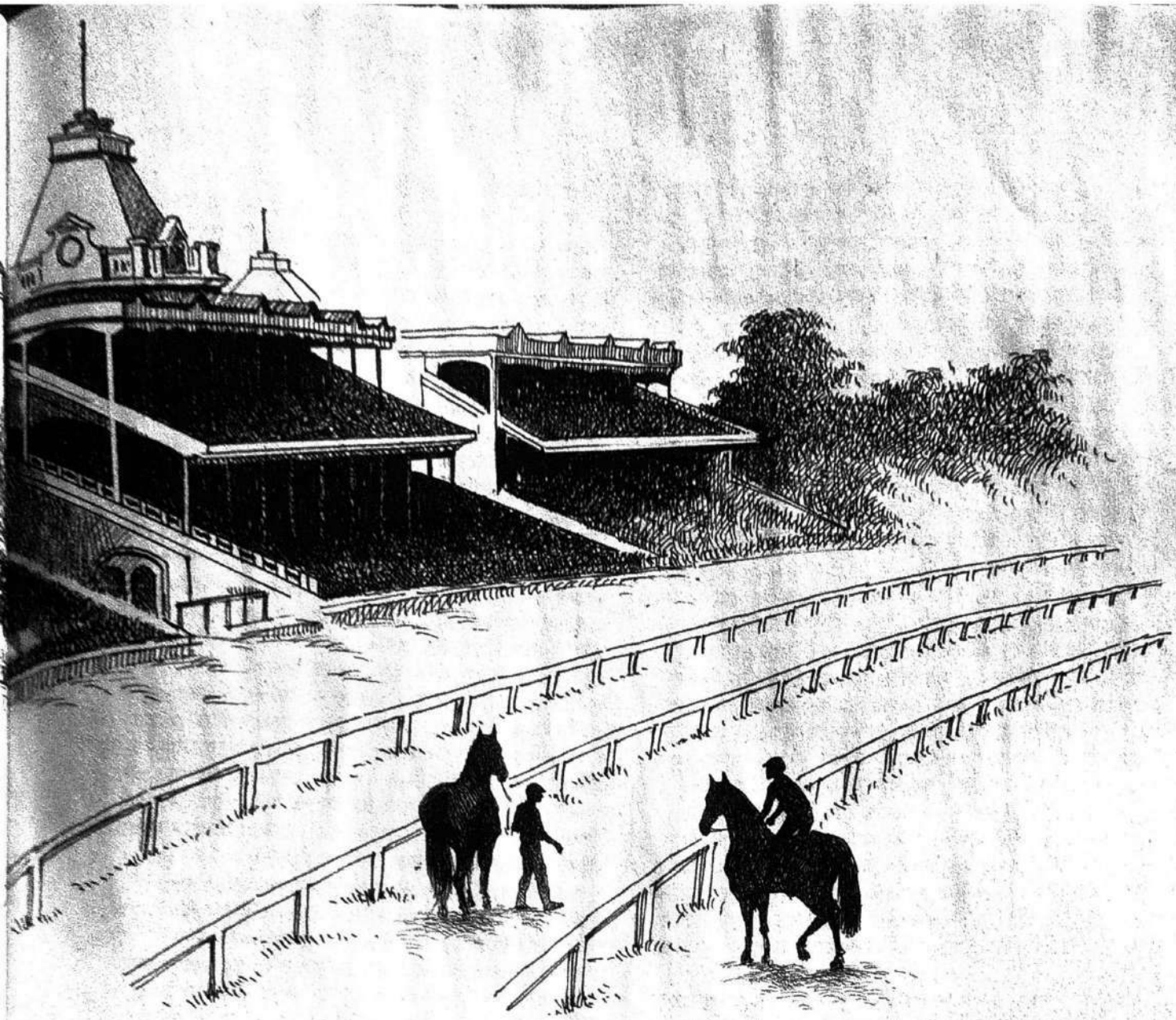

যাবে কি না। এ ব্যাপারে বাংলার স্বরাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি P. D. Martyn আপত্তি জানিয়ে বললেন, বিমান হানা হলে তা ঠেকানো যাবে না। জনতা ঠিক সময়ে যেতে পারবে না আশ্রয়স্থলে। তথাপি ক্লাবের কর্তৃপক্ষ বিষয়টা পেশ করল ভাইসরয়ের কাছে। তাঁর সম্মতিতে রেস এগিয়ে এল নির্ধারিত সময়ের আগে।[১৪]

সরকার সংবাদপত্রগুলিকে সতর্ক করেছিল, আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য। কিন্তু তাতে দূর করা যায়নি আতঙ্ক। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বহু মানুষ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্কে ছুটেছিল গচ্ছিত টাকা তুলে নিতে। জলপাইগুড়িতে ১৯৩৯-এর মে মাসের ২৪ থেকে ৩১-এর মধ্যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে তোলা হয়েছিল ১৮০০০ টাকা, আর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ১,৪১,০০০ টাকা। বাঁকুড়ায় পোস্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে মে মাসের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে তোলা হয় ৫৫,৫৫২ এবং পরের পনেরো দিনের মধ্যে ১,৬২,০৭৬ টাকা।[১৫]

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে রেঙ্গুনে বোমা পড়ে। এই খবর শুনে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ চলে যায় কলকাতা ছেড়ে। ১৯ থেকে ২১ ডিসেম্বর মাত্র এই তিন দিনের মধ্যে সরকারি হিসেব অনুযায়ী, কলকাতা ত্যাগ করেছিল ২,৯৭,০০০ মানুষ।[১৬] ১৯৪২-এর ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় বোমা পড়ার পর বাংলার গভর্নর হারবার্ট ২৩ ডিসেম্বর পরস্পরবিরোধী তথ্য দিয়ে ভাইসরয়কে এক অদ্ভুত চিঠিতে লিখলেন, 'আতঙ্ক তেমন ভাবে গ্রাস করেনি কলকাতাকে। তথাপি বহু মানুষ চলে গেছে শহর ছেড়ে। ডক অঞ্চলে প্রায় সমস্ত শ্রমিক অদৃশ্য। মানুষের মনোবল হ্রাস পাচ্ছে ক্রমশ। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার এমন হুজুগ দেখা দিয়েছে যে, বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে ভিড় সামলানোর জন্য।'[১৭]

১৯৪৩-এর ৫ ডিসেম্বর ডক অঞ্চলে বোমা পড়ার পর ডক সংলগ্ন মানুষের মনে কী ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটা দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা যেতে পারে মোমিনপুরের এক বাসিন্দার স্মৃতিকথা। তাঁর বাবা মোমিনপুর রোডের একটা বাড়িতে বড় হয়েছিলেন। বোমা পড়ার ফলে সেই বাড়ির যে ক্ষতি হয়েছিল তা আর মেরামত করার উপায় ছিল না। বাড়ির ভিতে ফাটল দেখা দেয়, বাড়িটা যে-অঞ্চলে বিস্ফোরণ হয়েছিল তার কাছাকাছি থাকার ফলে। তাঁর বাবা সারা জীবন সেই আতঙ্ক নিয়ে বেঁচেছিলেন, যা বোমা পড়ার দিন সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মনে। বস্তুত, সে দিনের বুক-কাঁপানো মারাত্মক এক অলৌকিক শব্দ এবং বোমা বিস্ফোরণের বিশাল ব্যাপ্তি তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছিল সারা জীবন। তাঁর মনে হয়েছিল, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দিন এসে হাজির হয়েছে।[১৮]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে কলকাতার জনসংখ্যা চার লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় কুড়ি লক্ষে। প্রচুর মানুষ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় এসেছিল রুজি রোজগারের আশায়, বাংলার বাইরে থেকে। ওড়িশাবাসীরা এসেছিল আঠারো শতকের শেষদিকে। আঠারো-উনিশ শতকে এসেছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশের

মানুষ। প্রায় সকলেই শ্রমিক। তারা শ্রমের বাজারে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে ক্রমশ। ১৯৪১ এ গার্টিশিয়ে বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ শতাংশও ছিল না। এই সব মানুষের আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ করে বিমল করের *দেওয়াল* উপন্যাসের সুধা বলেছিল, একসময় মফস্‌সলের মানুষ আসত কলকাতায় জীবন বাঁচাতে। আর এখন সেই কলকাতা থেকে পালাচ্ছে প্রাণরক্ষার তাগিদে।[19]

সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছিল কলকাতা ও সংলগ্ন কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে। ১৯৪১-এর ১৮ ডিসেম্বর কলকাতা এবং মফস্‌সলকে 'বিপজ্জনক এলাকা' বলে ঘোষণা করার পরই শুরু হল শ্রমিকদের শহর ত্যাগ। অবাঙালি শ্রমিকরা ট্রেনে উঠে, পায়ে হেঁটে রওনা দিল নিজের নিজের প্রদেশে। শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ও কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির উৎপাদনে। ১৯৪২-এর ১ জানুয়ারি কলকাতার মেয়র এক আবেদনে শ্রমিকদের বললেন শহর ত্যাগে বিরত থাকতে। কিন্তু তাঁর আবেদনে সাড়া দিল না তারা।[20]

Bengal Rope Works-এ কর্মরত ১৫০ জন কুলির মধ্যে ৫০ জন চলে গেল কাজ ছেড়ে। একই ঘটনা ঘটল কাশীপুর ও চিৎপুর চটকলে। ৩০০ শ্রমিক চলে যায় এই দুই চটকল থেকে। দু'টি বিস্কুট কোম্পানি থেকেও অনেক শ্রমিক চলে যায় কাজ ছেড়ে। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় বিমান হানার পর ২০০০ কুলি শহর ছেড়ে চলে যায় গরুর গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে। পোর্ট কমিশনারে ১১০০০ কর্মীর মধ্যে পড়েছিল মাত্র ১৮০০ জন। যতই অরক্ষিত অবস্থায় থাকুক না কেন, যুদ্ধের সময় ডক, রেল, কল-কারখানা ও মিলে শ্রমিকরা ছিল অপরিহার্য। তাই চেষ্টা করা হয় শ্রমিকদের মনোবল অটুট রাখতে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ধরে রাখা হয়েছিল বলপ্রয়োগ করে। শালিমারে শ্রমিকদের বাধা দেওয়া হয় তারা ফেরি করে নদী পেরোনোর চেষ্টা করলে। কোথাও কোথাও শ্রমিকদের আটকে রাখা হয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে।[21] আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ব্যবসায়ী মহলে। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীরা কম দামে তাদের মজুত করা মাল বিক্রি করে চলে যেতে শুরু করে উত্তর ভারতে।

এরকম দুঃসময়ে মানুষ একেবারে নির্ভেজাল গুজবকেও বিশ্বাস করে মনেপ্রাণে। জার্মান রেডিয়ো গুজব সম্প্রচারে ছিল অতি দক্ষ। ভারতে মানুষ সে সব বিশ্বাস করত সম্ভব-অসম্ভব বিচার না করে। এক জন ব্রিটিশ প্রশাসক লিখেছিলেন, 'সকলেই জানত জার্মান সম্প্রচার মিথ্যে ভরা। তবু লোকে শুনত যথেষ্ট আগ্রহ ভরে এবং প্রভাবিত হত।'[22] সে সময় খুব কম লোকের বাড়িতে রেডিয়ো ছিল। দু'-একজন রেডিয়োর খবর শুনে তা ছড়িয়ে দিত মুখে মুখে। যত প্রচারিত হত, সেই খবর তত হয়ে উঠত অতিরঞ্জিত। যুদ্ধের শেষ বছরেও এমন গুজব ছড়ায় যে, জাপানি সেনা প্যারাসুটে কলকাতায় নামছে, আর চার্চিল আত্মসমর্পণ করেছেন গোপনে।[23]

আতঙ্কের পিছনে গুজব ছিল একটা বড় কারণ। পূর্বোক্ত *দেওয়াল* উপন্যাসে সুচারু বলে, 'এত গুজব ছড়ালে শহরের অবস্থা ভালই বা থাকে কি করে। এরা সব... এমন বাক্যবাক্যি ছড়াচ্ছেন যে মনে হবে কলকাতা শহরের ওপর বোমা পড়তে দু'এক রাত যা দেরি।'[24] গুজব রটেছিল, 'জাপানিরা প্রথমে টালার ট্যাঙ্ক ফাটাবে, হাওড়া-শেয়ালদার স্টেশনগুলো গুঁড়ো করে দেবে, তারপর চারপাশ থেকে বেঁধে মারবে।' সুচারু আরও বলে, 'হাজার হাজার লোককে ভয়ে ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আধমরা করে এরা ঠেলে দিচ্ছে মফস্‌সলে। হাওড়া শেয়ালদা, মায় হাওড়া ময়দান, পাতিপুকুর যেখানে যেখানে যান লোকে জিনিসে মালে ময়লায়, বমিতে গুতুতে একাকার। মাছি-গাদা হয়ে ট্রেনে লোকে চলেছে, ট্রেনে চড়তে না পারলে রাতের পর রাত স্টেশনে পড়ে আছে... বাক্স বিছানা হাতা খুন্তি, তোলা উনুন ঝেঁটা শিলনোড়া— মানুষ-মাল বোঝাই হয়ে ট্যাক্সি, লরি, ছ্যাকরা গাড়ি, ঠেলা চলেছে রাস্তা দিয়ে পর পর সারি সারি। ভয়ে ভাবনায় ফ্যাকাসে উদভ্রান্ত সব মুখ।'[25]

মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, 'এর মধ্যে শোনা গেল কলকাতায় বোমা পড়বে। ক্রমশ এই শোনা কথা গড়াতে গড়াতে তার নিজস্ব গতিবেগ পেয়ে কলকাতার নিরাপত্তাবোধে আঘাত করল। কলকাতাবাসীরা, যাদের একটু উপায় আছে তারা মফস্‌সলে, শহরে, গ্রামে পালাতে লাগল। ...কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেছে— অনেক বাড়ির গায়েই 'টু লেট' টাঙানো, কিছু কিছু বাড়ির গায়ে 'ফর সেল'। পাঁচ টাকা, দশ টাকা তিরিশ টাকা, চল্লিশ টাকায় আস্ত আস্ত বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।'[26]

নানা রকম গুজব ভেসে বেড়াত বাতাসে। কেবল লোকের মুখে মুখেই নয়, চিঠিপত্রের মাধ্যমে গুজব চলে যেত এক জায়গা থেকে অন্যত্র। নোয়াখালির ফেণি থেকে শান্তিকুমার বিশ্বাস কলকাতায় তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন, 'আপনি জানেন না, কি বিপদ এখানে চলছে। জাপানিরা প্রায় রোজই আসে। প্রায়ই মানুষ মারা যায়। বলে বোঝাতে পারব না কি বিপদের মধ্যে এখানে আছি।' নোয়াখালির তাহেরপুরের মহম্মদ হোসেন এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মুন্সীবাজারে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানান দেওয়া হয়েছে, বিমান-যুদ্ধ হবে ব্রিটিশ ও জাপানিদের মধ্যে। কলকাতা, টিপেরা বা চট্টগ্রামে এমন যুদ্ধ হবে কিনা কেউ জানে না।' কলকাতায় সাহাপুর থেকে সুধীন্দ্রনাথ মুখার্জি ১৯৪৪-এর ২৩ নভেম্বর লিখেছিলেন, 'গত রাতে কলকাতার কাছাকাছি বোমা পড়েছে। সকলেই আতঙ্কিত।' ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি বাংলার মুখ্য সচিবকে জানান, এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। মানুষ কেবল আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।[27] ১৯৪৪-এর ৪ এপ্রিল এক চিঠিতে ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোড থেকে আমিনুল হক দেওয়ান লেখেন, 'কলকাতার বর্তমান অবস্থা সংকটজনক। শহর এখন জলবসন্তের কবলে। কিন্তু তার থেকেও বড় বিপদের কথা, জাপান মণিপুর দখল করে নিয়েছে। যুদ্ধ চলছে আসামে। দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতায় বোমা পড়বে।'[28]

Sir Edward Benthall ছিলেন ভাইসরয়ের Executive Council-এর War Transport Member। তাঁর মতে তিন লক্ষ মানুষ শহর ছেড়েছিল রেলপথে।[29] অথচ ১৯৪২-এর ২৩ ডিসেম্বর দিল্লি থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, শহর ছেড়ে কেউ চলে যায়নি। আর এ জন্য ভাইসরয় লিনলিথগো কলকাতাবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 'Well done Calcutta' বলে। *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সম্পাদক Ian Stephens লেখেন, 'আমরা জানি না সরকারি ভাবে ইভাকুয়েশন-এর অর্থ কী। তবে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ শহর ত্যাগ করছে।'[30]

আসলে মানুষ আতঙ্কিত হয়েছিল, কারণ তারা আস্থা হারিয়েছিল ব্রিটিশের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর। তারা এটাই সত্যি বলে মনে করেছিল যে, ব্রিটিশ জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না কোনও ভাবেই। তার দৃষ্টান্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের বাজেয়াপ্ত করা একটা চিঠি। চিঠিটা লিখেছিলেন জনৈক অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— 'এদিনে কলিকাতার আলো সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়াছে। এবং যে কোনও সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। ...যুদ্ধের যাহা অবস্থা তাহাতে ইংরেজ আর জিতিবে বলিয়া মনে হয় না। জাপানের নিকট ভয়ানক হার হইতেছে। ...ইংরেজদের আর বাধা দিবার সাধ্য নাই। জার্মানী ও জাপান এক যোগে ইংরেজদের সাবার করিয়া আনিতেছে।[31]

তবে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রমিকরা আতঙ্কে শহর ত্যাগ করার কারণে ব্রিটিশ সরকার যতটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল, ততটাই নিশ্চিন্ত অনুভব করেছিল হাজার হাজার কলকাতাবাসী শহর ত্যাগ করায়, যাদের কোনও ভূমিকা ছিল না যুদ্ধোদ্যোগে। ১৯৪২-এর প্রথম দিকেও বাংলা সরকারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছিল না প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করে কলকাতার মানুষের আস্থা ও মনোবল অটুট রাখার। সরকার চেয়েছিল, বেশি সংখ্যক কলকাতাবাসী চলে যাক শহর ছেড়ে। গভর্নর তাঁর রিপোর্টে লেখেন,

'যদিও ৭০০০০০ মানুষ চলে গেছে শহর ছেড়ে, আরও বেশি সংখ্যক মানুষের চলে যাওয়া প্রয়োজন, যাতে বাকি যারা থাকবে তারা ধীরেসুস্থে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে।' তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে হবে। গভর্নর আরও লেখেন, 'আমার আশঙ্কা, বোমা পড়ার সময় যে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হবে, তাতে দেখা দেবে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। কারণ, তারা বেরিয়ে যেতে পারবে না শহর ছেড়ে।'[৩২]

যুদ্ধের আতঙ্ক কেবল বাংলায় সৃষ্টি হয়নি, আতঙ্ক গ্রাস করেছিল প্রতিবেশী প্রদেশ ওড়িশাকেও। ওড়িশা সরকার তার কর্মচারীদের অগ্রিম অর্থপ্রদান মঞ্জুর করেছিল, যাতে তারা সমুদ্র উপকূল থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের পরিবারকে। সেখানকার সরকার স্থির করেছিল, সমস্ত সরকারি নথিপত্র কটক থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ২৬৫ কিমি দূরে সম্বলপুরে।[৩৩]

মাদ্রাজের বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সালেম ও ব্যাঙ্গালোরে। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। গুলি করে মেরে ফেলা হয় চিড়িয়াখানার হিংস্র পশুগুলিকে।[৩৪] মাদ্রাজ সরকারের মুখ্যসচিব তাঁর রিপোর্টে লেখেন, মাদ্রাজ শহরের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ চলে গেছে রেল অথবা সড়কপথে। মাদ্রাজ সরকার অবশ্য জানিয়েছিল, জাপানের যুদ্ধ-তৎপরতা দক্ষিণ ভারতের মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করলেও সেটাকে ঠিক যুদ্ধাতঙ্ক বলা যাবে না। মাদ্রাজের জনসংখ্যার প্রায় তিরিশ শতাংশ, যারা চলে গেছে, তারা বেশির ভাগই মহিলা ও শিশু। মাদ্রাজে জনসাধারণের শহর-ত্যাগ নিষ্ক্রমণের (Exodus) চেহারা নিয়েছিল, যখন মাদ্রাজ সরকার ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করে, শহরে যারা কর্মব্যস্ত নয় তারা যত শীঘ্র পারে শহর ছেড়ে চলে যাক ভিড় ও বিভ্রান্তি এড়াতে।[৩৫] মাদ্রাজের মানুষকে কী ভাবে যুদ্ধাতঙ্ক গ্রাস করেছিল, তার একটা বড় দৃষ্টান্ত হল, ১৯৪২-এর ৮ এপ্রিল, মাত্র এক দিনে রেলের টিকিট বিক্রি হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার। সরকার বিনা ভাড়ায় রেলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করার অপেক্ষায় থাকেনি।

বিশাখাপত্তনমে ১৯৪২-এর জানুয়ারির মধ্যেই প্রায় অর্ধেক মানুষ শহর ত্যাগ করে, বোমা পড়ার আগেই। শহরের বিখ্যাত ওয়ালচাঁদের জাহাজ নির্মাণ কারখানা শ্রমিকশূন্য হয়ে গিয়েছিল। বোমা পড়ে ১৯৪২-এর ৬ এপ্রিল। রেল চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও শ্রমিকরা পালিয়ে যায় শহর থেকে। শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। ১৯৪২-এর ৯ এপ্রিল মাদ্রাজ সরকার জেলাশাসকদের জানায়, সরকার খুব গুরুত্ব দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের পরামর্শ দিচ্ছে, তারা যেন তাদের পরিবারকে অবিলম্বে সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সরকার চায় না, সরকারি কর্মচারীরা জাপানিদের হাতে ধরা পড়ুক, ফলে ৯ থেকে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে দু'লক্ষ মানুষ চলে গিয়েছিল শহর ছেড়ে। ১০ এবং ১১ এপ্রিল সামরিক বিভাগ থেকে সরকারকে জানানো হল, এক বিশাল জাপ-বাহিনী দক্ষিণ ভারত অভিমুখী। ১৫ তারিখের পর যে-কোনও সময় হাজির হতে পারে তারা। তারা পরামর্শ দিল, বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীদের শহর ত্যাগ করতে। মাদ্রাজের গভর্নর আর্থার হোপ পরে বলেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন সরকারি কর্মচারীদের সরিয়ে নিয়ে গেলে আতঙ্ক বৃদ্ধি পাবে, তথাপি হাইকোর্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতর জাপানিদের কব্জায় চলে যাওয়ার ঝুঁকি তিনি নিতে পারেননি। তাই সেক্রেটারিয়েটের অর্ধেক ইউরোপীয় কর্মীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উটকামন্ডে এবং বাকি অর্ধেককে চিটুরে। থেকে যান কেবল গভর্নর এবং তাঁর পরামর্শদাতারা। কিন্তু তারা এমনই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল যে, উটকামন্ডেও তারা স্বস্তি পায়নি। দাবি করেছিল সেখান থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। এমন সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দের অন্যায্য দাবিতে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন গভর্নর।[৩৬]

(ক্রমশ)

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

সূত্রনির্দেশ:

১। Nirad C. Chaudhuri, *Thy Hand, Great Anarch! India: 1921-52*, London (1990) p. 53

২। Yasmin Khan, *India at War: The Subcontinent and the Second World War*, New york (2015) p.98

৩। Janam Mukherjee, *Hungry Bengal: War, Famine, Riots, and the end of British Empire, 1939-1946*, University of Michigan (2011) p.63

৪। Home (political) confidential, File No. w-647/42 (এরপর থেকে H.P.C.)

৫। তদেব, File No. w-445/42

৬। তদেব

৭। তদেব, File No. w-444/42

৮। তদেব, File No. w-445/42

৯। Sanjoy Bhattacharya, *Propaganda and Information in Eastern India, 1939-45*, New york (2017) p.42

৯ক। H.P.C. File No. W-77/42

১০। Sanjoy Bhattacharya, p.63

১১। David Lovkwood, *Calcutta Under Fire*, New Delhi, (2019), p.16

১২। তদেব

১৩। Philip Mason, *A Shaft of Sunlight: Memories of Varied Life*, London (1978) p.151

১৪। David Lockwood, p.82

১৫। H.P.C. File No. w-79/40

১৬। Special Branch, K.P.M/SB/0156605, File No. K.P.M. 757/42

১৭। H.P.C File No. w-954/42

১৮। Janam Mukherjee, P.257

১৯। বিমল কর, *দেওয়াল*, কলকাতা (১৩৬৩) পৃ. ১৬৯

২০। Pranab Kumar Chatterjee, *Struggle and Strife in Urban Bengal, 1939-1947*, Calcutta (1991) p.105

২১। H.P.C File No. w-30/43

২২। Isabel Huacuja Alonso, 'What can the spread of German propaganda in India during WWII-tell us about fake news today?' (https://scroll.in)

২৩। তদেব

২৪। বিমল কর, পৃ.১৬৭

২৫। তদেব, পৃ.১৬৯

২৬) মণীন্দ্র গুপ্ত, *অক্ষয় মালবেরি*, কলকাতা (২০১৪) পৃ. ১৯৩

২৭। H.P.C File No. 53/44E

২৮। তদেব, 53/44 (iv)

২৯। Janam Mukherjee, p. 118

৩০। তদেব

৩১। K.P.M./SB/01565/05,F.No.757/41

৩২। David Lockwood, p.8

৩৩। তদেব, p.16

৩৪। Indivar Kamtekar, 'The Shiver of 1942', *Studies in History* xviii (i), 2002, p.88

৩৫। David Lockwood, p.17

৩৬। তদেব, p. 18

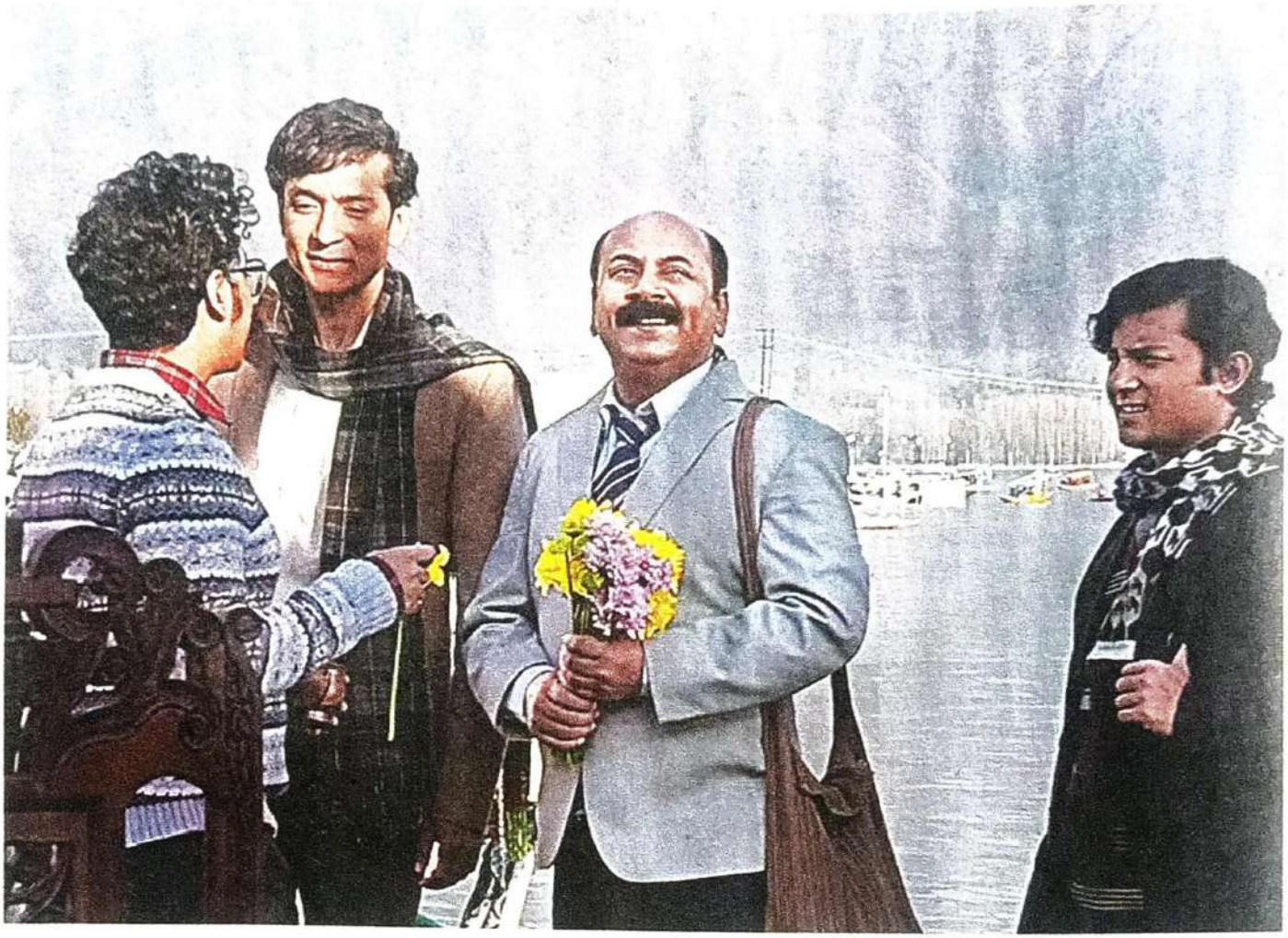

ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর ছবির দৃশ্যে অভিনেতারা

তিনটি সাম্প্রতিক বাংলা ছবি

বছরশেষে ওটিটিতে এল ফেলুদা। সঙ্গে মুক্তি পেল দু'টি বড় বাজেটের বিনোদনধর্মী ছবি।

চলচ্চিত্র

ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর

মাত্র চারদিনে 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর' গল্পটি লিখে ফেলেছিলেন সত্যজিৎ রায়, ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে লেখা এই ফেলুদা রহস্য অ্যাডভেঞ্চার। সন্দীপ রায় জানিয়েছেন, "...বাবার ছেলেবেলায় ঘোরা লখনৌ ও কাশ্মীরের স্মৃতি থেকেই লেখা হয়েছে 'বাদশাহী আংটি' ও 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর'।" কাশ্মীরের সঙ্গে অন্য নগরের তুলনা করতে যাওয়া মিছা, এ-কথা তো জানিয়েই দিয়েছেন এথিনিয়াম ইস্কুলের মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিক, এবার ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির দ্বিতীয় পর্বে সৃজিত মুখোপাধ্যায় সেই ভূস্বর্গেই ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধানোর চেষ্টা করেছেন এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য, প্ল্যানচেট, বাঙালির প্রিয় বিবিধ ক্রস রেফারেন্স আর অ্যালিউশনে বেশ জমিয়েই দিয়েছেন বলা যায়। কাহিনিকাঠামোর সঙ্গে মিশেছে—পরিচালকের ভাষায়—'ভিশুয়াল স্পেকটাকল', যা প্রায় প্রতিটি ফেলুদা-গল্পেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বরফ, গাছপালা, নদী, উপত্যকা, নাঙ্গা পর্বত, এই সব এক সঙ্গে দেখে ফেলুদা বলে উঠেছিল, 'এই বোধহয় ক্লাইম্যাক্স। কাশ্মীরে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু আছে কি?' কাশ্মীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে ছবিতে খানিক জোর করেই গাঁথার চেষ্টা করা হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যার সঙ্গে মূল কাহিনির কোনও যোগ নেই। অবশ্য জোড়াতালি দিয়ে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সে আরও 'ভয়ংকর' ব্যাপার হত নির্ঘাত। সৃজিত যে সে-প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন, তার জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ।

অবসরপ্রাপ্ত জাজ সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (রজতাভ

দত্ত) বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন, কিন্তু কয়েকজনের রায় নিয়ে তাঁর থেকে গিয়েছে সংশয়—সত্যিই কি সেই অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য ছিল? সিদ্ধেশ্বরবাবু প্ল্যানচেট-এর মাধ্যমে দণ্ডিতের আত্মা নামিয়ে জেনে নিতে চান উত্তর, সত্যিই কি তিনি খুনি! উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে বিচারক নিশ্চিন্ত, তাঁর রায়দানে ভুল ছিল না। আর না হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া মৃতের কাছে, অবশ্য তার পরিবারের অন্য কেউ প্রতিশোধস্পৃহ কি না, তা নিয়ে সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ভাবিত নন। মক্কেল নির্ভাবনায় থাকতে পারেন, কিন্তু গল্পের প্রথম পাঠক শুরুর দিকেই একটা আন্দাজ পেয়ে যায়। কিছু কি ঘটবে এঁর সঙ্গে? *ভূস্বর্গ ভয়ংকর*-এ ক্রাইম ঘটে কাহিনি বেশ খানিকটা এগিয়ে। সিদ্ধেশর মল্লিক খুন হন। খুনি কে হতে পারে? সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি সুশান্ত সোম (ঋদ্ধি সেন), পুত্র বিজয় মল্লিক (শাওন চক্রবর্তী), বেয়ারা প্রয়াগ, ডাক্তার হরিনাথ মজুমদার (দেবেশ চট্টোপাধ্যায়), অরুণ সরকার (অনিরুদ্ধ গুপ্ত)—এঁদের মধ্যে যে-কেউ। শেষে খুনি ঠিক কে, সেটা ছবিতে খানিক অস্পষ্ট রাখা হয়, তবে কাহিনিতে আছে, 'কিন্তু হাতকড়া বোধহয় তিনজনের হাতেই পড়বে'। কোন তিনজন? উত্তর বোধহয় সব দর্শকেরই জানা। এখানে আর বলার প্রয়োজন নেই।

এই তো মোটামুটি কাঠামো (এই 'কাঠামো' শব্দটা বললেই অবশ্য অন্য এক সিদ্ধেশ্বরের কথা মনে আসে, কিন্তু থাক, সেটা নিতান্তই ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে), এর সঙ্গেই সুরে-আলোয়-দৃশ্যে জমজমাট করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন পরিচালক। কাশ্মীর অনেকটা উতরে দিয়েছে, কারণ প্ল্যানচেট বা হত্যার দৃশ্য, কোনওটাই তেমন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে পারে না। রহস্যরোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু (অনির্বাণ চক্রবর্তী) দিব্যি মানানসই, কল্পন মিত্র তোপসের ভূমিকায় স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত, বরং ইংলিশ চ্যানেল না ঢাকুরিয়া লেক—কোনদিকে ফেলুদাকে রাখবেন পরিচালক এবং স্বয়ং ফেলুদা (টোটা রায়চৌধুরী) থাকবেন, তা নিয়েই যেন খানিক ধন্ধ তৈরি হয়। মিত্র বললে 'মিটার'-এ কোন এডিশনে শুধরে দিয়েছে ফেলুদা? টোটা রায়চৌধুরীর চেহারা (ফিটনেস, স্মার্টনেস দুই মিলিয়েই) ফেলুদা হিসেবে নিখুঁত, কেবল কথা বলার সময়ে যেন এক অতিরিক্ত সচেতনতা চেপে ধরে তাঁকে। তবে ক্লাইম্যাক্সে জেরার সময়ে ফেলুদা দুরন্ত, যার এক-একটা কথা 'এক-একটা ধারালো চাকু, সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিঁধে হলে পায়রা উড়িয়ে দেয়'!

বিজয় মল্লিক আর সরকারকে ফেলুদার কেস শোনানোর সময়ে *সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ, গোরস্থানে সাবধান, কৈলাসে কেলেঙ্কারি, হত্যাপুরী, টিনটোরেটোর যীশু*-র দৃশ্যের নির্মাণ ভাল লাগে, ভাল লাগে জয় সরকারের কাশ্মীরি সুর-ছোঁয়া সঙ্গীত, রম্যদীপ সাহার সিনেম্যাটোগ্রাফি, বুদ্ধিদীপ্ত লাগে বৈকুণ্ঠ মল্লিকের বিপক্ষে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়কে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, ফেলুদার কণ্ঠে *হীরক রাজার দেশে*-র গানের আবৃত্তি ছড়িয়ে যায় বরফে-সবুজে-পাহাড়ে।

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

◆◆◆

খাদান

ঠিক কীরকম ছবি তৈরি হলে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির অর্থের চাকা আবার গড়াতে শুরু করবে, তা নিয়ে শুরু বিতর্কের বয়স প্রায় বছর দশেক হতে চলল। দক্ষিণী রিমেক থেকে দর্শক মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরে ছোট-বড় বাজেটের বাংলা ছবি প্রচুর হয়েছে। সাহিত্য নির্ভর ছবিও হয়েছে। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন দু'-একটা বাদে সেই সব ছবি শহুরে দর্শকের জন্যই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে গিয়েছে। তা ছাড়া তথাকথিত বাংলা 'মাস এন্টারটেনার'গুলোর মধ্যেও এত দিন টলিউড। সেই দ্বিধায় খানিক আলোর দিশা দেখালেন দেব। শীতের ছুটির মরসুমে *খাদান*-এর মাধ্যমে এমন এক বাংলা 'কমার্শিয়াল' ছবি উপহার দিলেন, যাতে হিরো একা হাতে একশো খলকে দমন করে বটে, জীবনের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু দক্ষিণের গন্ধে নিজের অবতার সাজায় না। *খাদান*-এ কোলিয়ারি এলাকার রাজনীতি আছে। আছে সিন্ডিকেট এবং স্থানীয় মস্তানদের উত্থানের পিছনে বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। এ তো বাংলার অত্যন্ত চেনা, বাস্তব, রাজনৈতিক উপাখ্যান। সেই প্রেক্ষাপটে দেব এলেন এবং নিজের পুরনো অ্যাকশন হিরো অবতারটিকে জাগিয়ে তুললেন। আর কোথাও গিয়ে পর্দা এবং ব্যক্তিগত জীবন মিলে গেল, যখন তিনি বললেন, "ফ্যামিলি লিয়ে ব্যস্ত আছি বলে কী ভাবেছিস, অ্যাকশনটা ভুলে গেছি?" যেন নায়কের অহং প্রকাশ পেল পর্দায়। সদর্পে ঘোষণা করলেন তিনি *সাঁঝবাতি, প্রজাপতি*-র মতো পারিবারিক ছবি যেমন করতে পারেন, *খাদান*-এর মসিহাও হতে পারেন। বাংলা ছবির নায়ক তিনিই। এবং এই মসিহা শুধু পর্দায় নয়, পর্দার বাইরেও, শহরের বাইরের দর্শককে মিলিয়ে দিয়ে গেল। ফিরিয়ে দিল সেই

খাদান ছবির একটি দৃশ্যে দেব ও যীশু সেনগুপ্ত

এতটাই দক্ষিণী গন্ধ লেগে থাকত যে, ওটিটি মাধ্যম এবং দক্ষিণের মৌলিক ছবিতে মজে থাকা দর্শক বাংলার নকল থেকে সাবধানই থেকেছে। ফলে অদ্ভুত এক দোলাচলে ভুগছিল সময়, যখন মানুষ একসঙ্গে ভিড় করে বাংলা ছবি দেখে নিখাদ মজা পেত। ছবির বাহ্যিক অঙ্গের এই মজা বা এন্টারটেনমেন্ট ফ্যাক্টর আখ্যানের বহু ফাঁকফোকরের দিকে চোখ পড়তে

দেয়নি। এই ছবিতে চরিত্রদের যাত্রাপথ, এবং বহু কর্মকাণ্ডের যুক্তিগ্রাহ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। চিত্রনাট্য লেখার সময় সে সব দিকে নজর দিলে ভাল হত। মোহন (যীশু) এবং শ্যামের (দেব) বন্ধুত্ব এবং কোলিয়ারি অঞ্চলে দাপট শুরুর পরে, শ্যাম আর মোহনের স্ত্রী (বরখা ও স্নেহা), আদিবাসী নেতা মান্ডি (অনির্বাণ) এবং ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতা সিদ্দিকী (সুজন) আসে। আসে আরও কিছু চরিত্র। কিন্তু তাদের বিস্তারে আরও একটু সময় দেওয়ার দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল, দৃশ্য তৈরির ক্ষেত্রে ঘটনা বিন্যাসেরও। কিন্তু স্রেফ প্রয়োগের জেরে *খাদান* মনে শুধু আনন্দের অনুভূতির জন্ম দেয়। অভিনয় সকলেই ভাল করেছেন। দেব 'পিতা এবং পুত্র'-র চরিত্রে ভাল। দু'টি চরিত্রের অন্তর তাঁর অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যীশুও 'মোহন' হিসেবে যথাযথ। শুধু মহিলা চরিত্রদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। অনির্বাণ, সুজন তো ভাল অভিনয়ই করেন। *খাদান*-এ সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দেব এমন কিছু অভিনেতাকে এই ছবিতে এনেছেন, যাঁরা নয়ের দশক এবং দু'হাজারের পরে বাংলা কমার্শিয়াল ঘরানার ছবির ভীষণ চেনা মুখ ছিলেন। *খাদান*-এ সেই ফ্যাক্টরটা ভালই কাজ করেছে বলা যায়। পাশাপাশি খুব চেনা গান এবং হিট সংলাপের পুনরাবৃত্তি ছবিকে উপভোগ্য করেছে। বাংলা কমার্শিয়াল 'লার্জার দ্যান লাইফ' ছবিতে গল্পহীনতার অভিযোগ অনেকটাই ঘুচিয়ে দিয়েছে *খাদান*। একটি চেনা গল্প, কিন্তু ভিন্ন মাত্রার প্রয়োগের জন্য সব খামতি ঢেকে যায়। 'নায়ক' দেবকে ধন্যবাদ, তিনি শুধু উপভোগ্য একটি ছবি তৈরি করলেন না, প্রয়োজনীয় একটি ছবিও তৈরি করলেন। ইন্ডাস্ট্রিকে খাদের কিনারা থেকে বেঁচে ওঠার দিশা দিলেন। সময়ের অস্থিরতা থেকে উঠে আসা মানুষটি যখন সবদিক থেকে ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান, তখন তাঁকে নায়ক বলতেই হয়। *খাদান*, ইন্ডাস্ট্রিতে দেবকে সেই জায়গা দেবে।

সায়ক বসু

◆◆◆

সন্তান

যৌথ পরিবারের ভাঙন গত শতাব্দের শেষ কয়েকটি দশকে একটি স্পষ্ট বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলা সাহিত্য-চলচ্চিত্রে। সময় যত এগিয়েছে, ছোট মধ্যবিত্ত পরিবার আরও ছোট হয়েছে। 'নিউক্লিয়াস পরিবার'-এর আখ্যাটিও ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শহর, শহরতলিতে গজিয়ে উঠেছে ফ্ল্যাটবাড়ি। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সংস্কৃতি সমান্তরাল ভাবে গড়ে উঠছে সেখানে। মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধের চেহারাও বদলে যেতে শুরু করেছে এই সংস্কৃতির প্রভাবে। কিন্তু, এই পরিসরে বেঁচে থাকা প্রবীণ যাটোর্ধ্ব নাগরিক যাঁরা, তাঁরা এই নব্য-প্রচলিত ফ্ল্যাট-কালচারে নিজেদের 'আপগ্রেড' করে নিতে পারেননি এখনও, আজন্মলালিত পারিবারিক মূল্যবোধ ও আদর্শ অটুট রেখেই বেঁচে থাকতে চান পুত্র-পুত্রবধূ-সহ গোটা পরিবারের সঙ্গে, তাঁরা আজ অনেকেই উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত। আর এই উপেক্ষা ও লাঞ্ছনা যখন জোটে নিজেদের সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে, তখন বৃদ্ধ বাবা-মা হিসেবে কী করণীয় থাকে? এই প্রশ্নই রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত *সন্তান* ছবির মূল বিষয়।

সিনেমার শুরুতেই দেখা যায়, শহরেরই এক আবাসনে দুর্গোৎসবের চেনা ছবি। শরদিন্দু এবং মেঘমালা, বয়স্ক দম্পতি, তাঁরা এই উৎসবের দিনেও পুত্রবধূ-সহ পুত্র এবং নাতিকে ছাড়া একাকিত্ব যাপন করাকেই স্বাভাবিক বলে মনে

সন্তান ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী ও ঋত্বিক চক্রবর্তী

করে নিয়েছেন। একই শহরে একই দিনে একটি বহুমূল্যের বহুতল ফ্ল্যাটে পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং রিয়া পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পার্টি করতে ব্যস্ত। কিন্তু তাতেও বিশেষ অসুবিধা ছিল না। সিনেমায় সমস্যাটা দানা বাঁধতে শুরু করল মেঘমালা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর। এর পর থেকে পরিচালক দেখাতে চাইলেন ইন্দ্রজিতের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং ঔদ্ধত্য কোন পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে। এক দিকে পুত্র এবং পুত্রবধূর এ হেন আচরণ, অন্য দিকে শরদিন্দু এবং মেঘমালার অসহায়তা সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। পিতামাতার সঙ্গে তাঁর সন্তানের সম্পর্ক গিয়ে পৌঁছোয় দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে তারা, তাদের কাছে বাবা-মায়ের প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শনের চেষ্টা দেখা যায় না। বরং দেখা যায়, বাবা-মা যদি তাঁদের সন্তানকে ঠিক-ভুলের কথা বলতে আসেন, তখন তাঁদের কপালে জোটে অপমান অথবা অসম্মানজনক কথার তির। এমতাবস্থায়, শরদিন্দু সিদ্ধান্ত নেন তিনি আইনের দ্বারস্থ হবেন, তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা করে তিনি পুত্রকে সেই শিক্ষাটুকু দিতে চান, যা তিনি ছোটবেলা থেকে তাকে শিখিয়ে এসেছেন। এখন ইন্দ্রজিৎ তাঁর রোজগার, জীবনযাত্রা এবং স্টেটাস অক্ষত রাখতে গিয়ে মূল্যবোধের শিক্ষা পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে। পর্দায় বাবা-ছেলের চরিত্র যে ভাবে এগিয়েছে, তাতে শরদিন্দুর আদালতে যাওয়াটা আপাত ভাবে উচিত বলেই মনে হয়। আইনজীবী সহমর্মিতার সঙ্গে আইনি ধারার অন্তর্ভুক্ত করে মামলাও করলেন, কিন্তু এর পরেও একটা প্রশ্ন খুব সঙ্গত কারণেই উঠে আসা সম্ভব। সেটা হল, একজন খাতায় কলমে শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে যদি আইনের প্যাঁচে ফেলে মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হয়, তা হলে সেটা ভবিষ্যতে কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এ দিকে শরদিন্দু নিজেই স্বীকার করেন বাবা-মা হিসেবে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সন্তানের জন্য শুধু ত্যাগস্বীকার

রাজ চক্রবর্তী পরিচালক হিসেবে সমাজের বাস্তব সমস্যা সমাধানের যে-পথ দেখিয়েছেন, সেটা সবক্ষেত্রে সঠিক না-ও হতে পারে।

করেই গেছেন, তাঁদের সন্তানকে কখনও অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকারের গুরুত্ব কখনও বোঝাতে পারেননি। সেই সন্তান যে বড় হয়ে ইন্দ্রজিতের মতো বাবা-মায়ের বিরুদ্ধেই যাবে, এটা স্বাভাবিকই ছিল। বিচারকের নির্দেশে দোষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে, জরিমানা হতে পারে কিন্তু বিষিয়ে যাওয়া একটা সম্পর্ক পুনরায় সুসম্পর্কে ফিরিয়ে আনার জন্য আইনের ধাক্কা কতটা জরুরি ছিল এই ছবিতে? এটা দর্শককে ভাবতে বাধ্য করবে। সিনেমার একদম শেষ দিকে যে-ঘটনার ফলে ইন্দ্রজিৎ ও তার স্ত্রী-র যে-পরিবর্তন, শরদিন্দু যে-কারণে তাদের পরম স্নেহে বুকে টেনে নেবেন, সেটাই যদি পরিচালকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে ছবির বড় সময় জুড়ে যে কোর্টরুম ড্রামার আবহ তৈরি করা হল, সেই প্রকল্প সঠিক গন্তব্যে পৌঁছোতে পারল কি? আইনজীবী ইন্দ্রাণী রায় শরদিন্দুকে একটি বাক্যে জানায়, শরদিন্দু কেসটি জিতে গেছেন। কিন্তু মামলাটি কী ভাবে জিতলেন, বিচারক কী রায় দিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া কী হল—এই সমস্ত বিষয়গুলি দেখার জন্য দর্শকমন প্রস্তুত ছিল। সেই প্রস্তুতির কথা না ভেবে পরিচালক সমগ্র বিষয়টাকে যে ভাবে ইমোশনাল ড্রামার দিকে নিয়ে গেলেন, সেই বিষয়টি চোখ এড়ায় না।

শরদিন্দুর অভিনয়ে মিঠুন চক্রবর্তী এবং মেঘমালার ভূমিকায় অনসূয়া মজুমদার অনবদ্য। ইন্দ্রজিতের অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। প্রথম থেকেই তাঁর একটানা নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় একটা সময়ের পর কিছুটা একঘেয়েই লাগতে শুরু করে। সিনেমা যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন তাঁর আত্মোপলব্ধি এবং মানসিক পরিবর্তনের দৃশ্যে তাঁর অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। আদালত কক্ষে দুই আইনজীবীর বাগ্‌যুদ্ধের বিষয়টি আরও ভাল হতে পারত। খরাজ মুখোপাধ্যায় এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সংলাপে হাস্যরসের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন ছবির পরিচালক, কিন্তু সেটা এমন কিছু উপভোগ্য হয়ে ওঠেনি। সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া দু'টি গানই শুনতে ভাল লাগে। রাজ চক্রবর্তী পরিচালক হিসেবে সমাজের একটি বাস্তব সমস্যার সমাধানের যে পথ দেখিয়েছেন, সেটা সবক্ষেত্রে সঠিক না-ও হতে পারে। তবুও, ছবির বিষয় হিসেবে তিনি যে সমস্যাকে বেছে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন, তা প্রশংসা দাবি করে।

শুভজিৎ নন্দী

বিজ্ঞপ্তি

সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র বিভাগে সমালোচনার জন্য আমন্ত্রণপত্র সম্পাদকের নামে সম্পাদকীয় দপ্তরের ঠিকানায় অথবা 'দেশ' পত্রিকার ইমেল-এ (desh@abp.in) প্রেরণ করবেন। সমালোচকের কাছে সরাসরি আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ অনভিপ্রেত। অনুষ্ঠানের অন্তত এক সপ্তাহ আগে আমন্ত্রণপত্র সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছনো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকীয় বিভাগ

- শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমকালের কামারপুকুর ₹৩৫০
- রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ–প্রসঙ্গ ₹২৫০
- বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ ₹৪০০ • জগবন্দন (দুই–খণ্ড) ₹৭০০
- শতরূপে সারদা ₹ ৪৫০ • শ্রীমাভাষিত ₹৪৫০
- সারদাদেবী : আত্মকথা ₹৭০ • মায়ের চিঠি ₹১৮০
- শ্রীসারদাদেবীর চিকিৎসা ও চিকিৎসক প্রসঙ্গ ₹৩৩০
- চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ₹৫০০ • সঙ্গীতকল্পতরু ₹৬০০
- স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা ₹ ৯০
- বিবেক–দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সুভাষচন্দ্র ₹৫০০
- পত্রপ্রভায় বিবেকানন্দ ও গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ₹১৮০
- স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা সমগ্র ₹২০০
- বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা ₹১২০ • বিবেকচূড়ামণি ₹৩৭৫
- কালোত্তীর্ণা নিবেদিতা ₹২৫০ • শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস ₹৪৫০
- ভবের শুক্তি ভেঙ্গে (দুই খণ্ড) ₹৪০০ • নাট্যগুচ্ছ ₹২০০
- প্রসঙ্গ মহাভারত ₹১৭৫ • প্রপঞ্চসারতন্ত্রম ₹২৫০
- উপনিষদের পাশ্চাত্য–যাত্রা ₹২৮০ • চিরন্তনে পঁচাত্তর ₹২০০

নতুন প্রকাশিত বই

- শ্রীশ্রীমা ও কোয়ালপাড়া ₹৪০
- মহাপ্রাণ জীবনের লীলাচিন্তন : ঐশী জগতের কিছু কথা ₹১৫০
- কথামৃতে উপনিষদ ₹৩০০ • রামকৃষ্ণ–চেতনা ₹৪০
- শ্রীশ্রীতন্ত্ররাজতন্ত্রম্ (দুই খণ্ড) প্রতি খণ্ড ₹৪০০
- বেদগ্রন্থমালা (৫২ খণ্ড)—প্রতি খণ্ড ₹৩০০
- স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় জাগরণের প্রেরণা পুরুষ ₹১০

- Great Thinkers on Ramakrishna-Vivekananda ₹150
- Poems of Swami Vivekananda ₹175
- The Way to God ₹ 400 • Indian Saints and Mystics ₹125
- Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance ₹200
- The Cultural Heritage of India
  Hard Bound (Set)-Rs.8000, Paperback (Set) ₹ 4200
- NINE UPANISHADS
  —By Swami Lokeswarananda ₹ 1060
- History of Science in India (Vol.1-8) ₹ 3250
- A Collection from Sanakara's Commentaries on the Prasthanatraya ₹900

JUST OUT

- Swami Vivekananda in Contemporary Indian News, Vol. IV ₹ 850
- A Chronology of Events in the Life of Swami Vivekananda (1863-1890) ₹500
- New Perspective in Indian Philosophy ₹ 600
- Swami Vivekananda the Inspiration Behind our National Awakening ₹ 10
- Built Heritage of India : A Cultural Reminiscence ₹ 1000
- Appreciation of Indian Art : Selected Writings, Vol.II ₹ 200
- Science, Violence and Human Civilization ₹ 50
- The Relevance of Indian Philosophy to Contemporary Western Philosophy : (an Anthology of Seminar Papers) ₹ 500

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর জন্য যোগাযোগ করুন :

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার • গোলপার্ক • কলকাতা ৭০০০২৯

ফোন : (০৩৩)৪০৩০-১২০০/২৪৬৬-১২৩৫ • *E.Mail* : rmicsale@gmail.com/golpark.rmic@rkmm.org ; *Website* : www.sriramakrishna.org

ন তু ন ব ই

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ভাল মানুষ ৪০০.০০

'ভাল মানুষ' হতে চাওয়া সুদীপ্ত ঘটনাচক্রে হয়ে পড়ে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। স্ত্রী অদিতি, ছেলে আলেখ্য বাঁকা চোখে কি দেখছে তাঁকে? রত্নাবলীকে ঘিরে স্ক্যান্ডাল জানতে পারলে বেলা কি আর সম্মান করবে তাঁকে? এখন কী করবে সুদীপ্ত?

অভিজিৎ চৌধুরী

প্রবুদ্ধ ৪০০.০০

এ কাহিনি এক অদ্ভুত আত্মজীবনের— যেখানে বুদ্ধদেব প্রায়ই নিজেকে প্রবুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। উপন্যাস ইতিহাসের চেনা পথে এগোলেও জন্ম দিতে চেয়েছে এক আত্মদীপনের, সেখানে ধীমান পাঠকও খানিকটা প্রবুদ্ধ নিজস্ব অন্বেষায়।

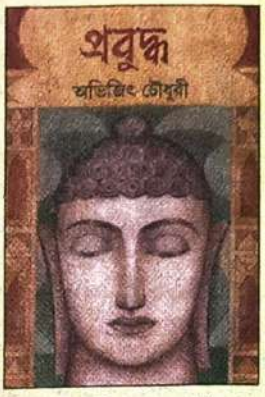

প্র ব ন্ধ

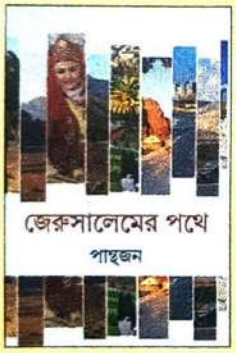

পান্থজন

জেরুসালেমের পথে ৫০০.০০

জায়গাটাকে তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য বলা হয়— প্রমিসড ল্যান্ড। বিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্ম জন্ম নিয়েছে এখান থেকেই— ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বিতর্কিত এই মধ্য এশিয়ার মধ্যমণি জেরুসালেম শহর। বহু প্রাচীন বাড়িঘর, ধর্মীয় স্থল, মানুষের কবর এবং আরও অনেক দেখবার মতন জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে। ঐতিহাসিক তথ্য আর আনাচেকানাচে ছড়িয়ে থাকা গল্পের মিশেলে সত্যিই এক আশ্চর্য শহর জেরুসালেম।

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়

সিসিলি ও মাল্টা ৫৫০.০০

চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের নিরাপত্তাকে পেছনে রেখে, করোনার ভ্রুকুটিকে তোয়াক্কা না করে খোলা পথের আহ্বানে লেখক সম্প্রতি বেরিয়ে পড়েছিলেন সুদূর ভূমধ্যসাগরের দুই দ্বীপ সিসিলি আর মাল্টার অমোঘ আকর্ষণে। নানা রসে জারিত সুখপাঠ্য এই ভ্রমণ কাহিনি পড়তে পড়তে পাঠক অচেনা, অজানা দুই দেশের বিচিত্র সব বিষয় জানতে প্রীত ও আনন্দিত হবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

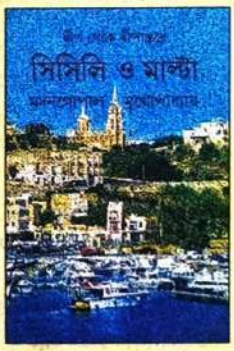

ছো ট দে র ব ই

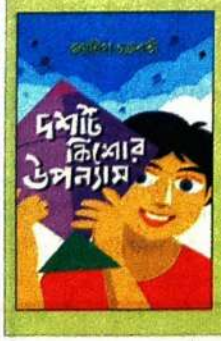

জয়দীপ চক্রবর্তী

দশটি কিশোর উপন্যাস ৭৫০.০০

এই বইয়ের কাহিনিগুলির মধ্যে ভূত আছে, রহস্য আছে। আছে রূপকথা, মজা আর ফ্যান্টাসি। আছে প্রকৃতি, দেশ, আর মানুষের জন্য ভালবাসার কথা। যে কাহিনিগুলি একবার শুরু করলে শেষ না করে থামা যায় না।

ক মি ক্ স

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী
৪০০.০০

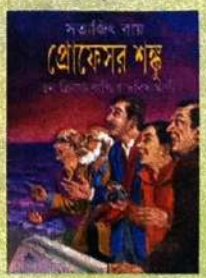

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯ ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭
ই-মেল publishers@anandapub.in • ওয়েবসাইট www.anandapub.in

নিত্যনতুন বইয়ের খবর পেতে আজই লগ ইন করুন।

সাবিত্রী রায়, অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক কথাশিল্পী, যাঁর সমস্ত রচনাই রাজনীতি সম্পৃক্ত

ক্রান্তিকালের আখ্যান

বিশ শতকের একটি বিশেষ সময়পর্বে গ্রাম এবং শহর জুড়ে যে-সমস্ত মানুষ রুজি রোজগার ও আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরা ছড়িয়ে আছেন লেখার পাতায় পাতায়।

গ্রন্থালয় থেকে অধ্যাপক সুদক্ষিণা ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাবিত্রী রায়ের রচনাবলি বহুদিনই বই-পাড়া থেকে নিরুদ্দেশ। তাঁর লেখালিখি বলতে পাঠকের সম্বল ছিল কেবল দে'জ পাবলিশিং আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ উইমেন্‌স্ স্টাডিস-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা-সঙ্কলন—তনিকা সরকার ও সাবিত্রী রায়ের কন্যা গার্গী চক্রবর্তীর ভূমিকায় সমৃদ্ধ একটি গল্পগ্রন্থ 'নূতন কিছু নয়' ও প্রবাসী তিন বছরের

সাবিত্রী রায় রচনাবলি ১
সম্পাদনা: তপস্যা ঘোষ
দে'জ পাবলিশিং
কল-৭৩ । ৭৫০.০০

দৌহিত্রের কাছে লেখা পত্রগুচ্ছ 'নীলচিঠির ঝাঁপি'। এই প্রেক্ষিতে দে'জ এর খণ্ডে খণ্ডে সাবিত্রী রায়ের রচনাবলি প্রকাশের এই আয়োজনকে অজস্র কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ। রচনাবলির এই প্রারম্ভিক খণ্ডে আছে তিনটি উপন্যাস—*স্বরলিপি*, *ঘাসফুল* ও *ব-দ্বীপ*, সঙ্গে সম্পাদকের কথা, সাবিত্রী রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দু'টি পরিশিষ্ট। সঙ্কলনটির মর্যাদা বাড়িয়েছে এই পরিশিষ্ট অংশটি। যেখানে আছে উপন্যাস সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা এবং তিনটি উপন্যাসের

প্রচ্ছদের ছবি ও আনুষঙ্গিক তথ্য।

সুলেখা সান্যাল, ছবি বসুর মতো সাবিত্রী রায়ও ছিলেন অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক কথাশিল্পী। তাঁর সমস্ত রচনাই রাজনীতি সম্পৃক্ত। কিন্তু শুধু ইতিহাসের ঘটনা বা দলীয় রাজনৈতিক টানাপড়েন, মিটিং-মিছিল-সংগ্রামের বিবরণ বা বামপন্থার জয়ঘোষণা নয়, বিশ শতকের একটি বিশেষ সময়পর্বে গ্রাম এবং শহর জুড়ে যে-সমস্ত মানুষ রুজি রোজগার ও আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরাও ছড়িয়ে আছেন তাঁর লেখার পাতায় পাতায়। আর আছে প্রেম, যে-প্রেম বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ, আদর্শের কাছে দায়বদ্ধ। একটি বিশেষ দলীয় রাজনৈতিক আদর্শবাদের অনুসারী হয়েও খোলা চোখে খোলা মনে তার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি মানবিক সম্পর্কের উদ্ভাসন সাবিত্রী রায়ের লেখার প্রধান গুণ এবং সম্ভবত এই কারণেই আজকের একেবারে বদলে যাওয়া সময়েও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক।

সাবিত্রী রায়ের তৃতীয় উপন্যাস *স্বরলিপি* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। প্রচ্ছদ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। সৌরীন ভট্টাচার্যের একটি লেখার দৌলতে ১৯৫২ সালের প্রথম সংস্করণের লালে কালোয় অনিঃশেষ বৃত্তের সেই নজরকাড়া মলাটের কথা উৎসাহী অনেকেরই জানা। রত্না প্রকাশন থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে সেই প্রচ্ছদটি ছিল না। *রচনাবলি* ১-এর পরিশিষ্টে সাদা-কালোয় হলেও আবার সেই প্রথম প্রচ্ছদটি ফিরিয়ে এনেছেন প্রকাশক; একইসঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে এই খণ্ডের অপর দু'টি উপন্যাস *ঘাসফুল* আর *ব-দ্বীপ*-এর প্রচ্ছদও।

স্বরলিপি উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল—"১৯৪৯-এর ২৭শে এপ্রিলের শহীদদের — (লতিকা, অমিয়া, গীতা; প্রতিভা ও বাদল) স্মরণে"। সম্পাদকের কথায় এর উল্লেখ থাকলেও রচনাবলি সংস্করণের উপন্যাস পাঠে তা অনুপস্থিত। ইতিহাসের নিরিখে উল্লিখিত তারিখটির গুরুত্ব অপরিসীম। ওই দিন পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল মানুষের অধিকার রক্ষায় শামিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য লতিকা, অমিয়া আর গীতাদের। এই নারীহত্যা সদ্য স্বাধীন ভারতের স্বপ্নভঙ্গের নিশ্চিত অভিজ্ঞান— বাংলার রাজনীতির এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

উপন্যাসটির মূল ঘটনাকাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০—অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পি সি জোশীর সংস্কারবাদী অবস্থান থেকে বি টি রণদিভের নেতৃত্বে পার্টি লাইনের বদল থেকে আরম্ভ করে দু'বছরের মাথায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তত্ত্ব থেকে পুনরায় সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন। যদিও এই দু'বছরের সময়কালের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে আছে ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়—অনুশীলন সমিতি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রারম্ভিক প্রভাব বিস্তার প্রয়াস পর্ব, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগের অনিবার্য ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু সমস্যা, সব হারানো মানুষের পায়ের তলায় মাটি আর মাথার ওপর ছাদের আশ্রয়টুকু জোটানোর লড়াই আর এই লড়াইকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক চাপানউতোর। অনেকেরই মনে থাকবে পার্টির বিচ্যুতি চিহ্নিত করার কারণে এই বই ও লেখিকা উভয়েই সেদিন নেতাদের বিরাগভাজন হন। পার্টি কর্তৃক বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, এর প্রচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং পার্টির সদস্যদের কাছে বইটি থাকা অবাঞ্ছিত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। আপত্তিকর বইয়ের ক্ষেত্রে পার্টির তরফে কৈফিয়ত তলব ও শৃঙ্খলা-বিধি প্রয়োগের ঐতিহ্য থাকলেও এ সব ক্ষেত্রে বিচার বিতর্কের একটা সুযোগ থাকত, যেমনটা ঘটেছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *ভূতের বেগার* বইটির ক্ষেত্রে। কিন্তু স্বরলিপি নিয়ে বিচার বিতর্ক দূরে থাক, সাবিত্রী রায়কে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি, একেবারেই আলগোছে বইটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু *স্বরলিপি* নিছক কোনও রাজনৈতিক তমসুক নয়, ইতিহাসের এক উত্তাল ক্রান্তিলগ্নে কয়েকটি মানব মানবীর হৃদয়-নির্ভর আখ্যান, যেখানে নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কও রাজনীতির টানাপড়েনে বিপর্যস্ত।

মাত্র আটাশ বছর বয়সে প্রকাশিত সাবিত্রী রায়ের প্রথম উপন্যাস *সৃজন*-এর পটভূমি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব আর সেই পটভূমিই ফিরে এসেছে *রচনাবলি* ১-এর দ্বিতীয় উপন্যাস *ঘাসফুল*-এ। ১৯৭১-এ প্রকাশিত হলেও *ঘাসফুল* ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী এক মানবিক আখ্যান। সাবিত্রী রায় ও শান্তিময় রায়ের যশোহরের প্রবাসজীবনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ তরুণ আইরিশ সৈনিক ওমিল ও'দোনেলের আদলে নির্মিত তরুণ স্কটিশ সেনানী পিটারই হয়ে উঠেছে ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে কলকাতা থেকে দূরবর্তী এক মিলিটারি শহরে অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে আসা রাজনীতিমনস্ক সুগত ও তার বোন পূর্বার জীবনে জড়িয়ে পড়ে মানুষের মুখের স্কেচ আঁকতে পটু, বাংলা ভাষা শিখে রবীন্দ্রনাথ পড়তে আগ্রহী পিটার। পিটার ও পূর্বার মধ্যে একটা অব্যক্ত ভালবাসার জালও বোনা হতে থাকে। যুদ্ধ একসময় থেমে যায়, কিন্তু প্রাণ দিতে হয় পিটারকে। এই বাংলার মাটিতেই চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকে এক ভিনদেশি তরুণ, যার জীবনের একটাই মাত্র লক্ষ্য ছিল— ফ্যাসিবাদের ধ্বংস তথা যুদ্ধের অবসান। আকারে অতি সংক্ষিপ্ত এই উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা নেই, নেই বিরাট কোনও সময় পরিসরকে ধরার চেষ্টা, জলের মতো ঘুরে-ঘুরে এ আখ্যান শুধু ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন থেকে মুক্তির কথা বলে, বলে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই', বলে, কেবল বলেই চলে।

স্বরলিপি নিছক কোনও রাজনৈতিক তমসুক নয়, ইতিহাসের এক উত্তাল ক্রান্তিলগ্নে কয়েকটি মানব মানবীর হৃদয়-নির্ভর আখ্যান, যেখানে নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কও রাজনীতির টানাপড়েনে বিপর্যস্ত।

স্বরলিপি উপন্যাসের শেষে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর বাধ্যত মা-বাবাকে নিয়ে আরও অনেকের মতো ফল্গু যখন কলকাতায় চলে এসেছে আরম্ভ হয়েছে বাস্তুহারা মানুষের জমি দখলের লড়াই, সব হারানো সেই সব মানুষ যখন নতুন আশায় ঘর বাঁধছে, আমাদের জাতীয় জীবনের সেই পর্যায়টি নিয়েই গড়ে উঠেছে ১৯৭২-এ প্রকাশিত সাবিত্রী রায়ের শেষ উপন্যাস *ব-দ্বীপ*। এসেছে অজস্র চরিত্র আর তাদের টিকে থাকার লড়াই। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১—এই সময়পর্বে যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দিয়ে বহু নেতা জেলবন্দি, তখন ও-পার বাংলা থেকে আত্মগোপন করে চলে আসা বামপন্থী কর্মীরা স্বাধীনতার পর ভোটাধিকার, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি অমনোযোগ প্রভৃতিকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক সচেতনতা ও সমর্থন বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। এর পর যখন সরকারি তরফে উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল আনা হয়, তখন উদ্বাস্তু মানুষজন সরাসরি ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির অধিকারভোগীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক ধর্মঘট, ১৯৬৪-র হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বামপন্থী রাজনীতির প্রচার ও প্রসার ঘটে চলে। ও-পার বাংলা থেকে আসা কমিউনিস্ট ধীমান ও তার পরিবার এবং তারই মতো আরও কয়েকটি পরিবারের মানুষজনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও বৃহত্তর জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে একটি বড় সময়ের ক্যানভাসকে এই উপন্যাসে মূর্ত করে তুলেছেন সাবিত্রী রায়। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে রাজনীতির কুটিল আবর্তে তরুণ ভালবাসার অপমৃত্যু।

আজকের পাঠকের মনে হতে পারে তাঁর উপন্যাস অতিকথনে ক্লান্তিকর, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের তুলনায় সর্বহারা মানুষের চরিত্রায়ণ অনেকটাই খসড়াধর্মী, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য

যে, আজকের প্রযুক্তি অধ্যুষিত তাৎক্ষণিকের দুনিয়ায় সময়ের কাছে দায়বদ্ধ এই আখ্যানমালা এক অন্য দিগন্তের ইশারা। তাকে ঠিক মতো অনুভব করতে গেলে পাঠককেও একটু পরিশ্রমী হতে হবে বইকি।

শম্পা চৌধুরী

ড. সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়
পাগল ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৩৫০
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় নয়ন ৩০০
অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মার কয়েকটি ফালি (ঠাকুরকে দেখা অন্য চোখে) ৩৫০
যন্ত্রদেব সমগ্র ৩৫০
সুখ-শান্তি হাতের পাঁচ ১৫০
দিলীপ কুমার ঘোষ
শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম ২২০
শ্রীম ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ ১৮০
(এক নিবিড় যোগসূত্র)
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ৪০০
(এক অক্ষয় সৃষ্টি)
সাহিত্যশ্রী ৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা-৯
মোঃ - ৯৮৩৬৮৮৮১১২ /৭৯৮০২৫৩৩৪৩

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে(আদি পর্ব) ১ম ৪৯০ ২য় ৪৬০
দীনেশচন্দ্র সরকার : পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত ২৫০
শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ ৩০০
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ২০০, ২য় ১৬০
অশোক উপাধ্যায়
সাময়িকপত্রে বঙ্গদেশচর্চা: জেলাভিত্তিক রচনাপঞ্জী ৬৫০
বিনয়ভূষণ রায় : চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস ৬০০
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : শেখর ভৌমিক সম্পাদিত
মীরকাসিম ২৫০ সিরাজদ্দৌল্লা ২৫০
বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় : বিপ্লবী ভগৎ সিং ১৫০
বিপ্লবী নায়ক : শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ২৫০
ভ্রমণে দেশ-বিদেশ ১৫০ বিদেশের পথে পথে ২০০
জে. বি. দে : প্রিন্টার্স গাইড ১ম খণ্ড ৫৫০
ভূমিকা ও তথ্য সংযোজন : নেপালচন্দ্র ঘোষ
নরেন্দ্রনাথ দে : প্রিন্টার্স গাইড ২য় খণ্ড ৫৫০
ভূমিকা ও তথ্য সংযোজন : নেপালচন্দ্র ঘোষ
নিখিলনাথ রায় : জগৎশেঠ ২২০
শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ: সাহিত্যিক কৌতুকী ১০০
প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাঙলা ১৩০
বাঙালী জাতি পরিচয় ১৬০
ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ২০০
সাহিত্যলোক ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
sahityaloke@gmail.com ☎ 033-2350-1359

তলোয়ার
শংকর লাল সরকার
দু-হাজার তিনশো বছর আগে পাটলিপুত্র থেকে তক্ষশিলা পর্যন্ত বাণিজ্য-দলের সংঘাতবহুল রোমাঞ্চকর যাত্রাপথ শেষে এক তরুণ পৌঁছল তক্ষশিলায়। সেই নগরীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন উত্তাল। একদিকে গ্রিক বীর অ্যালেকজান্ডার, অন্যদিকে আচার্য কৌটিল্যের অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে মশগুল একদল যোদ্ধা। অসংখ্য চরিত্রের ঘনঘটা, ষড়যন্ত্র, কাপুরুষতা আর রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে কিছু মানুষের আত্মমর্যাদা আর স্বাধীনতা রক্ষার সাহসী সংগ্রামের আখ্যান এই উপন্যাস।
একপর্ণিকা প্রকাশনী / মূল্য ৩০০
ekparnika.in +91-93665 31526 (WhatsApp)

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৫ পাচ্ছেন কবি সৈয়দ হাসমত জালাল তাঁর "প্রণয়বিন্দুগুলি" কাব্যগ্রন্থের জন্য।
রমেন্দ্রকুমার স্মৃতি সম্মাননা ২০২৫ পাচ্ছেন কবি দীপকরঞ্জন ভট্টাচার্য।
দু'জনকেই কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই

আগামী ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টা প্রকাশিত হচ্ছে
'এবং জলঘড়ি'-২১ (ক্রোড়পত্র- সুবিনয় রায় স্মরণে)
রামমোহন লাইব্রেরি, রায়া দেবনাথ সভাঘর
লিখেছেন— অভ্র ঘোষ, অনিতা অগ্নিহোত্রী, সৈয়দ কওসর জামাল, ঈশিতা ভাদুড়ী, চন্দ্রিমা দত্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সোম, নীহারুল ইসলাম, মলয় চৌধুরী, সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্ত, মলয় মুখোপাধ্যায়, শুভময় সরকার, নিরঞ্জন মন্ডল, ভাস্কর দাস, সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, শংকরলাল ভট্টাচার্য, ময়ূরী মিত্র, সায়ন ভট্টাচার্য এবং সুভাষ ভট্টাচার্য,সুরঞ্জন রায়, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, সুবীর নন্দী, রুমা মিত্র। সংখ্যা সম্পাদক: অসীমকুমার ঘোষ, রীনা চৌধুরী। ২০০
প্রাপ্তিস্থান: ৩১ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট, কলকাতা-৬
পাতিরাম দে বুক (দীপু) সুপ্রকাশ ধ্যানবিন্দু
(M) 9433455992 / 8777469646 / 9433122349

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ভাই ছুটি ২৫০
স্ত্রীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিঠি
রাণুকে রবি ২৫০ শঙ্খ ঘোষ কবি যখন সম্পাদক ২০০
নৃপেন ভৌমিক/স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী দুই বঙ্গের স্থাননাম ৬০০
জাহিরুল হাসান মুসলমান কোষ ৩০০
বাংলায় মুসলমানের ৮০০ বছর ৩০০
মুসলিম নারী: রোকেয়া এবং আগে পরে ৩৫০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালিসমাজ ৩০০
পূর্বা কলকাতা ১৪। ৯০৫১৯-০১৯১৩

সন্তান ও তার স্কুলকে ঘিরে মায়েদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের এক অনবদ্য সংকলন
মায়েদের গল্প
দেবাংকৃতা সরদার ৬০০
ধান্যমঞ্জরি
সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৭৪৯৪৯৪

সুনির্মল রায়
শিক্ষাতীর্থ
৬৫/৩ এম. জি. রোড, কোল-৯
7980804561
ম্যাথামেটিক্যাল-বায়োসায়েন্স', 'স্পোর্টস ফিজিওলজি' ও ম্যাথামেটিক্যাল-হিস্ট্রি'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আইকিউ মেমরি ম্যাক্সিমাইজেশনের' আবিষ্কর্তা, শতকসেরা বিজ্ঞানীলেখক, বহুবার জাতীয় সম্মানপ্রাপ্ত,বিজ্ঞান নির্ভর গল্প নাটক ছড়ার স্রষ্টা ও প্রথম লেখক সুনির্মল রায়ের আবিষ্কার ও রচনাবলী ১, ২, ৩ ও ৪ খণ্ড বের হল। প্রেসিডেন্সী, বি.ই. কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক সুনির্মল রায়ের এসব আবিষ্কার সেরা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল IJSER ও IJOAR -এ প্রকাশিত। 'দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ধারণা ও সমস্যার সমাধান'।

বিজ্ঞপ্তি

'দেশ'-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখা প্রেরণের ইমেল আইডি: desh@abp.in

দেশ
সম্পাদকীয় বিভাগ

বইয়ের জানালা

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে শূন্যতার এক বিশেষ স্থান আছে। কী অর্থ এ শূন্যতার? বৌদ্ধমতে, শূন্য-র অর্থ কোনও বস্তুর নিজস্ব কোনও চরিত্র না-থাকা। কোনও বস্তু তার উৎপত্তির জন্য যদি অন্য কোনও কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়, তা হলে সেই বস্তুটির নিজস্ব কোনও স্বভাব বা চরিত্র নেই, সে-বস্তু শূন্য। বৌদ্ধদর্শনের এমনই বহু নিবিড় তত্ত্ব, বৌদ্ধধর্মের আকর গ্রন্থগুলি অবলম্বনে সাধারণ পাঠকের জন্য আলোচিত হয়েছে **প্রসঙ্গ বৌদ্ধদর্শন** গ্রন্থে। লেখক মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক সূত্রধর।

মৃণাল সেন

'মাই ফার্স্ট ফিল্ম ওয়াজ় আ লাউজ়ি ফিল্ম, দ্য লাউজ়িয়েস্ট অফ অল লাউজ়ি ফিল্মস দ্যাট কুড এভার বি মেড বাই এনিবডি'—ইটালো স্পিনেল্লি-র সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার অকপট স্বীকারোক্তি করেছিলেন মৃণাল সেন। জন্মশতবর্ষ-উত্তর মৃণাল সেনের ছবি ও চলচ্চিত্রদর্শন নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তার এক ধারা সূচিত হয়েছে। **দ্য সিনেমা অফ মৃণাল সেন: আ কোয়েস্ট ফর দি আনরিসলভ্ড** গ্রন্থটি সে-ধারাতেই এক সংযোজন। একাধিক প্রবন্ধের এই সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন অমিতাভ নাগ ও অন্তরা নন্দ মণ্ডল। প্রকাশক ব্লু পেনসিল।

আনি এরনো

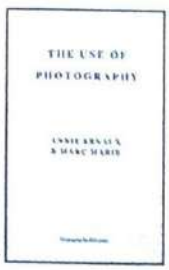

প্রেমিকের সঙ্গে শরীরী, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে শয্যার পাশে ছেড়ে রাখা পোশাক, অন্তর্বাস, জুতোর ছবি। তার পর, সেই ছবি ধরে ধরে স্মৃতিরোমন্থন এক-একটি ঘনিষ্ঠ ক্ষণযাপনের। নোবেলজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক আনি এরনো ও তাঁর একসময়ের অসমবয়সি প্রেমিক মার্ক মারি-র গ্রন্থ **দি ইউজ় অফ ফোটোগ্রাফি** এই অভিনব কাজটি করেছে। তাঁদের প্রণয়পর্বের সময় এরনো ছিলেন ক্যানসার আক্রান্ত, চলছিল চিকিৎসা। তাঁর শরীরে তখন একদিকে রোগ, অন্যদিকে বয়সের পদছাপ। মৃত্যু, বয়স, ক্ষয় ও স্মৃতি নিয়ে এ গ্রন্থ এক অবাক পর্যবেক্ষণ। প্রকাশক ফিট্‌সকারাল্ডো এডিশনস।

বাংলাদেশ ও ভারতে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। দেশভাগের আগে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পারস্পরিক বন্ধন বজায় ছিল। ধর্ম বর্তমানে রাজনীতিবিদদের ক্রীড়নক, তাই এখন সে তার সর্বনাশা চরিত্র চতুর্দিকে বিস্তার করছে।

মহাশ্বেতা দাস পতি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৪৯

সংখ্যালঘুরা এখন পরীক্ষাগারের গিনিপিগ

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে প্রবল আন্দোলন জেগে উঠেছিল বাংলাদেশে, তার কারণ ছিল পুরোটাই অর্থনৈতিক ('বাংলাদেশের মুখ আমি দেখিয়াছি', মোহিত রায়)— এই অভিমতের সঙ্গে পুরোপুরি সহমত হতে পারলাম না। বাংলাদেশ গড়ে তোলার পিছনে ওই দেশে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থ ছিল বাঙালির, সে কথাও ভুললে চলবে না। যার সলতে পাকিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝেছিলেন, বাংলা ভাষা হারিয়ে গেলে বাঙালি জাতি হারিয়ে যাবে। তাই তিনি পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। যুক্তি দিয়েছিলেন, দেশের (পাকিস্তানের) ছ'কোটি নব্বই লক্ষ নাগরিকের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। গণপরিষদে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন মাত্র তিন জন প্রতিনিধি। প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভোটাভুটিতে তাঁরা হেরে যান। কারণ, বাকি সব সদস্য ছিলেন উর্দু ভাষার পক্ষে। তাঁরা কিন্তু বাঙালি জাতিকে হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে দেখেননি। এর পর আসে ভাষা আন্দোলন। বাঙালির আত্মপরিচয়ের দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকল 'একুশে ফেব্রুয়ারি', বলাই বাহুল্য তা পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনায় প্রভূত ইন্ধন জুগিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ও-পার বাংলার বাংলাভাষী হিন্দুরা কী করে সংখ্যালঘু বনে যায় তা বোঝা দুষ্কর। ভারতের জনসংখ্যার মাত্র আট শতাংশ জনগণ বাঙালি। অথচ এ-পার বাংলায় বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, কিন্তু বাঙালি মুসলিমরা সংখ্যালঘু। এ এক আশ্চর্য বিধান। এ সবের অর্থ হল, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি অপেক্ষাও ধর্ম পরিচয়টাই এখন মুখ্য বিষয়। জীবনানন্দ দাশ ও-পার বাংলার জাতীয় কবি হিসাবে বিবেচিত হননি। কিন্তু এ-পার বাংলার কাজী নজরুল ইসলাম ও-পার বাংলায় গিয়ে জাতীয় কবি হতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে আওয়াজ উঠেছিল, 'ভারত যাঁদের মামার বাড়ি/ বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি'। যাঁদের মামার বাড়ি যেতে বলা হচ্ছে তাঁরাও বাঙালি। তাঁদের ভাষাও বাংলা। অর্থাৎ বাংলা ভাষা বাঙালিকে আর এক সূত্রে বেঁধে রাখতে পারছে না। তা হলে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে ও-পার বাংলার সঙ্গে একাত্ম হতে চাওয়ার অর্থ কী? ভারতের সঙ্গে তো একুশে ফেব্রুয়ারির কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ এ-পার বাংলাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারির একাধিক শহিদ মঞ্চ। আমরা গেয়ে থাকি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।' বিশেষ ওই দিনে দুই বাংলার সীমান্তে আমরা মিলিত হই। শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আর বলি 'আমার ভাষা, তোমার ভাষা, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।' তা হলে আজ কেন ও-পার বাংলার হিন্দু বাঙালিদের 'মামার বাড়ি' চলে যাওয়ার নিদান দেওয়া হচ্ছে?

ঢাকা জেলার শেওড়াতলি গ্রাম ছেড়ে আসতে চাননি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জ্ঞাতিরা। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জ্ঞাতিরাও থেকে যেতে চেয়েছিলেন রাড়ুলি গ্রামে। কিন্তু তাঁদের মতো অসংখ্য হিন্দু পরিবার সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন 'মামার বাড়ি'। সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য 'মামার বাড়ি' আসার পর তাঁরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে, ধর্ম পরিচয়ে 'মামার বাড়ি'-তে তাঁদের জন্য পৃথক কোনও

ছবি: সৌমেন মিত্র

বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি অপেক্ষা ধর্ম পরিচয়টাই এখন মুখ্য বিষয়

খাতির-যত্নের ব্যবস্থা নেই। তাই সীমান্তবর্তী খর্বা নদীতে কোমর জলে দাঁড়িয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলেও রামচন্দ্রের কানে সে ধ্বনি পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বাংলাদেশি সংখ্যালঘুরা। আসলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা এখন পরীক্ষাগারের গিনিপিগ। তাঁদের নির্যাতনের দৃশ্য দেখিয়ে ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে চাইছেন দু'দেশের শাসক। তাই ও-দেশের শাসক অতি সক্রিয়। আর এ-দেশের শাসক মৌনঅবলম্বন করে চলেছেন।

অজয় ভট্টাচার্য, উত্তর চব্বিশ পরগনা

দুই

প্রচ্ছদকাহিনি 'কী দীপ জ্বালিস ঘরে' (১৭ ডিসেম্বর ২০২৪) প্রসঙ্গে এই পত্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের যৌথ সংগ্রামে অনেক আশা নিয়ে এক নবজাতক দেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু, ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধেও মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি দেননি। বিপরীতে উনি বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। তাই বাংলাদেশ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মৌলবাদী পাকিস্তানকে অনুসরণ করে এসেছে। নামে বাংলাদেশ হলেও বাংলাদেশ কোনও দিন বিস্মৃত হয়নি তারা একদা পাকিস্তানের অঙ্গ ছিল। এটি ছিল গোড়ায় গলদ। তাই পাকিস্তানের মতো একের পর এক গণঅভ্যুত্থানের পথে বাংলাদেশে রাজনৈতিক গণহত্যা ও পালাবদলের ঘটনা ঘটেছে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যতটা বাংলাদেশকে আপন করে নিয়েছি, বিপরীতে সেই আন্তরিকতা ছিল কি? আজ এই অমোঘ সত্য অনুভব করছি, বাংলাদেশ চিরকালই মুসলিম রীতি মেনেই চলেছে। ভারত তাদের কাছে নিছকই কাফের হিন্দু রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বাংলা আজ সমাধিতে। একদা বাংলার ভয়ঙ্কর নেতা সোহরাবর্দির শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভুল নীতির জন্য ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বর্তমানে মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার।

শোভনলাল বক্সী, কলকাতা-৭০০০৪৫

ভাষার আগ্রাসন

সিজার বাগচীর 'দাপট বাড়ছে হিন্দির' (শেষকথা, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪) শীর্ষক নিবন্ধটিতে তাঁর অনেক বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেও বলা যায়, ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ। এমনকি, বাংলা ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বা জেলাভিত্তিক পার্থক্য আছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজি যেমন লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা যোগাযোগের ভাষা, এই দেশে হিন্দি এবং ইংরেজিও তাই।

অবশ্যই হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নয়। তাই এক জন অবাঙালি যেমন এই রাজ্যে বাংলা বলার জন্য কাউকে বাংলাদেশি বলে দেগে দিতে পারেন না, তেমনই এক জন বাঙালিও কোনও অবাঙালির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দি বলব না বলে অনমনীয় থাকতে পারেন না। এতে আসল কাজের কাজ কিছুই হবে না।

সর্বভারতীয় ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোনও আইপিএস অথবা আইএএস অফিসার যে-রাজ্যে নিযুক্ত হন, চাকরির শর্ত বা নিয়মানুসারে তাঁকে সেই রাজ্যের ভাষা শিখে

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির
প্রাচীনতম ধারাবাহিক সাময়িকপত্র।
সম্পাদক : স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ

উদ্বোধন ॥১২৭॥

'উদ্বোধন' পত্রিকা ১২৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

- 'উদ্বোধন' UGC-CARE-এ নথিভুক্ত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত মাসিক পত্রিকা।
- একশো সাতাশতম বর্ষে পদার্পণের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে 'উদ্বোধন' তার উদার ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের চিরন্তন স্রোতোধারাকে বহন করে এগিয়ে চলেছে।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ধর্ম, দর্শন, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং মননশীল কবিতা পাঠানো যেতে পারে। প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে এবং কবিতা ১৫ লাইনের মধ্যে হতে হবে। পুস্তক সমালোচনার জন্য দু কপি বই পাঠানো যেতে পারে।
- প্রবন্ধের মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। ভ্রমণ বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য বিষয়ে প্রদত্ত রচনার সঙ্গেও প্রয়োজনবোধে ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হস্তাক্ষরে, ডিটিপি অথবা বাংলায় টাইপ করে মূল পাণ্ডুলিপিটিই পাঠানো বাঞ্ছনীয়। প্রেরিত পাণ্ডুলিপির একটি কপি প্রেরক অবশ্যই নিজের কাছে রাখবেন। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রেরিত পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় প্রেরকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন বা মোবাইল নম্বর সহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির উল্লেখ থাকা আবশ্যক।
- পূর্ব প্রকাশিত রচনা কিংবা প্রকাশের জন্য অন্যত্র প্রেরিত রচনা 'উদ্বোধন'-এ পাঠানো যাবে না। রচনা মনোনীত হলে 'উদ্বোধন' পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখক-লেখিকার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। মনোনয়নের জন্য কমপক্ষে ৬ মাস সময় লাগে। রচনা মনোনয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে 'উদ্বোধন' কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

গ্রাহকভুক্তিকরণ

- প্রতি সংখ্যার মূল্য : ৩০ টাকা • শারদীয়া সংখ্যা : ২০০ টাকা • বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ) : ১ বছরে ১৮০ টাকা, ৩ বছরে ৫৩০ টাকা। সাধারণ ডাক : ১ বছরে ২৩০ টাকা, ৩ বছরে ৬৯০ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাক : ১ বছরে ৭০০ টাকা, ৩ বছরে ২১০০ টাকা। • শারদীয়া সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে সংগ্রহের জন্য বর্ষ প্রতি ৮০ টাকা অতিরিক্ত প্রদেয়। • বিদেশের (বাংলাদেশ-সহ) গ্রাহকমূল্য—বিমানডাক : ৩৫০০ টাকা (১ বছর)। • ইলেকট্রনিক ম্যাগাজিন : ১ বছরে ১২০ টাকা, ৩ বছরে ৩৩০ টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ • ফোন : ৮২৬৫ ৮২৬৫ ৬৫, (০৩৩) ২৫৫৪-২৪০৩/২২৪৮
• ওয়েবসাইট : www.udbodhan.org • ই-মেল : editor@udbodban.org • কার্যালয় খোলা থাকে : ৯.৩০ মি.—৫.৩০ মি.; শনিবার ১.৩০ মি. পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)

নিতে হয়। ভারত সরকারের উচিত সমস্ত স্তরের কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করা।

এই রাজ্যে অনেক দিনই চাকরির সুযোগসুবিধা বহুলাংশে কমে গেছে। ফলে বাঙালি ছেলেমেয়েরা কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে এবং সেখানেই থিতু হতে বাধ্য হচ্ছে। উল্টোটাও ব্যাপক হারে হচ্ছে। এই রাজ্যের অনেক ব্যবসায় এবং পেশায় অবাঙালিদের আধিক্য দেখা দিয়েছে। বেড়েছে বাঙালি অবাঙালির মধ্যে বিবাহবন্ধন। বাঙালিরা অসাধারণ অনুকরণপ্রবণ, ফলে আচার-অনুষ্ঠান, রীতি রেওয়াজ এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের গতিমুখ দুর্ভাগ্যক্রমে একমুখী।

আর-একটা বিষয়েও সিজারবাবুর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলাম। বই না পড়ে মোবাইল ফোন বা রিলে আসক্ত হওয়ার প্রবণতা শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, দেশ-বিদেশের সব জায়গায় সব বয়সিদের মধ্যে বিদ্যমান এখন। তবে একটি বিষয়ে লেখকের সঙ্গে ভিন্নমত হওয়ার কোনও প্রশ্নই থাকে না, সেটি হল এখন থেকেই সাবধান হতে হবে বাঙালিকে।

পার্থ রায়, কলকাতা-৭০০০৬৬

লক্ষ্মীর ভান্ডারই সব নয়

দুই রাজ্যের বিধানসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে 'গণতন্ত্রের সমান্তরালে' নিবন্ধটি (২ ডিসেম্বর ২০২৪) যুক্তিযুক্ত। বাংলার ছ'টি উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু বাড়তি উৎসাহ ছিল আর জি কর-এর ঘটনা নিয়ে। অনেকের মতে, বিগত অর্ধ শতাব্দীতে সরকারবিরোধী এরকম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেখা যায়নি। তবুও উপনির্বাচনে গতবারের চেয়ে আরও বেশি ভোট পেয়ে জিতেছে সরকারি দল। শুধু তাই নয় বিজেপি-র হাতে থাকা একটি আসনও তৃণমূল ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানেও মোটামুটি ভাবে সেই একই ব্যাখ্যা। ওই লক্ষ্মীর ভান্ডার।

তবে এখানেও দু'-তিনটি ফ্যাক্টরকে অবজ্ঞা করলে খুবই ভুল হবে। প্রথমত, বিগত আট-দশ বছরে এটা প্রমাণিত যে, পঞ্চায়েত থেকে বিধায়ক হয়ে সাংসদ পর্যন্ত বিরোধী দলের পক্ষে নির্বাচিত ব্যক্তিরা সরকারি দলে যোগ দিচ্ছে। ফলে যে-বুথ-কর্মীটি গ্রামে লড়াই করে তার দলের প্রার্থীকে জেতালেন, তিনি কি পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে আর সেই সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে নিজ দলের সমর্থনে লড়াই করতে পারবেন? দ্বিতীয় বিষয়টি হল, এখানে সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে বিরোধীরা একযোগে কখনও আন্দোলন করে না।

তৃতীয়ত, ব্যাপক দুর্নীতির চাক্ষুষ ঘটনা দেখা গেলেও একটিও প্রমাণিত নয়। ব্যর্থ দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থাও। ফলে কারও শাস্তি হয় না। অথচ সারদা কাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা বেহাত হওয়ায় গ্রামের মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বিচার চাইতে কলকাতা দৌড়েছিল। অর্থাৎ হয় কোনও দুর্নীতি হয়নি, বা এদের শাস্তি হবে না। ফল? সরকারি দলের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার কোনও মানেই হয় না।

জ্যোতি বসু কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের আমিই ক্ষমতা থেকে সরাতে পারি— এই ভাবনা সেই ১৯৯৮ সাল থেকে কম-বেশি ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন এই তেরো বছরে সে রকম একক নেতা কি দেখা গেছে? তা হলে বুথ থেকে নবান্ন— জনতা কাদের বিশ্বাস করবে? এ সবের পরও লক্ষ্মীর ভান্ডারই সব, এটা বলা উচিত হবে কি?

সুদীপ মাইতি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪০১

সু দো কু

নীচে চতুষ্কোণটিতে মোট ৯ টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। যে-বর্গক্ষেত্রগুলি ফাঁকা আছে, সেখানে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে ওপরে-নিচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

২৮০

				৯	৬			
		৪			৮	৩		
৬						৪		৭
								৯
১	৩		৯		৭		২	৮
৫								
৭		৫						২
		৮	৩			৯		
			৬	২				

গত সংখ্যার সমাধান

৩	৫	৮	৬	১	৭	৪	২	৯
৬	৭	২	৩	৪	৯	৮	৫	১
৯	৪	১	৮	২	৫	৩	৭	৬
১	৯	৫	৭	৮	৬	২	৩	৪
৮	৩	৭	৪	৯	২	৬	১	৫
৪	২	৬	৫	৩	১	৭	৯	৮
৫	১	৩	২	৬	৪	৯	৮	৭
২	৬	৯	১	৭	৮	৫	৪	৩
৭	৮	৪	৯	৫	৩	১	৬	২

শ্যাম বেনেগাল (১৯৩৪-২০২৪)

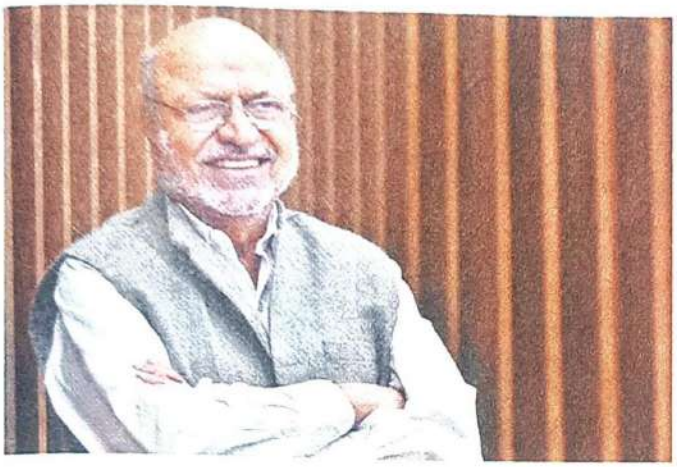

■ ভারতীয় চলচ্চিত্রে নব তরঙ্গ বা 'প্যারালাল সিনেমা' ধারার ইতিহাসে অন্যতম পুরোধাপুরুষ ছিলেন শ্যাম বেনেগাল। প্রথম জীবনে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কপিরাইটার হিসেবে কাজ করতে করতেই ছবি পরিচালনার শুরু। গুজরাতি ভাষায় প্রথম তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। শ্যাম বেনেগালের পরিচালিত প্রথম ফিচার-ফিল্ম *অঙ্কুর* (১৯৭৫) জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এর পর *নিশান্ত* (১৯৭৬), *মন্থন* (১৯৭৭), *জুনুন* (১৯৭৯) এবং *আরোহণ* (১৯৮২) ছবিগুলির জন্যও তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। নির্মাণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু ও শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক। টেলিভিশনের জন্য তাঁর পরিচালিত *ভারত এক খোঁজ* এবং *সংবিধান* জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পদ্মশ্রী (১৯৭৬), পদ্মভূষণ (১৯৯১)-সহ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (২০০৫)-এ সম্মানিত হয়েছিলেন।

প্রয়াণ

■ **জিমি কার্টার (১৯২৪-২০২৪)** প্রথম জীবনে একজন কৃষক ছিলেন, পরে জর্জিয়ার গভর্নর এবং তারও পরে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট (১৯৭৭-১৯৮১) পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর গৃহীত বিদেশনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেমন— মিশর ও ইজ়রায়েল চুক্তি। জিমি কার্টার ২০২২ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ

■ জীববৈচিত্র ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে ইকোলজিস্ট মাধব গ্যাডগিলের গবেষণা ও মতামত গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ২০১১ সালে প্রকাশিত গ্যাডগিল রিপোর্ট তার মধ্যে অন্যতম। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ইকোলজিক্যালি সেনসিটিভ এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং ২০১২ সালে ইউনেস্কো ওই অঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে। চলতি বছর ইউনাইটেড নেশনস তাঁকে 'চ্যাম্পিয়নস অফ দি আর্থ' সম্মানে সম্মানিত করল। এর পূর্বে মাধব গ্যাডগিল পদ্মশ্রী (১৯৮১) ও পদ্মভূষণ (২০০৬) ছাড়াও পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা ও পুরস্কার।

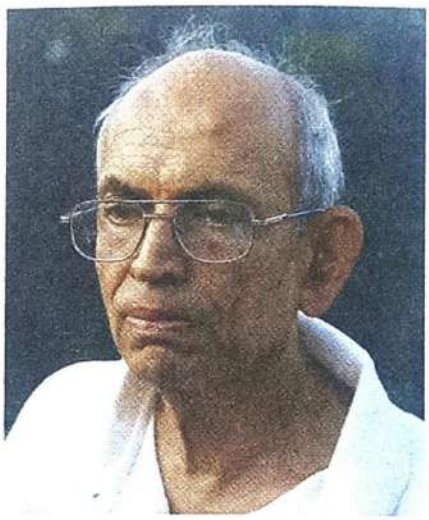

■ **এম টি বাসুদেবন নায়ার (১৯৩৩-২০২৪)**-এর প্রথম উপন্যাস *নালুকেট্টু* (১৯৫৮)-র জন্য তিনি কেরল সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। তাঁর রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্প অনূদিত হয়েছে একাধিক ভাষায়। চার বার সেরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। *নির্মলায়ম* ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কারও পেয়েছিলেন। মলয়লম সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৯৫ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

■ **বাপসি সিধওয়া (১৯৩৮-২০২৪)**-র জন্ম করাচিতে, প্রথম জীবনে কিছুদিন কাটিয়েছেন লাহোরে। দু'বছর বয়সে পোলিয়ো-আক্রান্ত হন, দেশভাগের সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর *আইস-ক্যান্ডি ম্যান* রচনার অন্যতম প্রেরণা ছিল। উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয় *আর্থ* (১৯৯৮) নামে। বাপসি সিধওয়ার কাহিনিসূত্র অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল *ওয়াটার* সিনেমাটি। এই বিতর্কিত ছবির পরিচালক ছিলেন দীপা মেহতা।

■ **রাজা মিত্র (১৯৪৫-২০২৪)** পরিচালিত প্রথম ছবি *একটি জীবন* জাতীয় পুরস্কার পায় ১৯৮৭ সালে, পরের বছরই ছবিটি দেখানো হয়েছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে। এর পরে *নয়নতারা*, *বেহুলা* ছাড়াও একাধিক তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ক্যালকাটা ফুটপাথ ড্রয়েলার্স*, *জীবন পটুয়া*, *স্ক্রল পেন্টার্স অফ বীরভূম* এবং *পেন্টিংস অ্যান্ড ড্রয়িংস* ইত্যাদি। রাজা মিত্র কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

ক্ষয় হয়, ভয় হয়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অম্বেডকরকে গ্রহণ করিনি, হয়তো করতে ইচ্ছুকও নই, শুধু নিজেদের স্বার্থে জড়িয়ে রেখেছি তাঁর নাম।

অঙ্কন: প্রসেনজিৎ নাথ

বাক্ যে ব্রহ্ম, সে কথা আর মনে রাখি না আমরা। কথা, ভুল কথা এবং অতিরিক্ত কথা বলার আয়াস, আজ আমাদের জীবনে সর্বত্র। যেন যিনি শুনছেন, কথার বাণ তাঁকে আঘাত করলেই উদ্দেশ্য সফল। এক্ষেত্রে স্থান এবং কালের সীমা মান্য করার প্রবণতাও বিপজ্জনকভাবে উধাও। দৈনন্দিন জীবন—ঘর, বাজার-হাট, রাস্তা থেকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর শ্রেষ্ঠ প্রকোষ্ঠ সংসদেও কথা বলার এই অপরিণামদর্শিতা ক্রমবর্ধমান। প্রায় যত্রতত্র ফুলঝুরির মতো জেগে ওঠা অ-নান্দনিক আচরণ দেখে দেশের সাধারণ মানুষের বুঝি ভয় হয়, ভাবি এ কোন নিম্নগামী রুচির দিকে আমরা চলেছি!

মানুষের রুচির বেশির ভাগই অবশ্য তার ভিতরের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এই শিক্ষা যতখানি পুথিগত, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রকৃতিগত। জন্মের পর দেখে, অবলোকন করে, শুনে-শুনে শুরু হয় আমাদের শেখা। সেইজন্য শিশুর সামনে পিতা-মাতাকে হয়ে উঠতে হয় সুন্দরের উদাহরণ। ভালোর নিক্তি দিয়ে তার পর আমরা একদিন সমাজের মন্দগুলিকেও চিনে নিই। এ কথা খুবই আশ্চর্যের, আমাদের চারপাশে আপাত অনুজ্জ্বল অথচ গভীর এই ভালটির পাশাপাশি, এখন অতিমাত্রায় খারাপের হাতছানি! লঘু এবং তরলের প্রতি যেন এক অনাবশ্যক ঝোঁক গ্রস্ত করে রেখেছে সময়। অন্তত বাক্-এর ক্ষেত্রে সংযম শূন্য করে এক অদ্ভুত চটুলতার ঘূর্ণিপাকে ঘুরে চলেছি আমরা।

এরই মাঝে অবশ্য একটি নতুন বছর চলে এল। অথচ সূচনার অব্যবহিত আগে, দেশের পার্লামেন্টে বাক্ বিড়ম্বনার তীব্র ঘটনাটি আপামর মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিল নিমেষে। 'এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে, অম্বেডকর, অম্বেডকর, অম্বেডকর, অম্বেডকর...এতবার ভগবানের নাম নিলে সাত জন্ম পর্যন্ত স্বর্গলাভ হত!'—উক্তিটি মোটামুটি এই, এবং লক্ষণীয়, বক্তা চারবার অম্বেডকরের নাম উচ্চারণ করেছেন। আর সেই প্রমাদ-উচ্চারণে বিরোধীপক্ষকে আক্রমণ, অথবা বিরোধীদের অম্বেডকরকে অবলম্বন করে বক্তা ও তার দলকে নিশানা করা—এই উভয়বলতার ঠিক মাঝখানে উঠে আসছে এক বিস্ময়সূচক চিহ্ন! যে-চিহ্ন আরও-একবার মনে করিয়ে দেয় আসলে আমরা অনেকেই অম্বেডকরকে গ্রহণ করিনি, হয়তো করতে ইচ্ছুকও নই, শুধু কথার অবিরল পাকে, একেবারে নিজেদের স্বার্থে জড়িয়ে রেখেছি তাঁর নাম। সেই স্বার্থ, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, দেশের সংবিধান প্রণেতার আদর্শকে আত্তীকরণ করা নয় বরং তাঁর নামের আলোতে নিজেদের বিম্বিত করার ব্যর্থ প্রয়াস।

কিন্তু সত্যিই সেই আদর্শ কেমন?

দেখি ইতিহাস। যেখানে জীবন-অভিজ্ঞতায় খুঁজে পাওয়া অসাম্যের খণ্ডচিত্র থেকে সাম্যের ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার দর্শন বাবাসাহেবের পথচলায় লগ্ন হয়েছে। আমৃত্যু দলিত অথবা নারীদের অধিকার রক্ষা বিষয়ে নিরলস সংগ্রাম তাঁকেও সার্থক করেছে একটি সার্বভৌম দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। তাঁর গণতন্ত্রের সূত্র তাই সহনাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর সংবেদনায় গাঁথা এবং এক পরিশীলিত, সমন্বিত সংযোগের সাধনাও।

মনে পড়ে, সাতারা থেকে পাদালি স্টেশনে নেমে দুই ভাই একদা স্টেশন মাস্টারের সহায়তায় গাড়ি জোগাড় করে বাবার কাছে যাওয়ার আয়োজন করছিল। পথে চালক, মাহার যাত্রীদের গাড়ি চালাতে অস্বীকার করেন। অবশেষে দ্বিগুণ পয়সায় স্থির হয়, তিনি গাড়িটি দেবেন কিন্তু কিছুতেই অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ওই এক গাড়িতে উঠবেন না। প্রখর রৌদ্রে স্বর শুকিয়ে আসে ভীমরাওয়ের। দাদা অনেক চেষ্টা করেও জল জোগাড় করতে পারে না। জাত খোয়ানোর ভয়ে পানীয় দিতে রাজি নন কেউ। প্রাণধারণই অসম্ভব হয়ে উঠছে, এইরকম এক পরিস্থিতিতে রাস্তার ধারে পুকুরের নোংরা জল পান করেই তৃষ্ণা মেটাতে হয়। কী অসহায় এই দৃশ্য! একজনও সাহসীকে খুঁজে পাওয়া যায় না, অস্পৃশ্যতার বেড়া ডিঙিয়ে যিনি পিপাসার্তের মুখে জল তুলে দিতে পারেন। ছুঁৎমার্গের এ ছবিই কি অতীত ভারতবর্ষের একটুকরো সমাজ? অথবা ছবিটা আজও কি এই নতুন সময়ে এসে খুব বেশি পাল্টে গিয়েছে আমাদের? ব্রেশটের নাটক *লাইফ অফ গালিলেও*-র মতো বলতে ইচ্ছে করে, হতভাগ্য সেই দেশ, যে-দেশে কেবল বীরেরই প্রয়োজন পড়ে!

প্রতীয়মান যে, আমরা কত ভাগ্যহীন জাতি। হতভাগ্য কেননা নিজেদের কর্ম, মেধা, শ্রম, রুচির অনুশীলন ব্যতিরেকে সহজ এবং সস্তা পথেই বীর হতে চেয়েছি। চেয়েছি শেষকথা বলার একমাত্র অধিকারী হতে। এই বিশাল দেশের ক্রমাগত রাজনৈতিক অধোগামিতার জন্য দায়ী তাই আমরাই। অম্বেডকর কার, গান্ধী কার—অনর্থক উক্তি-প্রত্যুক্তির লড়াইতে মহাপুরুষদের জীবন ও আদর্শ বুঝি আজও সে-কারণে হৃদয়ের অংশ হতে পারেনি আমাদের, অব্যবহৃত পুস্তকের মলিন পৃষ্ঠায় আরও মলিন হয়ে থেকে গেছেন তাঁরা। জন্মদিনের মাল্যদানে অথবা মৃত্যুদিনের শোকগাথায় বিহ্বল হয়ে পড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও কিন্তু একথা ভালভাবে জানেন। মহাপুরুষদের তাই প্রয়োজনভিত্তিক নিজের মতো করে আপন করে নেন তারা। আবার কখনও এরই ফাঁকে ফুটো ঝুলি থেকে ধ্বংসস্তূপের মতো হঠাৎ বেরিয়ে আসে অলীক উচ্চারণ। বোঝা যায়, তাঁরা যা বলেন, তা বিশ্বাস করেন না, যা বিশ্বাস করেন তা বলেন না অথবা কখনও-কখনও আচরণের তানাশাহির মতোই দেশের মানুষের প্রতি, সংবিধানের প্রতি তাঁদের উদগ্র অবিশ্বাস গরম ম্যাগমার মতো ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। এই উদ্‌গিরণ, বলা বাহুল্য, আমাদের শুদ্ধতা, শ্রদ্ধা ও নান্দনিকতার উপর গভীরতম ক্ষত, যা অসহ্য, এক কথায় অপূরণীয়।

আনন্দমেলা

গল্পজাদুর আসর

গল্প শোনাতে ভালবাসো?

কে সেরা গল্প শোনাতে পারে, চলছে তার খোঁজ। আজই নেমে পড়ো লড়াইয়ে। জিতলেই পডকাস্টে বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ।

কী ভাবে অংশগ্রহণ করবে?

তোমার বয়স যদি ১০ থেকে ১৮-র মধ্যে হয়, তা হলে নীচের লেখাটি রেকর্ডিং করে নিজের নাম, বয়স, পিন কোড সহ হোয়াটসঅ্যাপে অথবা নীচের লিঙ্কে পাঠাও।

89810 09054

https://www.aaroananda.com/golpojadurasor

আফ্রিকার এই অংশে পাখি বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের রাত্রিচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে-সে সুর অপার্থিব মিষ্টি।

ডিজিটাল পার্টনার আরও আনন্দ

রেডিয়ো পার্টনার 91.9 friends fm

sosideas

DESH 2 JANUARY 2025 REGIS... /2022–2024, RNI NO.2537 INR 35.00